উদারনীতিবাদের আলোকে পেশাগত পরিচিতির সংকটঃ একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রে
পিএইচ. ডি. উপাধি প্রাপ্তির
আবশ্যিক অংশরূপে প্রদত্ত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক সমর কুমার মণ্ডল

রিপন বিশ্বাস
দর্শন বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৭০০০৩২
রেজি নং- AOOPH1200214

জুন, ২০২৩

উৎসর্গ,

৺ফুলকুমারী বিশ্বাস

আমার গর্ভধারিণীকে

CERTIFICATE

Certified that the thesis entitled **“উদারনীতিবাদের আলোকে পেশাগত পরিচিতির সংকটঃ একটি দার্শনিক পর্যালোচনা”**, submitted by me for the award of the Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Prof. Samar Kumar Mondal. And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the

Supervisor : 08/06/23

Dated :

Professor
Department of Philosophy
Jadavpur University
Kolkata - 700 032

Candidate : Ripan Biswas

Dated : 08/06/2023.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের পিএইচ. ডি. উপাধির জন্য এই গবেষণা নিবন্ধের উপস্থাপন। ঈশ্বরের শ্রীচরণে আমার প্রণাম নিবেদন করি। আমার এই অভিসন্দর্ভটি রচনার জন্যে শ্রদ্ধেয় ও প্রিয়ভাজনদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সহযোগিতা পেয়েছি, যাঁদের সহযোগিতা ছাড়া আমার এই অভিসন্দর্ভটির রচনা সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠত না, তাঁদের প্রতি আমি বিনম্র চিত্তে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিবেদন করছি।

প্রথমে আমি আমার ঠাকুমা সুকুমারী বিশ্বাস, পিতা নিমাই বিশ্বাস ও মাতা মেঘনা বিশ্বাস-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এছাড়াও কৃতজ্ঞতা জানাই পিতৃ-মাতৃ সম সাধন চন্দ্র বিশ্বাস এবং সুভদ্রা বিশ্বাসের প্রতি। কারণ, তাঁদের সমস্ত প্রকার ত্যাগ, উৎসাহ, আশীর্বাদ ছাড়া আমি এই অভিসন্দর্ভটিকে সম্পন্ন করতে পারতাম না। ধন্যবাদ জানাই আমার ভগিনী শ্রাবনী বিশ্বাস এবং তনয়া রিতুস্মি বিশ্বাসকে। ধন্যবাদ জানাই আমার সহধর্মিণী সুস্মিতা বিশ্বাসকে সদা উৎসাহ প্রদানের জন্য ও অতিব্যস্ততার মধ্যেও অভিসন্দর্ভটির প্রুফ সংশোধনে সাহায্য করার জন্য।

যারঁ সাহায্য ছাড়া এই অভিসন্দর্ভটি কোনভাবেই পরিসমাপ্ত হত না তিনি হলেন, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক সমর কুমার মণ্ডল মহাশয়। তিনি নিজের অতিব্যস্ততার মধ্যেও উক্ত অভিসন্দর্ভটির প্রায় প্রতিটি শব্দ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন এবং প্রয়োজনীয় মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেছেন, প্রতিটি মুহূর্তে উৎসাহ দিয়েছেন, প্রেরণা প্রদান করেছেন এবং উপযুক্ত গ্রন্থাদি দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। এই আন্তরিক সহযোগিতার জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এছাড়াও দর্শন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপিকা মধুচ্ছন্দা সেন মহাশয়ার প্রতিও আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তিনি এই অভিসন্দর্ভটি রচনায় অপরিসীম উৎসাহ প্রদান করেছেন। এই আন্তরিক সহযোগিতার জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি চাকদা কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গুরু শ্রী সুভাষ চক্তবর্ত্তী মহাশয়ের প্রতি। কেননা, তাঁদের জন্যই হয়তো আজ উচ্চ-শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরেছি।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমার শুভানুধ্যায়ী ও যাঁদের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও সহযোগিতা আমার এই অভিসন্দর্ভটিকে সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছে। তাঁরা হলেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও সুধীরঞ্জন লাহিড়ী মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার কর্মী, বিভাগীয় গ্রন্থাগারিক, বিভাগের সকল অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা তাঁদের সকলের প্রতিও আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভটি নিয়ে আলোচনা করার সময় বয়োঃজ্যেষ্ঠ এবং সমবয়সী অনেক গবেষণাকারী ও সহপাঠকদের কাছ থেকেও অনেক সাহায্য পেয়েছি, তাই তাদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

এছাড়াও গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যারা সাহায্য করেছে তাদের প্রতি বিশেষ করে, সুশান্ত সরকার, জামসেদ মন্ডল ও ভবেশ গায়েন- এর প্রতিও রইলো অকৃত্রিম ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে মতামত ও গ্রন্থাদি দিয়ে সাহায্য করে আমার অভিসন্দর্ভটিকে সমৃদ্ধ করেছে। এছাড়াও অদিতি মণ্ডল, বনানী বিশ্বাস এবং অর্পিতা বিশ্বাস- এর প্রতি রইল অকৃত্রিম ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। আর এই স্বল্প পরিসরের মধ্যে যাদের নাম অনুল্লেখ থেকে গেল, তাদের প্রতিও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

পরিশেষে, আমার স্বল্পজ্ঞানের পরিসর থেকে গবেষণা অভিসন্দর্ভটি লেখার সময় আমি আমার সাধ্যমতো যত্ন ও সতর্কতা নিয়েছি, তবুও যদি কোনোরকম কোথাও ভুল-ত্রুটি থেকে থাকে তাহলে তার দায় নিতান্তই আমার এবং তার জন্য আমি অবশ্যই ক্ষমাপ্রার্থী।

৮ই জুন, ২০২৩ রিপন বিশ্বাস

চন্দন পুকুর, চিত্রশালী, নদিয়া।

সূচীপত্র

ভূমিকা **১-২৪**

প্রথম অধ্যায়ঃ পরিচিতি ও পরিচিতির প্রকারভেদ **২৫-৬২**

১.১ সমাজ ও পরিচিতি ২৫-৩০

১.২ পাশ্চাত্য দর্শনে ব্যক্তি পরিচিতি ৩০-৩৮

১.৩ সমাজ বিজ্ঞান ও মানবিক বিজ্ঞানে পরিচিতি ৩৮-৪১

১.৪ পরিচিতির গঠন সম্পর্কিত তত্ত্ব ৪১-৪৬

১.৫ ব্যক্তি পরিচিতির ধরণ বা প্রকারঃ- গোষ্ঠীগত ও জাতিগত পরিচিতি, ধর্মীয় পরিচিতি ও লিঙ্গগত পরিচিতি ৪৬-৫৮

১.৬ আন্তঃব্যক্তিক পরিচিতির গঠন ৫৯-৬০

১.৭ পরিচিতির উপর বিভিন্ন প্রভাব ৬০-৬২

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ পেশাগত পরিচিতি এবং তার গঠন **৬৩-৮২**

২.১ পেশা কাকে বলে? ৬৩-৬৬

২.২ পেশাগত পরিচিতির গঠন ৬৬-৭০

২.৩ পেশাগত পরিচিতি নির্মাণের ইতিহাস ৭০-৮২

তৃতীয় অধ্যায়ঃ পেশাগত পরিচিতির সংকট ও বিশ্বায়ন **৮৩-১১৫**

৩.১ বিশ্বায়ন নিয়ে দু'চার কথা ৮৪-৮৭

৩.২ বিশ্বায়ন বনাম পেশাগত পরিচিতির সংকট ৮৮-১০০

৩.৩ বিশ্বায়নের প্রভাবঃ প্রতিযোগিতা, অর্থের অভাব, ব্যর্থতার ভয় ১০০-১১৫

চতুর্থ অধ্যায়ঃ উদারনীতিবাদ ও তার প্রকারভেদ **১১৬-১৪৭**

৪.১ উদারনীতিবাদের উদ্ভব ১১৬-১২২

৪.২ সাবেকী উদারনীতিবাদ ১২২-১৩৫

৪.৩ আধুনিক উদারনীতিবাদ ১৩৫-১৪২

৪.৪ নয়া-উদারনীতিবাদ ১৪২-১৪৭

পঞ্চম অধ্যায়ঃ উদারনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পেশাগত পরিচিতির সংকটের তুলনামূলক আলোচনা **১৪৮-১৭৯**

৫.১ থমাস হবস্, জন লক, অ্যাডাম স্মিথ, টি.এইচ. গ্রীন, জেরেমী বেন্থাম ও জেমস্ মিল এর আলোচনা ১৪৮-১৫৭

৫.২ জন রলস্ ১৫৭-১৬৪

৫.৩ রবার্ট নোজিক ১৬৫-১৭০

৫.৪ ফ্রেডরিক হায়েক ১৭০-১৭৯

মূল্যায়নঃ ১৮০-১৮৬

গ্রন্থপঞ্জী ১৮৭-১৯৩

ভূমিকা

দর্শনের ছাত্র হওয়ার সুবাদে মূল সত্য হিসাবে এটা বুঝেছি যে জগৎ ও জাগতিক বস্তুর কোনোটিই স্থায়ী বা চিরন্তন নয়। পরিবর্তনশীলতাই জগতের ধর্ম। পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠেছে সমাজ নামক ধরাছোঁয়াহীন এক ব্যবস্থাপনা। মনে করা হয় মানুষ তার প্রয়োজনীয় সকল চাহিদা সামগ্রী লাভ করেছে এই সমাজ উৎপত্তির মধ্য দিয়ে। সেইসঙ্গে তার সম্পদ ও সম্পত্তি সুরক্ষিত থাকবে সমাজ নামক ব্যবস্থাপনাটির মধ্যে দিয়েই। আজ একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আমরা বুঝতে শিখেছি মানুষ বড় বেশি অসহায়। আজ গোটা পৃথিবীতেই ঠান্ডা লড়াই সর্বত্র প্রবহমাণ। উত্তর ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে আজ বিশ্বের দূর্বলতম দেশগুলি অসহায় বোধ করছে। আমরা বৈজ্ঞানিক দিক থেকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ হয়েছি ঠিকই। অর্থাৎ 'তথ্যপ্রযুক্তিগত বিপ্লব' এর ফলে মানুষ অনেক বেশি অতিমানব হয়ে উঠেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে। আবার একইভাবে অবনমন ঘটেছে মানুষের নৈতিকতায়, মানুষের মূল্যবোধ ও সেইসঙ্গে মানুষের রুচি ও ব্যবহারে। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে মানুষ কি তাহলে তার রুচিবোধ, মূল্যবোধ, ভাবাবেগ এগুলিকে চিরকালীনভাবে বিসর্জন দেবে? সমাজের স্বাভাবিক রীতি-নীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি শিথিল হবার কারণে কি আবার তা পুনর্গঠনের প্রয়োজন পড়বে?

আমরা লক্ষ্য করেছি ফ্যাসিবাদ, সাম্যবাদ ইত্যাদি মতবাদের ভিত অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে সভ্যতার স্বাভাবিক প্রগতির কারণে। মানবসভ্যতা আজ অনেক বেশি জটিল ও দুর্বোধ্যতায় পরিপূর্ণ। গোটা পৃথিবী জুড়েই যেন প্রতিযোগিতার আসর তৈরি হয়েছে। মানুষের রুচি ও ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন নতুন লোভনীয় সম্ভার নিয়ে হাজির বিশ্বের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। তা থেকে মুখঘুরিয়ে রাখার অবকাশ বা সামর্থ্য কোনটাই হয়তো আমাদের নেই। সেই 'যন্তরমন্তরে'র মধ্যে যেন আমরা ঢুকে পড়তে বাধ্য। এই পরিস্থিতি থেকে শিক্ষাব্যবস্থা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, কৃষিব্যবস্থা, সামাজিক আচার আচরণ, সামাজিক বিশ্বাস কোনটাই মুক্ত হতে পারে নি। মানুষজন সামঞ্জস্যহীনতা, অনিশ্চয়তা, দুশ্চিন্তা, হতাশার মধ্যে আবর্তিত হয়ে চলেছে।

আবার বিশ্বায়নের দৌলতে একলহমায় গোটা পৃথিবী আজ হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। ফলত নব নব হাতছানি ক্রমশ প্রসারিত। দুনিয়াটা আজ বৈশ্বিক গ্রামে (Global Village) পরিণত হয়েছে। ফলে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সবাই এখানে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে গোটা পৃথিবী আজ বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলি। মানবিক মূল্যবোধের অভাব, মানবাধিকার লঙ্ঘন, প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা, পরিবেশ দূষণ, মৌলবাদী চিন্তা-ভাবনা, জাতিগত বৈষম্যের পাশাপাশি আরও একটি নতুন সমস্যা এসে হাজির, তা হল পেশাগত পরিচিতির সংকট।

কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র-দার্শনিকদের মতে রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য হল জনগণের কল্যাণার্থে কাজ করা। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাঁরা যে সমস্ত নীতি প্রবর্তন করেন, তা জনগণের কল্যাণ হবে এই ভেবেই। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তাদের এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত না হওয়ার সম্ভবনা থেকে যেতে পারে। ফলত সব নীতিরই বাস্তবায়নের পথে কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হবার সম্ভাবনা থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে। এই রকমই একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া পেশাগত পরিচিতির সংকটের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে।

আজকের যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি সেখানে রয়েছে বিশ্বায়িত অর্থনীতি এবং তদ্-অনুযায়ী রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য ব্যবস্থা। প্রশ্ন হলঃ এই বিশ্বায়িত অর্থনীতি যদি যুগের প্রয়োজনে উদ্ভূত হয়, তাহলে তার চালিকা শক্তি কি নয়া-উদারনীতিবাদ? নয়া-উদারনীতিবাদ এবং বিশ্বায়িত অর্থনীতি পরস্পর নির্ভরশীল। নয়া-উদারনীতিবাদ বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে আবির্ভূত হলেও, যে গুটি থেকে সে খোলস ত্যাগ করেছে তার আবির্ভাব এবং বিবর্তন না জানলে একবিংশ শতাব্দীর এই প্রান্তবাসীজনের পরিচিতির সংকট জানা এবং বোঝা অধরা থেকে যাবার সম্ভাবনা আছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ইউরোপে এক নব জাগরণ শুরু হয়। যার মধ্য দিয়ে গতানুগতিক ভাবনা-চিন্তার জগৎ উত্তীর্ণ হয় শিল্প

বাণিজ্যের ভাবনার জগতে। ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার আমূল পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ধরা যাক, কৃষিকাজের সঙ্গে সংযুক্ত প্রবহমাণ একজন চাষীর যে ভাবাবেগ, যে অনুভূতি, যে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রভৃতি তা এই দ্রুত গতিতে পরিবর্তিত সমাজের মধ্যে একই পদক্ষেপে অগ্রসর হতে পারে না। যার ফলে তাদের মধ্যে দেখা দেয় 'Cultural Lag'। আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক সমাজের এই দ্রুত পরিবর্তনের থেকে সে পিছিয়ে পড়ে। ফলে তার কিছু সংকট তৈরি হয়। এই জাতীয় সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্র-তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটতে দেখা গেছে। এই রকমই একটি জনকল্যাণকর রাষ্ট্রতত্ত্ব হল উদারনৈতিক তত্ত্ব। যদিও তা কালের নিরীখে দার্শনিক মহলে তা সময় বিশেষে বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। এই উদারনৈতিক তত্ত্বের প্রধানত দুটি দিক আমরা লক্ষ্য করি, তা হল রাজনৈতিক দিক এবং অপরটি হল অর্থনৈতিক দিক। অর্থনৈতিক উদারনীতিবাদের অনিবার্য পরিণতি হল পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে দোরগোড়ায় হাজির পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপনা। যার উদ্দেশ্যই হল মুক্ত বাজারের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণে ধনসম্পত্তিকে বৃদ্ধি করা।

সাধারণত উদারনীতিবাদকে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ (Classical Liberalism), আধুনিক উদারনীতিবাদ (Modern Liberalism) এবং নয়া-উদারনীতিবাদ (Neo-Liberalism)। আমার গবেষণামূলক নিবন্ধে আমি দেখানোর চেষ্টা করবো পেশাগত পরিচিতির সমস্যা বা সংকট তৈরি হবার মূলে হল পুঁজিপতিদের শিল্প বিষয়ক ভাবনা-চিন্তা, যা সংক্ষেপে পুঁজিবাদ নামে পরিচিত। আমি দেখানোর চেষ্টা করবো যে, এই সমস্যা তৈরি হওয়ার মূল সূত্র লুকিয়ে আছে এই উদারনীতিবাদ সম্পর্কিত তত্ত্বের মধ্যেই। তাই উদারনৈতিক তত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়েই এই পেশাগত পরিচিতির সংকটের মূল কারণ কি? এবং তা থেকে বেরিয়ে আসার আদৌও কোন পথ খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা? সেটা দেখাই আমার গবেষণার মূল আলোচ্য বিষয়।

গবেষণামূলক প্রশ্ন –

১) পেশাগত পরিচিতির সংকটের মূল কারণ কি?

২) পেশাগত পরিচিতি রক্ষা করার কোন উপায় আদৌ আছে কি?

৩) পেশাগত পরিচিতির সংকটের মূলে উদারনীতিবাদীতত্ত্ব- এই পূর্বস্বীকৃতি কতটা গ্রহণযোগ্য?

আমার এই গবেষণা নিবন্ধে মূলত আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি যে উদারনীতিবাদী আলোকে বা দৃষ্টিভঙ্গিতে পেশাগত পরিচিতির সংকট কিভাবে আসে এবং কেন আসে? তার একটা বিচারমূলক বিশ্লেষণ করা। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমি সম্পূর্ণ গবেষণামূলক অভিসন্দর্ভকে মোট পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি।

আমি প্রথম অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করেছি পরিচিতি কাকে বলে এবং তা কতরকমের হতে পারে- তাই প্রথমেই আলোচনা করব পরিচিতি বলতে কী বোঝায়? সমাজে প্রতিটি মানুষের একাধিক পরিচিতি থাকতে পারে এবং সেই পরিচিতি অনুসারে প্রত্যেকের সামাজিক ভূমিকাও আলাদা আলাদা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পরিচিতি বা Identity[1] শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন (Latin) শব্দ ‘Idem’ থেকে। যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো ‘The Same’ অর্থাৎ একই। সাধারণতঃ পরিচিতি বলতে ‘Self Identity’ কেই বোঝানো হয়ে থাকে। এখানে Self Identity বলতে অনেকে স্মৃতির সাহায্যে অভিন্নতাকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে। যেমন- জন লক। আবার অনেকে মস্তিস্কের অভিন্নতা বা এর অভিন্নতার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির অভেদকে বোঝাতে চেয়েছেন। যেমন- সুমেকার। আবার বার্নাড উইলিয়মস্ তাঁর ‘Problems of the Self’ নামক বিখ্যাত গ্রন্থের ‘Self and the Future’ নামক অধ্যায়ে দেহের অভিন্নতার সঙ্গে ব্যক্তিঅভেদের ব্যাখ্যা করেছেন। যদিও তা আবশ্যিক শর্ত কিন্তু পর্যাপ্ত শর্ত নয়।

---

[1] Lawler Steph, Identity, Cambridge, Polity Press, 2014, P-10.

অর্থাৎ পাশ্চাত্য দর্শনে Personal Identity বা ব্যক্তির অভেদ সম্পর্কে অ্যারিস্টটল, জন লক, ডেভিড হিউম, সুমেকার, বার্নাড উইলিয়ামের তত্ত্ব খুব সংক্ষিপ্ত আকারে এই অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি।

পরিচিতি নামক শব্দটির নানা অর্থ হতে পারে অর্থাৎ পরিচিতি নামক শব্দটি যেমন, মানবজাতির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে, তেমনই আবার অ-মানবজাতির ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হতে পারে। আমার আলোচনার পরিসর কেবলমাত্র মানব জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কাজেই পরিচিতি বলতে মানবজাতির পরিচিতিকেই বুঝবো। আবার মানবজাতির ক্ষেত্রেও এই পরিচিতি নামক শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই আমি আমার গবেষণামূলক প্রবন্ধে সমাজস্থ ব্যক্তির পরিচিতি সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনের দিক থেকেই আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই পরিচিতি নামক ধারণাটি তেমনভাবে জনপ্রিয় ছিলনা। কিন্তু তার পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে Riceman ও Stein কর্তৃক সম্পাদিত 'The Lonley Crowd' (১৯৫০) ও 'Identity an Anxiety' (১৯৬০) গ্রন্থদ্বয় প্রকাশের মাধ্যমে বিষয়টি অতি জনপ্রিয়তা লাভ করে। সমাজ বিজ্ঞানে এবং মানবিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও গবেষণায় পরিচিতির ধারণাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই সমস্ত তত্ত্ব ও গবেষণায় 'আত্মা' ও 'Self' শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয় পরিবর্তনযোগ্য শব্দ হিসাবে। আবার অনেক সময় আত্ম পরিচিতি (Self Identity) ও অহং পরিচিতি (Ego Identity) ধারণা দুটিকে একত্রিত করার মধ্য দিয়েও পরিচিতি বিষয়টিকে বোঝানো হয়ে থাকে। যেমন- রাজনৈতিক পরিচিতি, অর্থনৈতিক পরিচিতি ও ধর্মীয় পরিচিতি ইত্যাদি। সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব ও গবেষণায় বিভিন্ন ধরনের পরিচিতির মধ্যেও পৃথকীকরণ করা হয়। যেমন-পরিচিতির 'ধরণ' হিসাবে জাতিগত, লিঙ্গগত, গোষ্ঠীগত, ভাষাগত, পেশাগত, সংস্কৃতিগত ও দৈহিক বিষয়ক ইত্যাদি। উপরোক্ত বিভিন্ন ধরনের পরিচিতির ধারণার মধ্যে একটি সাধারণ পার্থক্য তৈরী হয়- যেমন, একদিক থেকে ব্যক্তিগত ও অন্যদিক থেকে সামাজিক পরিচিতির মধ্যে। অপর এক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সামাজিক পরিচিতি বলতে বোঝায় একজনের সামাজিক ভূমিকাকে (Role)। যেমন– সামাজিক ভূমিকা

হিসাবে লিঙ্গ, জাতি, ধর্মীয়, পেশাগত, রাজনৈতিক, আদর্শগত সেইসঙ্গে জাতীয় গোষ্ঠীর সদস্য ইত্যাদি হিসাবে। এইভাবে এই সমস্ত ভূমিকাগুলির সংযোজনের সাহায্যে একজন ব্যক্তির পরিচিতি গড়ে ওঠে। যেমন- দৈহিক কাঠামো, একইভাবে কথা বলা, একই সামাজিক শ্রেণির মধ্যে অবস্থান, একই অর্থনৈতিক কাঠামো ইত্যাদি। ঠিক এই রকমই আরেকটি পরিচিতি হল পেশাগত পরিচিতি। তবে প্রাথমিকভাবে সমাজের মানুষের বা প্রত্যেক ব্যক্তির পরিচিতি দুই ভাবে নির্ধারিত হয়ে থাকে।

প্রথমতঃ আরোপিত অর্থে অর্থাৎ একজন ব্যক্তির জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সমাজে তার যে পরিচিতি যেমন- লিঙ্গগত, ধর্মগত, জাতিগত প্রভৃতি; এবং

দ্বিতীয়তঃ অর্জিত অর্থে অর্থাৎ নিজের চেষ্টায় একজন ব্যক্তি তার বুদ্ধি ও দক্ষতা দ্বারা সামাজিক পরিচিতি অর্জন করতে পারে। যেমন- গোষ্ঠীগত, ভাষাগত, পেশাগত, সংস্কৃতিগত ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি পেশাগত পরিচিতি এবং তার গঠন বিষয়ে। সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি মানুষই কোন না কোন পেশার মধ্য দিয়েই জীবিকা অর্জন করে থাকে। তাই আমরা প্রথমেই জানার চেষ্টা করবো এই পেশা কাকে বলে। অর্থাৎ পেশার ব্যাখ্যা কি? 'পেশা' শব্দটি এসেছে ফার্সী ভাষা থেকে, যার অভিধানগত অর্থ হল 'বৃত্তি'। আর এই 'বৃত্তি' শব্দটির ইংরেজি অর্থ Occupation, কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে পেশা বলতে বিশেষ এক ধরনের বৃত্তিকে বোঝায়, যার ইংরেজি প্রতিশব্দ Profession, সাধারণভাবে Occupation আর Profession শব্দ দুটি প্রচলিত অর্থে সমার্থক মনে হলেও শব্দ দুটির অন্তর্নিহিত অর্থ এক নয়। তবে সাধারণভাবে বৃত্তি বলতে আমরা যে কোন কাজকেই বুঝে থাকি।

রবার্ট এল বার্কার তাঁর 'Dictionary of Social Work' গ্রন্থে পেশার ব্যাখ্যায় বলেছেন- পেশা হল জীবিকা অর্জনের জন্য বহুদিন ধরে সিলেবাসের আওতায় থাকা তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, সেই জ্ঞানকে যখন অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে তথা জীবন ধারণের উপায় হিসেবে প্রয়োগ করা যায়, তখন তাকে

পেশা বলে বিবেচিত করা হয়ে থাকে। আর এই পেশার ভিত্তিতে একজন ব্যক্তির যে পরিচিতি গড়ে ওঠে তাকেই পেশাগত পরিচিতি বলে।

উইলবার্ট ই মোর তাঁর 'The Profession: Rule and Rules' গ্রন্থে পেশাগত পরিচিতির ব্যাখ্যায় বলছেন- পেশাগত পরিচিতি বলতে সমাজে অবস্থিত কোন শ্রেণী নিজস্ব পেশার ভিত্তিতে যে পরিচয় গড়ে ওঠে, তাকেই পেশাগত পরিচিতি বলে। এই পেশার ভিত্তিতে তার সামাজিক মান-মর্যাদা, অর্থনৈতিক অবস্থা, বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে উঠতে সাহায্য করতে পারে।

এই পেশাগত পরিচিতির বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, যাদের বেশিরভাগই জোর দেয় কোন একটি বিশেষ পেশার ক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষিত ব্যবহার ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশের উপর। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে ডাক্তারদের কথা বলা যেতে পারে। লন্ডনের রয়েল কলেজের ডাক্তাররা 'Doctors in Society' নামক Journal এ এবিষয়ে বলেন যে, পেশাগত পরিচিতি হল- একগুচ্ছ মূল্যবোধ, আচরণ এবং সম্পর্কের এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি যা একজন মানুষের ডাক্তারদের প্রতি আস্থা নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে। অর্থাৎ

> "a set of values, behaviors and relationships that underpins the trust the public has in doctors."[2]

পেশাগত পরিচিতির সংগঠন এবং উন্নয়ন আসলে ব্যক্তিগত পরিচিতি গঠনের মধ্যেই অন্তর্নিহিত। এই পেশাগত পরিচিতি নির্মাণের বিষয়টি মানুষের জন্মলগ্ন থেকেই শুরু হয়ে যায় বলে মনে করা হয়। কারণ লিঙ্গ, জাতি, বর্ণ, ধর্ম প্রভৃতি পরিচিতির সংমিশ্রণেই গড়ে ওঠে।

---

[2] Royal College of Physicians of London, *Doctors in Society: Medical Professionalism in a Changing World*, London, UK, 2005. /Cruess, R. L, Cruess S. R, Boudreau, J. D, Snell, L, Steinert. Y, *Reframing medical education to support professional identity formation.* Acad Med., 2014, pp-1446-51. doi: 10.1097/ACM.0000000000000427. PMID: 25054423, p-1447.

পেশাগত পরিচিতি বিষয়ক আলোচনা করতে গেলে আমরা এভাবে ভাবতে পারি, ব্যক্তিরা কিভাবে নিজেদের দেখে ও সংজ্ঞায়িত করে এবং অন্য লোকেরা কিভাবে তাকে দেখে ও সংজ্ঞায়িত করে। ধরা যাক, আমরা বলতে পারি, বিমল নিজেকে সৎমানুষ হিসাবে দেখে কিন্তু অন্যান্য লোকেরা বিমলকে শিক্ষক হিসাবে চেনেন। অর্থাৎ বিমলের পরিচয় শুধুমাত্র সৎ মানুষ বা শুধুমাত্র শিক্ষক হিসাবে নয়, তার পরিচয় সৎ-শিক্ষক হিসাবেও। এখানে সে না চাইলেও তার পরিচয় তার পেশার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে। পেশাগত পরিচয়ের মধ্যে রয়েছে মূল্যবোধ, অনুভূতি, বোঝা পড়ার মনোভাব, সেইসঙ্গে পটভূমি, জাতিসত্তা এবং সংস্কৃতি। এই পেশার মধ্যে মানুষের অবস্থা, তাদের ভূমিকা, দায়িত্ব, অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্ক এবং সহকর্মীদের সঙ্গে তারা কিভাবে সম্পর্কগুলি উপলব্ধি করে তার সাথে সম্পর্কিত।[3]

আমি তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি পেশাগত পরিচিতির সংকট ও বিশ্বায়ন বিষয় সম্পর্কে। এখন দেখা যাক এই পেশাগত পরিচিতির সংকট কিভাবে আসে এবং কেন আসে? বিভিন্ন ধরনের পেশাগত পরিচিতি কালের নিয়মে অর্থাৎ বিশ্বায়নের ফলে উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তিগত নানা দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষেরা তাদের বংশানুক্রমিক ঐতিহ্যবাহী পেশাকে হারাতে চলেছে। সাধারণত যেকোন বিষয়ই সংকটের সম্মুখীন হয় তার কিছু প্রতিবন্ধকতার কারণে বা সময়ের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পারলে। এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন বিশ্বায়ন কাকে বলে এবং বিশ্বায়নের মূল বৈশিষ্ট্য কি? সাধারণ ভাবে বলা যেতে পারে, বিশ্বায়ন একটি সামগ্রিক ধারণা, যার মাধ্যমে সারাবিশ্বে পণ্য ও সেবার অবাধ প্রবাহ এবং বিনিময় সংঘটিত হয়ে চলেছে। শিক্ষা, গবেষণা, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, উৎপাদিত পণ্য, সংস্কৃতি কোন নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

---

[3] Antonio Bolívar Botía, Jesús Domingo Segovia, Purificación Pérez-García, *Crisis and Reconstruction of Teachers' Professional Identity: The Case of Secondary School Teachers in Spain,* The Open Sports Science Journal, Bentham Open, 2014, pp-106-112.

এ গিডিংস তাঁর ‘Europe in the Global Age’ গ্রন্থে বলেন- বিশ্বায়ন হল বিশ্বব্যাপী সামাজিক সম্পর্ক্য সমূহের ঘনীভবন হল বিশ্বায়ন। আবার মার্টিন এলব্রো বলেন- বিশ্বায়ন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে পৃথিবীর যাবতীয় মানুষ একটি বৈশ্বিক সমাজে অন্তর্ভুক্ত হয়।

উক্ত আলোচনা থেকে বলা যেতে পারে যে, এই সমস্যা লুকিয়ে আছে বিশ্বায়ন নামক তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই। বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল মুক্ত বাজার। আর এই মুক্ত বাজারই হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। এই মুক্ত বাজারের মূল ভিত্তি হল ব্যক্তিস্বাধীনতা। যা থেকে অনিবার্য ভাবে নিঃসৃত হয় পুঁজিবাদের। আর পুঁজিবাদের ধর্ম হল অর্থনৈতিক বৈষম্য, যা সমাজে একটি শ্রেণীর মানুষের পেশাগত পরিচিতির সংকট তৈরি করতে পারে। এই বিশ্বায়নের ফলে বর্তমান সমাজে দুভাবে পেশাগত পরিচিতির সংকট তৈরি হতে পারে- ১) বংশপরম্পরা পেশা থেকে বেরিয়ে না আসতে পারার কারণে, এবং ২) বংশগত ঐতিহ্যপূর্ণ পেশাকে টিকিয়ে রাখতে না পারার কারণে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় এক সময়ে হস্ত চালিত তাঁতশিল্পীদের তৈরি শাড়ি তাদেরকে জগৎ বিখ্যাত করেছিল কিন্তু বর্তমানে বিশ্বায়নের ফলে তারা তাদের সেই ঐতিহ্যবাহী পেশাকে ধরে রাখতে না পেরে, তারা আজ দিশাহারা হয়ে পড়েছে। ফলে তাদের একটি সংকট দেখা দিয়েছে এবং তাহল পেশাগত পরিচিতির সংকট।

চতুর্থ অধ্যায়ে আমি উদারনীতিবাদ এবং তার শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। রাষ্ট্রদর্শনে জনকল্যাণের জন্য আজ পর্যন্ত যে সমস্ত তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে জনপ্রিয়তার শীর্ষে যেমন উঠেছে উদারনৈতিক রাষ্ট্রতত্ত্ব, তেমনই সেই তত্ত্ব সমালোচনার উর্ধ্বেও উঠতে পারে নি। ইংরেজি শব্দ ‘Liberalism’ যার বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে আমরা ব্যবহার করি ‘উদারনীতিবাদ’। যদি আমরা শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিকে লক্ষ্য রাখি তাহলে আমরা দেখব যে, এই ‘Liberalism’

নামক ইংরেজি শব্দটি ল্যাটিন শব্দ ‘Liber’ এর থেকে উৎপত্তি।[4] যার ইংরেজি অর্থ হল Liberty বা স্বাধীনতা। ‘Liberal’ শব্দটির ব্যবহার আমরা চতুর্দশ শতকে লক্ষ্য করি, যদিও তা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হত। কখনো এই ‘Liber’ শব্দটির অর্থ বলতে বোঝানো হতো মুক্ত মানুষের শ্রেণীকে আবার কখনো ভূমিদাসের মতো দায়বদ্ধ কৃষক বা ক্রীতদাসদের থেকে ভিন্ন এমন মানুষদেরও বোঝানো হত। আবার কখনো এই আলোচিত শব্দটির মধ্যে দিয়ে মুক্তচিন্তা বা মুক্ত মননকে বোঝানো হত। প্রসঙ্গত মুক্ত মনন বা মুক্ত চিন্তার কথা এলেই যে বিষয়টি স্বাভাবিক ভাবে উঠে আসে, তাহল স্বাধীনতা এবং নিজস্ব নির্বাচন ক্ষমতা। উৎপত্তিগত দিক থেকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখব উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে অর্থাৎ ১৮১২ সালে এই ‘Liberalism’ শব্দটির প্রথম প্রয়োগ ঘটে স্পেন নামক দেশে।[5] কিন্তু এই রাজনৈতিক ধারণাটি শুধুমাত্র স্পেনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। ১৮৪০ সালের মধ্যেই তা ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে, তার স্বতন্ত্র রূপ নিয়ে। যদিও প্রাথমিক অবস্থায় উদারনীতিবাদ যে রূপে আবির্ভূত হয়েছিল তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। এপ্রসঙ্গে Andrew Heywood তাঁর ‘Political Ideologies: An Introduction’ গ্রন্থে দাবি করেন-

“The term ‘liberalism’ to denote a political allegiance made its appearance much later: it was not used until the early part of the nineteenth century, being first employed in Spain in 1812. By the 1840s, the term was widely recognized throughout Europe as a reference to a distinctive set of political ideas.”[6]

---

[4] Heywood, Andrew, *Political Ideologies: An Introduction*, 4th Edition, Palgrave Macmillan, New York, 2007, p-23.

[5] Ibid, p-23.

[6] Ibid, p-23.

যদিও মার্কসবাদী ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দর্শনের দ্বারা উদারনীতিবাদ বারবার সমালোচিত ও নিন্দিত হয়েছে। কিন্তু তাহলেও ৩০০ বছরেরও বেশি সময়কাল ধরে এই রাষ্ট্র তত্ত্বটি বয়ে চলেছে এবং অধিকাংশ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক মতাদর্শ হিসাবে গৃহীত হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে কিছু পরিবর্তন তাকে নিয়ে আসতে হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মূল বিষয় একই রয়েছে বলে মনে হয়। সেই মূল বিষয়টি হল স্বাধীনতা। উদারনীতিবাদের (Liberalism) মূল কথাটি হল 'রাষ্ট্রের ক্ষমতা সীমিত করতে হবে এবং ব্যক্তির হাতে স্বাধীনতা দিতে হবে। রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের শাসক তার ইচ্ছামত যে কোন ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে না। ব্যক্তির আশা, আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য তার জীবনের বিভিন্ন দিকের পূর্ণতা নিয়ে আসার জন্য স্বাধীনতা একান্ত অপরিহার্য। এই স্বাধীনতাই হল উদারনীতিবাদের মূল বিষয়।

উদারনীতিবাদের কোন একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা না পাওয়া গেলেও আমরা উদারনীতিবাদকে এভাবে ব্যাখ্যা দিতে পারি যে, উদারনীতিবাদ হল এমন একটি চিন্তাদর্শন, যেটি সকল প্রকার কর্তৃত্ববাদ ও নিয়ন্ত্রণবাদের বিরোধিতা করে, ব্যক্তির স্বাধীনতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং তার মাধ্যমে মনুষ্যত্বের মহৎ মর্যাদাকে সুনিশ্চিত করে। প্রকৃতপক্ষে উদারনীতিবাদ যাবতীয় স্বৈরাচারী নিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের কবল থেকে ব্যক্তিকে মুক্ত করে তাকে যথার্থ স্বাধীন করে তুলতে চায়। তাই উদারনীতিবাদ হল ব্যক্তিস্বাধীনতা ও উদার মানবিক চেতনার দিগ্‌দর্শনস্বরূপ।

'Encyclopaedia Britannica' অনুসারে উদারনীতিবাদ হল এমন একটি ধারণা, যা সরকারের কার্যপদ্ধতি ও নীতি হিসাবে, সমাজ গঠনের নীতি হিসাবে এবং ব্যক্তি ও সমাজের একটি জীবনাদর্শ হিসেবে স্বাধীনতাকে গ্রহণ করে।

ও. পি. গাউবা তাঁর 'An Introduction to Political Theory' গ্রন্থে বলেছেন- কর্তৃত্ববাদের বিরোধিতা এবং স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা হল উদারনীতিবাদের মূল কথা।[7] হবহাউজ (Hobhouse) তাঁর 'Liberalism' গ্রন্থে ব্যক্তিত্বের আত্মপরিচালনার

---

[7] Gauba, O. P, *An Introduction to Political Theory,* (4th Edition), Macmillan, 2006, p-24.

ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে সমাজ গঠনের বিশ্বাসকে উদারনীতিবাদ বলে বর্ণনা করেছেন। অন্যভাবে বলা যায়, উদারনীতিবাদ হল এমন একটি স্বাধীন জীবনের কণ্ঠস্বর, যা ব্যক্তির চিন্তা, বিশ্বাস, মতপ্রকাশ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সর্বাধিক পরিমাণ স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়ায় বা কথা বলে।

সাধারণভাবে উদারনীতিবাদকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা- সনাতনী উদারনীতিবাদ (Classical Liberalism), আধুনিক উদারনীতিবাদ (Mordern Liberalism) ও নয়া-উদারনীতিবাদ (Neo-Liberalism)।

সাবেকী বা ধ্রুপদী বা সনাতনী উদারনীতিবাদ (Classical Liberalism):-

সনাতনী বা সাবেকী উদারনীতিবাদের তাত্ত্বিকেরা হলেন-অ্যাডাম স্মিত, টমাস পেইন, জন লক প্রমূখ। মূলত জন লককেই উদারনীতিবাদের জনক বলা হয়। “Locke was a key thinker of early liberalism.”[8] জন লকই প্রথম দার্শনিক, যিনি ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। লক তাঁর ‘Two Treatise of Government’ গ্রন্থে বলেছেন প্রকৃতির রাজ্যে (State of Nature) মানুষ তিন ধরনের অধিকার ভোগ করত, যথা-জীবন, সম্পত্তি এবং স্বাধীনতা। “There are natural rights, though, which Locke usually referred to as ‘life, liberty, and property”.[9] এই তিনটি অধিকার জনগণের মৌলিক অধিকার। যুক্তির মধ্য দিয়ে যখন জনগণ প্রকৃতির রাজ্যে (State of Nature) থেকে বেরিয়ে এসে রাষ্ট্র তৈরী করল, তখন রাষ্ট্রের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াল এই তিনটি অধিকার রক্ষা করা।

সনাতনী উদারনীতিবাদের অপর একজন অন্যতম তাত্ত্বিক হলেন- জেরেমী বেন্থাম। স্মিথের মতো বেন্থামও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুক্ত বাণিজ্য নীতিটিকে সমর্থন করেছিলেন। উপযোগীতা নীতির ভিত্তিতে তিনি এই নীতিকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু তিনি অবাধ বানিজ্যের উপর সরকারী হস্তক্ষেপের সম্পূর্ন বিরোধী ছিলেন না। বেন্থাম

---

[8] Heywood, Andrew, *Politics*, 4th ed. Palgrave foundations, 2007, p-31.

[9] Ball, Terence, *Ideals and Ideologies a Reader*, Pearson, New York, p-55.

তাঁর ‘An Introduction to The Principle Morals and Legislation’ গ্রন্থে উপযোগীতার নীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন–“The greatest happiness of the greatest number of people.”[10] সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক সুখের ধারণা।

সাবেকী উদারনীতিবাদ ব্যক্তিস্বাধীনতার রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিরোধীতা করে। একই সঙ্গে নিয়ন্ত্রন মুক্ত অবাধ বাণিজ্য নীতির কথা বলেন। সাবেকী উদারনীতিবাদের তাত্ত্বিকরা তাঁরা একেবারেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে উপেক্ষা করেন নি। সাবেকী উদারনীতিবাদের মূল ধারণা হল ব্যক্তিস্বাধীনতা। তাহলে আমরা বলতে পারি যে সাবেকী উদারনীতিবাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হতে পারে- ব্যক্তিস্বাধীনতা, রাষ্ট্রের সীমিত ক্ষমতা, পৌরস্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রভৃতি।

আধুনিক উদারনীতিবাদ (Mordern Liberalism):

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এর ধারণার সাথে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনার সংমিশ্রণে আধুনিক উদারনীতিবাদের জন্ম। আধুনিক উদারনীতিবাদ ব্যক্তিবর্গের আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ইতিবাচক অংশগ্রহণের ওপর জোর দিয়েছেন। আধুনিক উদারনীতিবাদের দার্শনিকগণ হলেন টি.এইচ. গ্রীন, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমূখ। কিন্তু আধুনিক উদারনীতিবাদে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি আছে তার মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ব্যক্তিস্বাধীনতা, রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ, উদারনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি, সাংবিধানিক পদ্ধতিতে সরকার পরিবর্তন, আইনের অনুশাসন ও ন্যায়বিচার, জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রনীতি, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের স্বীকৃতি এবং সংখ্যালঘুর প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি।

রাষ্ট্রতত্ত্বের জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালীন সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এই রাষ্ট্রতত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে আধুনিক পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোয় বা রক্ষনশীলবাদ, উদারনীতিবাদ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী

---

[10] Bentham, Jeremy, *An Introduction to The Principle Morals and Legislation*, Batoche Books, Kitchener, 2000.

চিন্তাধারার ফলশ্রুতি হিসাবে। জনকল্যাণকর রাষ্ট্রতত্ত্বের মূল বক্তব্য হল- জনকল্যাণের স্বার্থে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের সীমারেখাকে প্রসারিত করা। তাই জনকল্যাণকর রাষ্ট্রকে 'Theory of State Regulation' নামে অভিহিত করে থাকেন।

জনকল্যাণকর রাষ্ট্র নামটি Archbishop William Temple সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন, তাঁর 'Citizen and Churchmen' গ্রন্থে ১৯৪১সালে। তিনি জনকল্যাণকর রাষ্ট্র বলতে বুঝিয়েছেন, যে রাষ্ট্র আইন ও প্রশাসনের মাধ্যমে অসুস্থ, দরিদ্র, বয়স্ক, পঙ্গু এবং অসহায় মানুষকে সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণাটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও ১৯৩০ এর দশকে ইংল্যান্ডে কল্যাণকর রাষ্ট্রের ভিত্তি রচিত হয়েছিল মূলত শ্রমিক আন্দোলনের জনকল্যাণকর কর্মসূচীর মাধ্যমে।

জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের জনক বলা হয় Lord William Beveridge কে। কারণ ১৯৪২ সালে বিট্রেনের 'Social Insurance and Allied Service' সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন সরকারের কাছে তিনি প্রথম পেশ করেন। আর এই প্রতিবেদনে তিনি রাষ্ট্রের কর্তব্যগুলিকে তুলে ধরেন। যেমন- স্বাস্থ্য পরিষেবা, সামাজিক নিরাপত্তার মতো জনসাধারণের প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু সমূহ। আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট (Roosevelt) এর 'New Deal' এবং রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান (Truemen) এর 'Fair Deal' কর্মসূচীতে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণা ব্যক্ত হয়। ১৯৩৪ সালে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং 'English Poor Law' এর মূখ্য প্রনেতা নাসাঁ সেনিয়র (Nassau Senior) Oxford এর এক ভাষণে বলেন-

> "It is the duty of a Government to do whatever is conducive to the welfare of the Government".[11]

---

[11] *Quoted from Nassau Senior's Lectures* by Marian Bowley, Nassau Senior and Classical Economics, London George Allen and Unwin Ltd, 1937, p-265.

জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন রাষ্ট্র দার্শনিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে এর একটা সন্তোষজনক সংজ্ঞা প্রদানের চেষ্টা করেছেন। G.D.H. Cole এর মতে কল্যাণকর রাষ্ট্র হল-

> "The welfare state is a society in which an assured minimum standard of living and opportunity becomes the possession of every citizen."[12]

অর্থাৎ তিনি জনকল্যাণকর রাষ্ট্র বলতে একটি বিশেষ সমাজব্যবস্থাকে বোঝাতে চেয়েছেন। যেখানে সকল জনগণের জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সমান সুযোগ-সুবিধা বর্তমান থাকে। হার্বাট লেম্যান (Herbert Lehman) কল্যাণকর রাষ্ট্র বলতে বুঝিয়েছেন- জনসাধারণ স্বাধীনভাবে তাদের ব্যক্তিগত ক্ষমতার বিকাশ সাধন করে, তাদের প্রতিভার জন্য ন্যায় সঙ্গত পুরস্কার পায় এবং নিজেদের সুখী করতে পারে। আবার হবম্যান (Hobman) এর ভাষায়-

> "A compromise between the two extremes of Communism on the one hand and unbridled Individualism on the other."[13]

অর্থাৎ জনকল্যাণকর রাষ্ট্র হল সমাজতন্ত্র ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সমন্বয় সাধনের ফল।

আধুনিক কল্যাণকর রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য– মিশ্র অর্থনীতি অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি। এই অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সহাবস্থান থাকলেও বেশ কিছু পার্থক্য বর্তমান। মিশ্র অর্থনীতিতে প্রধান শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রনে রাখা হয়। যেমন- লৌহ-ইস্পাত শিল্প, খনিজ শিল্প, প্রতিরক্ষার সাথে যুক্ত সংশ্লিষ্ট শিল্প ইত্যাদি ব্যক্তিগত ক্ষেত্রগুলিতে ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানাধিন থাকে।

---

[12] *The Indian Political Science Review,* Department of Political Science, University of Delhi, 1978, page-192.

[13] Johari, J. C, *Comparative Politics*, Sterling Publishers, 1972, p-93.

দ্বিতীয়তঃ জনকল্যাণকর রাষ্ট্রতত্ত্বে পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বা পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার পরিবর্তে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা হয়। এই মতবাদের মূলবক্তব্য হল রাষ্ট্রক্ষতিকর নয়। বরং ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য অপরিহার্য।

তৃতীয়তঃ জনকল্যাণকর রাষ্ট্রগুলিতে পরিকল্পিত অর্থনীতির মাধ্যমে উন্নতি বিধানের চেষ্টা করা হয়। পরিকল্পিত অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য হল- ক) প্রয়োজন অনুসারে সম্পদ বণ্টন। খ) ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের মাধ্যমে গঠিত অবাধ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার নৈরাজ্য দূর করা।

চতুর্থতঃ উদারনীতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনকল্যাণকর রাষ্ট্র আস্থাশীল। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে কল্যাণকর রাষ্ট্র স্বীকার করে। তবে অবাধ বাণিজ্যনীতিকে সমর্থন করে না।

পঞ্চমতঃ রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা, শিল্পবাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ, বৃহৎ শিল্প বাণিজ্যের জাতীয়করণ, গতিশীল করব্যবস্থা প্রভৃতি ব্যবস্থা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার জন্য জনকল্যাণকর রাষ্ট্র বিভিন্ন সংস্কারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

নয়া-উদারনীতিবাদ (Neo-Liberalism):

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপে কেইনসীয় অর্থনীতি ও কল্যানব্রতী রাষ্ট্রের তত্ত্ব জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলে। তার কারণ উৎপাদনের শ্লথতা, দ্রব্যসামগ্রীর ও পরিষেবার আপেক্ষিক মূল্যে সমন্বয়ের অভাব। আর্থনীতিক জীবনে বিশৃঙ্খলা এবং বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলনের মাত্রাতিরিক্ত জঙ্গি মনোভাব। সব কিছু মিলিয়ে বলা যায় উদারনীতিক গণতন্ত্রের পশ্চিমী দেশগুলিতে উদারনীতিক রাষ্ট্র তন্ত্রের নতুন মূল্যায়ন নয়া-উদারনীতিবাদ নামে পরিচিতি লাভ করে।

> “Neo-liberalism, sometimes called neoclassical liberalism, refers to a revival of economic liberalism that has taken place since the 1970s. Neo-liberalism is counter-revolutionary: its aim is to

> halt, and if possible reverse, the trend towards 'big' government and state intervention that had characterize much of the twentieth century."[14]

এই সমস্ত সমস্যার সমাধানে উদারনীতিবাদি দর্শনের নবপ্রজন্মের চিন্তাবিদরা বিংশশতাব্দীর অষ্টম দশকে নয়া-উদারনীতিবাদী তত্ত্বের অবতারণা করেন। নয়া-উদারনীতিবাদের প্রধান প্রবক্তাগণ হলেন- ফ্রিডরিক ফন হায়েক, জন রলস্ এবং রবার্ট নোজিক প্রমূখ।

নয়া-উদারনীতিবাদ হল এক ধরনের বাজার মৌলবাদ। বাজার মৌলবাদ বলার কারণ হল বাজার হল সমগ্র সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম চালিকা শক্তি। আর এই বাজারকে সরকারের চেয়ে উন্নত ব্যবস্থা বলে মনে করা হয়। তাই নয়া-উদারনীতিবাদ যদি বাজার মৌলবাদের কথা বলে তাহলে মুনাফার সর্বোচ্চস্তরে উন্নীতকরণকে বোঝায়।

> "Neo-liberalism meant the unambiguous reassertion of the maximization of the profit rate in very dimension of activity."[15]।

এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, নয়া-উদারনীতিবাদ রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ও বিপুল ক্ষমতা সম্পন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মুক্ত বাজার ব্যবস্থার কথা বলতে। নয়া-উদারনীতিবাদের প্রধান দুটি স্তম্ভ হল-**'ব্যক্তি'** ও **'বাজার'**। আর যার মূখ্য উদ্দেশ্য হল রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কাজের পরিধি সঙ্কুচিত করা। নয়া-উদারনীতিবাদ হল নয়া অধিকারের পুনরুজ্জীবন ঘটানো। নতুন নতুন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাজারের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে ব্যক্তির অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ সর্বনিম্ন স্তরে নামিয়ে আনা। তার কারণ রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে কোন গোষ্ঠী যেন

---

[14] Heywood, Andrew, *political ideologies: An Introduction*, 4th Ed. Palgrave Macmillan, 2007, p-52.

[15] Saville, John, Miliband, Ralph, *The Socialist Register*, United Kingdom, Merlin Press, 2003.

অফুরন্ত ক্ষমতার অধিকারী না হতে পারে। তাহলে বলা যেতে পারে নয়া-উদারনীতিবাদের মূল বৈশিষ্ট্য গুলি হল উন্মুক্ত বাজার, ন্যূনতম রাষ্ট্র এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রভৃতি।

নয়া-উদারনীতিক রাষ্ট্র তত্ত্বের চিন্তা-ভাবনা যাঁরা শুরু করেছিনেন ধ্রুপদী উদারনীতির প্রতি তাঁদের ছিল গভীর আনুগত্য। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ফ্রিডরিক ফন হায়েক। তিনি ১৯৩০ র দশকে কেইনসীয় অর্থনীতির বিরোধিতা করে ধ্রুপদী উদারনীতিক রাষ্ট্রতত্ত্বের মূলনীতির সপক্ষে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করেন এবং কেইনসীয় অর্থনীতিক প্রস্তাবগুলির দুর্বলতা বর্জন করে নতুন অর্থনীতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলেন। হায়েক তাঁর ‘The Road to Serfdom’ এবং ‘The Constitution of Liberty’ গ্রন্থদ্বয়ে উদারনীতিবাদের নানা সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তিনি ‘The Constitution of Liberty’ গ্রন্থে উদারনীতিবাদ সম্পর্কে বলেছেন–উদারনীতিবাদ হল প্রধানত রাষ্ট্রের পীড়নমূলক ক্ষমতার ওপর বিধি নিষেধ আরোপ। অর্থাৎ

> “Liberalism is concerned mainly with limiting the coercive powers of all government whether democratic or not.”[16]

তিনি আরো মনে করেন যে, উদারনীতিবাদ ব্যক্তির চিন্তা-ভাবনা, মতামত ইত্যাদির ওপর কোন রূপ বাধা নিষেধ থাকা উচিৎ নয়, এগুলির অবাধ বিকাশের জন্যই প্রয়োজন।

বিংশ শতাব্দীর নয়া-উদারনীতিবাদী চিন্তা-ভাবনার জগতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হলেন মার্কিন চিন্তাবিদ জন রলস্। তিনি ন্যায়বিচার সংক্রান্ত সুবিবেচিত চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার জগতে রাষ্ট্রের কল্যাণকর ভূমিকার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি সুরক্ষিত ও স্বাধীন থাকবে এই ভেবে নয়া-উদারনীতিবাদী তত্ত্বের প্রচার করেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘A Theory of Justice’ (১৯৭১ সালে) এবং

---

[16] Miller, Eugene F, *The Constitution of Liberty*, IEA, London, p-103.

‘Political Liberalism’ (১৯৯৩ সালে) গ্রন্থদ্বয়ে ন্যায়বিচার সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনা বিশদভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি তাঁর ন্যায়বিচার তত্ত্বের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে দিয়ে নয়া-উদারনৈতিক দর্শনের এক নতুন প্রানসঞ্চার করে তাকে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

জন রলস্ রাষ্ট্রদর্শনকে উপযোগবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত করে এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নৈতিকতার ভিত্তিস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। আমরা সকলেই জানি বেন্থামীয় উপযোগবাদের মূল বক্তব্য ছিল যে, রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হল সমাজের বেশিরভাগ অর্থাৎ সংখ্যাধিক্য মানুষের জন্য সর্বাধিক সুখের ব্যবস্থা করা। জন রলস্ এই বক্তব্যের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, **প্রথমত**- সংখ্যাগরিষ্ঠের মঙ্গল চাওয়া যদি এই দর্শনের মূল লক্ষ্য হয়, তাহলে সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থ কে দেখবে? আবার **দ্বিতীয়**- আপত্তিটি হল সর্বাধিক প্রার্থীর সুখ আনাই যদি প্রত্যেক ব্যক্তির মূল লক্ষ্য হয় তাহলে সমাজজীবনে ব্যক্তির ত্যাগ শিকারে নৈতিকতার কোন মূল্য থাকে না। অথচ আত্ম ত্যাগ হল এক মহৎ নৈতিক মূল্যবোধ। এজাতীয় নৈতিক মূল্যবোধ ব্যতিরেকী কি আদর্শ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব?

জন রলস্ তাঁর ‘A Theory of Justice’ গ্রন্থে সামাজিক ন্যায় বিচারের সংজ্ঞায় বলেছেন-

> “The conception of justice I take to be defined by the role its principles in assigning rights and duties and in defining the appropriate division of social advantages. A conception of justice is an interpretation of this role.[17]”

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে অধিকার ও কর্তব্য বণ্টন করে দেওয়া এবং সামাজিক সুযোগ-সুবিধা গুলি যথাযথভাবে বণ্টন করা, এই কাজগুলি যে পদ্ধতির সাহায্যে সম্পাদন করা হয় তাকে ন্যায়বিচার বলা যাবে। রলস্ এর ন্যায়বিচারের

---

[17] Rawls, John, A Theory of Justice, United Kingdom, Harvard University Press, 2005, p-10.

ধারণায় আমরা দেখতে পাই একটি সমাজের মৌলিক কাঠামো এবং সামাজিক আদর্শ, যা একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত। সমাজের কাঠামো যাই হোক না কেন, ন্যায়বিচার হল সামাজিক আদর্শের অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তবে সামাজিক আদর্শ ও সমস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে পার্থক্য থাকতেই পারে।

জন রলস্ এর দৃষ্টিভঙ্গিতে একমাত্র ন্যায়বিচার আত্মপ্রকাশ করতে পারে সামাজিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাসের মধ্য দিয়ে। জন রলস্ ন্যায়বিচার তত্ত্বটিকে ‘ফেয়ারনেস’ (Fairness) শব্দটির মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছন ‘জাস্টিস অ্যাজ ফেয়ারনেস’ (Justice as Fairness) অর্থাৎ ন্যায়বিচার হল সুবিচার বা সততা। তিনি ন্যায়বিচারের ধারণাটিকে জন লক, রুশো এবং কান্ট প্রমূখের সামাজিকচুক্তি থেকে গ্রহণ করেছেন, অর্থাৎ

> “The traditional theory of the social contract as represented by Locke, Rousseau, and Kant.”[18]

কারণ উদারনৈতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এর প্রাধান্য সামাজিক চুক্তির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। উদারনীতিবাদের দ্বৈতক হল উদারপন্থী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। রলস্ তাঁর ‘A Theory of Justice’ গ্রন্থে বলেছেন-

> “Social construct theory seems to offer an alternative systematic account of justice that is superior, or so I argue, to the dominant utilitarianism of the tradition. The theory that results is highly Kantian in nature.”[19]

জন রলস্ এর মতে সেই সমাজই হল ন্যায়সঙ্গত সমাজ যে সমাজে উৎপাদিত সমস্ত বস্তুকে সাধারণ মানুষের মধ্যে সমানভাবে এবং সার্বিক পরিমাণে বণ্টন করা হয়। তবে মনে রাখতে হবে তিনি কিন্তু সমাজের প্রত্যেক মানুষের মধ্যে উৎপাদিত বস্তুকে পরিপূর্ণ

---

[18] Rawls, John, *A Theory of Justice,* Harvard University Press, 1971, p-xviii.

[19] Ibid, p-xviii.

সমানভাবে ভাগ করে দেওয়ার কথা বলেন নি। কারণ রলস্ এর মতে, সমাজে প্রত্যেক মানুষের দর-কষাকষির ক্ষমতা (Bargaining Capacity) অর্থাৎ প্রয়োজন সমান নয়, তাই প্রত্যেকের প্রাপ্য সম্পূর্ণভাবে সমান হতে পারে না।

রলস্ আরও দেখালেন যে, সমাজে প্রত্যেক মানুষের দর-কষাকষির সামর্থ্য এক রকম নয়। তাই প্রত্যেকেই চাইবে ও আপ্রাণ চেষ্টা করবে নিজে লাভবান হতে। আর এখান থেকেই তৈরি হবে নিজেদের মধ্যে প্রাপ্য লাভের ক্ষেত্রে মতানৈক্য। রলস্ যাকে বলেছেন মতানৈক্য (Disagreement)। আর এই মতানৈক্য নিরসনের জন্য প্রয়োজন মতৈক্যর (Agreement)। আর এই মতৈক্য সূচিত হতে পারে জনগণের মধ্যে পারস্পারিক চুক্তির ভিত্তিতে।

রলস্ দেখিয়েছেন, প্রারম্ভিক অবস্থানে অজ্ঞতার ঘেরাটোপের মধ্যে মানুষ কতগুলি- সামাজিক, প্রাথমিক জিনিস (Social Primary Goods) লাভ করার জন্য চুক্তি করেছে। তিনি মনে করেন ব্যক্তি হল স্বাধীন, নৈতিক, যুক্তিগ্রাহী এবং আত্মস্বতন্ত্র। ব্যক্তির এই ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করে রলস্ বলতে চেয়েছেন যেহেতু তারা অজ্ঞতার ঘেরাটোপে ছিল অর্থাৎ চুক্তিকারিরা চুক্তির মধ্যে দিয়ে সমাজব্যবস্থায় কতটা ক্ষমতা ভোগ করবেন তা জানতো না বলেই, প্রয়োজনীয় সামাজিক প্রাথমিক জিনিস গুলিকে যতদূর সম্ভব ন্যায্যভাবে বণ্টন করার নীতি তারা গ্রহণ করেছিল। এই ভাবে রলস্ তাঁর ন্যায়নীতি তত্ত্বে বলতে চেয়েছেন সমাজে সবরকমের সামাজিক প্রাথমিক জিনিস- স্বাধীনতা, সুযোগ, আয়, সম্পদ এবং আত্মমর্যাদা দানকারী বিষয়গুলি সমভাবে বণ্টিত হওয়া উচিৎ। এই বিষয়গুলি অসমবণ্টন করা যেতে পারে, যদি তার দ্বারা সমাজে সবচেয়ে অসুবিধায় আছে এমন এক শ্রেণীর মানুষের উপকার হয়। এই কাজ করতে গিয়ে রলস্ ন্যায়নীতির দুটি মূল নীতির এবং দুটি অগ্রাধিকারের বিধির কথা বলেছেন।[20] রলস্ এর ন্যায়নীতির **প্রথম নীতিটি হল**- সকলের জন্য মৌল স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা।

---

[20] Gauba, O. P, *An Introduction to Political Theory,* (4th Edition), Macmillan, 2006, p-383.

দ্বিতীয়টি হল- সকলের সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে ন্যায়সম্মত সমতা। এই দুই নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দুটি অগ্রাধিকারের নীতি-(a) **প্রথমতঃ** স্বাধীনতার গুরুত্ব সুযোগের সমতা থেকে বেশি।[21] (b) **দ্বিতীয়তঃ** অগ্রাধিকারের বিধিতে বলা হয়েছে, সুযোগের ক্ষেত্রে ন্যায়সম্মত সমতা বণ্টন ব্যবস্থায় দক্ষতার চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে। অর্থাৎ বণ্টন ব্যবস্থাতে দক্ষ প্রশাসনের মাধ্যমে ন্যায়সম্মত করতে গিয়ে কখনোই যেন সবার জন্য সুযোগের ন্যায়সঙ্গত সমতা বিঘ্নিত না হয়।[22]

নয়া-উদারনীতিবাদের অপর এক খ্যাতিমান প্রবক্তা হলেন রবার্ট নোজিক। তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ 'The Anarchy, State and Utopia' এখানে তিনি অধিকার ও স্বাধীনতাকে যেকোন অবস্থায় অগ্রাধিকার দানের কথা বলেন। তার কারণ মানুষের অধিকারকে অগ্রাধিকার দিলে তার হকদায়িত্ব এসে যায় এবং সেই হকদায়িত্বের জোরে নাগরিক যেন সমস্ত সুযোগ ভোগ করতে পারে, যেগুলি তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলে। কিন্তু নোজিক লক্ষ্য করলেন যে, রাষ্ট্র জনগণের সার্বিক কল্যাণ করার নামে এমন সব কর্মসূচি গ্রহণ করছে, যেগুলি ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী। নোজিক, হায়েক এবং রলস্ এর মতো মুক্ত বাজার নীতির প্রতি তাঁর অকৃত্রিম আস্থার কথা স্বীকার করেন। তাঁর মতে অবাধ বাণিজ্য নীতি যেন এক ঢিলে দুই পাখি মারার মতো। **এক**- ব্যক্তিস্বাধীনতা সুনিশ্চিত করবে এবং **দুই**- সমাজের কল্যান সাধন করতে পারবে।

নয়া-উদারনীতিবাদ সম্পর্কে নোজিক যে ধারণা পোষণ করেন, তার মূল বিষয়টি হল- রাষ্ট্র বিরোধী মনোভাব। এপ্রসঙ্গে Andrew Heywood বলেন,

> "The liberal new right is not only-statist on grounds of economic efficiency and responsiveness, but also because of its

---

[21] Rawls, Jhon, *A Theory of Justice*, London, Oxford University Press, 1972, p-60.

[22] Ibid, p-60

> political principles notably its commitment to individual liberty."[23]

রাষ্ট্রের ক্ষমতার সীমিতকরণ সম্ভব হলে ব্যক্তিস্বাধীনতার বিকাশ সাধন হবে। নোজিক এর এই নয়া-উদারনীতিবাদকে রাষ্ট্র বিরোধী মতবাদ নামেও অভিহিত করা হয়েছে। নয়া-উদারনীতিবাদ রাষ্ট্রের ক্ষমতা হ্রাসের ধারণাটি অন্যান্য তাত্ত্বিকদের মতো নোজিকও সমর্থন করে বলেছেন Rolling Back the State। রাষ্ট্রের ক্ষমতা হ্রাসের মাধ্যমে সমাজকল্যান সম্পর্কীত ধারণাটিও গুরুত্ব হারাবে।

> "The principle threat to individual freedom can only be ensured by rolling back the state–this, in particular, means rolling back social welfare."[24]

যে কোন কল্যাণকর রাষ্ট্রের বিশেষ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হল জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্র নানা রকম প্রকল্প এবং কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং সেই অনুযায়ী তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। অর্থাৎ সমাজের কল্যাণের কারণে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে, তাতে কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সাফল্য মন্ডিত না হওয়ার কারণে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়, তাহলে প্রশ্ন হল এই সমস্ত সমস্যার উদ্ভবের কারণ কী? তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ সমাজ যে সমস্ত নীতিগুলি প্রযুক্ত হয় সামগ্রিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে সেই নীতিগুলি সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তার প্রয়োজন বা সেই নীতিগুলির কার্যকারীতা সম্পর্কে দার্শনিক প্রশ্ন তোলা যেতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়ে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি, বিভিন্ন উদারনীতিবাদী তত্ত্বের মধ্য দিয়ে কিভাবে এই পেশাগত পরিচিতি সংকট তৈরি হতে পারে তার একটি তুলনামূলক আলোচনা। এখন দেখা যাক পেশাগত পরিচিতি সংকট সাবেকী উদারনীতিবাদী তত্ত্বে

---

[23] Heywood, Andrew, *Political Ideologies: An Introduction*, (5th Ed.), Palgrave, 2012, p-90.

[24] Ibid, p-90.

কিভাবে আসে? আমরা যদি সাবেকী উদারনীতিবাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা একটি বিশেষ ভিত্তি এবং এই বৈশিষ্ট্যটি যদি থাকে তাহলে তা থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হবে পুঁজিবাদ। কারণ পুঁজিবাদের রাজনৈতিক দর্শন হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। আর পুঁজিবাদ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হবে অর্থনৈতিক বৈষম্য যা সমাজে পেশাগত পরিচিতির সংকট তৈরি করবে।

ঠিক একইভাবে যদি আমরা আধুনিক উদারনীতিবাদের বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে লক্ষ্য করি তাহলে সেখানেও দেখতে পাবো ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ। তাহলে এক্ষেত্রেও ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকার কারণে এখানেও পুঁজিবাদের জন্ম হবে এবং যা থেকে সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যের সৃষ্টি হবে। যার ফলে আবার সমাজে পেশাগত পরিচিতির সংকট তৈরি করবে।

এবার আমরা যদি নয়া-উদারনীতিবাদের দিকে দৃষ্টি দিই তাহলে আমরা দেখতে পাবো নয়া-উদারনীতিবাদী তত্ত্ব যে বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল উন্মুক্ত বাজার, ন্যূনতম রাষ্ট্র এবং সেইসঙ্গে ব্যক্তিস্বাধীনতা। এক্ষেত্রে উন্মুক্ত বাজার থাকার কারণে পেশাগত পরিচিতির সংকট দেখা দেবে আবার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা থাকার কারণেও পুঁজিবাদের জন্ম হবে এবং তা থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হবে পেশাগত পরিচিতির সংকট।

প্রথম অধ্যায়

পরিচিতি ও পরিচিতির প্রকারভেদ

১.১ সমাজ ও পরিচিতি

‘Society’ বা ‘সমাজ’ শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ ‘*Socious*’ শব্দটি থেকে। যার অর্থ হল Association or Companionship[25]। ফলে ‘Society’ বা ‘সমাজ’ কথাটির অর্থ দাঁড়ায় বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা সংগঠিত একটি বৃহত্তর সংস্থা বা সংগঠন যেখানে প্রত্যেকে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কীত। (A Larger group of individuals who are associative with each other.) আমরা যদি ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাব যে, সমস্ত জীবই সংঘবদ্ধভাবে তাদের জীবন অতিবাহিত করে নিজেদের প্রয়োজনে। তাই বলা যায় এই প্রাণীকূলের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ নামক প্রাণী তাদের সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী এই সমাজকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে ভেঙ্গে-চুরে টুকরো টুকরো করে পুনরায় তৈরী করেছেন নিজেদের তাগিদে। তাই বলা যায়, গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ তাদের উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায়, পারস্পরিক সম্পর্কে সম্পর্কীত হয়ে বসবাস করে। এই পারস্পরিক সম্পর্কের সামগ্রিক রূপ হল সমাজ।

সুতরাং প্রত্যেক সমাজের মানুষই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, পেশাগত ইত্যাদি নানাবিধ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। তাই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, যেকোন মানব গোষ্ঠীকে কি সমাজ বলা যাবে? এর উত্তরে বলা যায়, যে সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিম্নোক্ত দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, তাকে সমাজ বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

১) এক সাথে সমমনোভাবাপন্ন বহুমানুষের সংঘবদ্ধতা এবং

---

[25] Giddings, F. H, *The Elements of Sociology*, London, Macmillan & Co. Ltd., 1906, p- 5.

২) এই সংঘবদ্ধতার পিছনে কোন উদ্দেশ্য থাকা।

> “A society is a number of like-minded individuals-socii-who know and enjoy there like-mindedness, and are therefore able to work together for common ends.”[26]

যদিও এই দুটি বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে একটি সমাজ গড়ে ওঠে ঠিকই কিন্তু তা অপরিবর্তনীয় নয়। এই গতিশীল সমাজের মধ্যেই মানুষের বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে থাকে। তবে সমাজের স্বরূপ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিকগণের মধ্যে মতানৈক্য লক্ষ্য করা যায়। MacIver and Page সমাজের সংজ্ঞায় বলেছেন-

> “Society is a system of usages and procedures, of authority and mutual aid, of many groupings and divisions, of controls of human behavior and of liberties. This ever-changing complex system we call society. It is the web of social relationships. And it is always changing.”[27]

অর্থাৎ সমাজ হল এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে রয়েছে নানা রীতি-নীতি ও কর্মপদ্ধতি, কর্তৃত্ব ও সহযোগিতা, নানা গোষ্ঠী ও গোষ্ঠীগত পার্থক্য এবং মানুষের আচরণ ও স্বাধীনতার উপর নানা প্রকার নিয়ন্ত্রন। এই নিয়ত পরিবর্তনশীল জটিল ব্যবস্থাকেই সমাজ বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। সমাজ হল বহুবিধ সামাজিক সম্পর্কের এক জটিল জাল যা সর্বদা পরিবর্তিত হচ্ছে। এখন স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কেন এই পরিবর্তন? MacIver কে অনুসরণ করে Gisbert সমাজের সংজ্ঞার কিছু পরিবর্তন করে বলেছেন–

---

[26] Giddings, F. H, *The Elements of Sociology*, London, Macmillan & Co. Ltd., 1906, p-6.

[27] MacIver, R. M, Page, C. H, *Society*, Maclillan India Ltd., 1988, P-5.

> "Society, in general, consists in the complicated network of Social relationships by which every human being is interconnected with his fellowmen."[28]

অর্থাৎ সমাজ হল সামাজিক সম্পর্কের একটি যৌথ সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা, যে সম্পর্কের দ্বারা প্রত্যেক মানুষ তার সঙ্গীদের সঙ্গে আন্তর সম্পর্কে যুক্ত থাকে। আবার তিনি সমাজকে মানসিক ব্যাপার বলেও স্বীকার করেছেন উক্ত গ্রন্থে এবং বলেছেন- সামাজিকতা বা সমাজ হল একটি সম্পূর্ণ মানসিক বিষয়ের ঘটনা। অর্থাৎ "Sociality or society is radically a mental phenomenon."[29]

তবে এই 'সমাজ' শব্দটিকে সাধারণত সমাজতাত্ত্বিকগণ দুটি অর্থে ব্যবহার করে থাকেন- প্রথমতঃ ব্যাপক অর্থে এবং দ্বিতীয়তঃ সংকীর্ণ অর্থে। ব্যাপক অর্থে সমাজ বলতে যেকোন ধরনের সামাজিক আচরণ ও আন্তর্ব্যক্তিক সমস্ত ধরনের সম্পর্ককে বোঝায়। এদিক থেকে যেকোন জনগোষ্ঠীকে 'সমাজ' বলা হয়। কিন্তু সংকীর্ন অর্থে 'সমাজ' বলতে বোঝায় একটি স্থায়ী সংগঠন। এক্ষেত্রে ঐক্য, বহুত্ব, স্থায়ীত্ব ও সংঘবদ্ধতাই হল সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সমাজ হল বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীবের একটি স্থায়ী নৈতিক সম্মেলন, যেখানে মানুষ মিলিত হয়েছে একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি সমাজের মূল উপাদান হল ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠী, যার সাহায্যে সমাজ গঠিত হয়। আবার সমাজ ছাড়াও কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব অর্থহীনতার নামান্তর। তাই বলা যায় এরা একে অপরের পরিপূরক।

আবার 'Society' এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে George M. Foster বলেছেন-

---

[28] Gisbert, P, *Fundamentals of Sociology*, Kolkata, Orient Longman Pvt.Ltd., 2006, P-10.

[29] Ibid, p-11

> "Society means people and culture means the behavior of people."[30]

অর্থাৎ তাঁর মতে সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক যুক্তিযুক্ত অর্থবহ প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। এদিক থেকে বলা যায়, সমাজে প্রত্যেকটি মানুষের একাধিক সামাজিক পরিচিতি (Social Status) আছে এবং সেই সামাজিক পরিচিতি অনুসারে প্রত্যেকের সামাজিক ভূমিকাও (Social Role) আলাদা আলাদা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'পরিচিতি' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Identity', যার উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ 'Idem', থেকে।[31]

> "the term 'identity' in a wide-ranging and inclusive way to mean both its public manifestations– which might be called 'roles' or identity categories– *and* the more personal, ambivalent, reflective and reflexive sense that people have of who theyare. …… as to avoid *reducing* identity to categories of gender, race, nation, class, sexuality, etc., with which it is often associated."[32]

আমরা সাধারণত 'পরিচিতি' বলতে 'Self-Identity' অর্থাৎ নিজের সঙ্গে অভিন্নতাকে বুঝে থাকি। এই শব্দটির উৎপত্তির দীর্ঘ দার্শনিক ইতিহাস পরিলক্ষিত হয়। আত্মার ধারণাটি অধিকাংশ দার্শনিক শাখাতে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে, যেমন- অধিবিদ্যা, জ্ঞানতত্ত্ব, বুদ্ধিবাদ এমনকি নীতিবিদ্যা ও রাষ্ট্রদর্শনেও এই 'self' এর ধারণাটি একজন ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতা, সেইসঙ্গে ব্যক্তির দায়িত্ববোধকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে এটি হল মূল চাবিকাঠি। কান্ট এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যেতে পারে প্রত্যেক ব্যক্তি হল একজন

---

[30] Foster, G. M, *Traditional Culture: And the impact of Technological change*, New York, Harper and Brother Pub., 1962, P-11.

[31] Lawler, Steph, *Identity*, Cambridge, Polity Press, 2014, P-10.

[32] Ibid, P-7.

স্বাধীন সত্তা (Autonomous Being) যে ব্যক্তি তার কর্মের মধ্যে দিয়ে (Ecological Relation), জৈবিক বা স্বাভাবিক সম্বন্ধে উত্তীন হয় এবং এই সম্বন্ধ বলতে আমরা বুঝি প্রথাগত সম্বন্ধ, প্রাকৃতিক সম্বন্ধ, লিঙ্গগত, জাতিগত, সামাজিক অবস্থান, আবেগময় পরিস্থিতি ইত্যাদিকে। একজন ব্যক্তির স্বাধীনতার ধারণা থেকে পরবর্তী কালে মানবাধিকার সংরক্ষণের মূল ভূমিকা পালন করে। 'Self' বা আত্মার ধারণাটি– প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক ধারায় মূল ভূমিকা পালন করে এবং এই ধারণাটি মূলত তিন রকম দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচিত হয়ে থাকে। প্রথম দৃষ্টিভঙ্গিটি হল-নিরপেক্ষ আত্মার ধারণা (Autonomous Self) যা কান্ট এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচিত হয়। দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিটি হল- Aristotle এর যা 'Homo-economicus' নামে পরিচিত। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে একজন ব্যক্তির (Individual Agent) প্রাথমিক ভূমিকা হল 'Self-Interest' বা ব্যক্তি স্বার্থে বা নিজ স্বার্থে কাজ করা এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে একজন ব্যক্তির নীতি হল কিভাবে তার নিজের প্রয়োজন মিটবে সেই উদ্দেশ্যে কর্ম করা। এই প্রসঙ্গে Aristotle তাঁর 'Politics' গ্রন্থে এই দৃষ্টিভঙ্গীর একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন, তিনি বলেছেন যে, মানুষ প্রকৃতিগত ভাবে নিজের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য উদগ্রীব হবে-এটাই স্বাভাবিক।[33] ঐক্যবদ্ধ পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে নিজেকে পৃথক করার অনুমোদন করে যে সত্তা তা 'Homo-economicus'এর উপর দাঁড়িয়ে থাকে। তৃতীয়টি হল- 'Ecological Self' অর্থাৎ যা Biological এবং Social Environment এর মধ্যে দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। এই মতানুসারে 'Self'কে দেখা হয় 'Process of Developed' হিসাবে যেটা সাধারণত ঘটে থাকে একটি নির্দিষ্ট 'Ecological Speach'এর মধ্যে। 'Self'এর ধারণাটি আরো বেশী করে মসৃন করার ক্ষেত্রে কার্যকারি ভূমিকা গ্রহণ করে লিঙ্গ, জাতি, সামাজিক অবস্থা, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষাগত যোগ্যতা, আবেগ প্রবণতার কারণ (Emmotional History) ইত্যাদি। এই তত্ত্বে বিশ্বাসী অধিকাংশ মানুষ স্বীকার করে নেয় যে, 'Self' হল প্রানবন্ত, শক্তিসম্পন্ন সক্রিয় সত্তা যা ধারাবাহিক ভাবে নিজেকে তৈরী করে চলেছে। বিভিন্ন রকমের

---

[33] Barker, Ernest (Trans), *Aristotle politics*, Oxford University Press, 1995, P-47.

পরিবর্তনের মধ্যে একটি ঐক্যকে বোঝাতে এই শব্দটি পূর্বে ব্যবহৃত হত। অর্থাৎ একটি ধারাবাহিকতার মধ্যে অভিন্নতা বা একাত্মতা প্রতিপাদন করাই ছিল এর মূল লক্ষ্য কিন্তু আধুনিক কালে এই শব্দটির সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং তার পর্যালোচনাকে বোঝাতে বিবেচিত হয়ে থাকে।

দর্শনে, সমাজবিদ্যায়, রাষ্ট্রদর্শনে এমনকি মনোবিজ্ঞানেও পরিচিতি শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি এই শব্দটি একটি ছাতার মতো। তবে সমাজ ও রাষ্ট্রদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিচিতির ধারণাটি বিভিন্ন রকমের হতে পারে। এই প্রকারের ভাবনা-চিন্তা পাশ্চাত্য দর্শনে অ্যারিস্টটল, জন লক, ডেভিড হিউমের, সুমেকার এবং বার্নার্ড উইলিয়ামস প্রমূখ দার্শনিকগণের চিন্তাধারার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল এঁরা পরিচিতি বা Identity বলতে কি বুঝিয়েছেন?

১.২ পাশ্চাত্য দর্শনে ব্যক্তি পরিচিতি (Personal Identity):

পাশ্চাত্য দার্শনিক অ্যারিস্টটল তাঁর ‘Metaphysics’ গ্রন্থে দ্রব্যের অভিন্নতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন- যাতে গুণ আশ্রয় করে থাকে তাকেই দ্রব্য বলে। তাহলে প্রশ্ন ওঠে কখন একটি দ্রব্যের সঙ্গে অন্য দ্রব্যকে অভিন্ন বলা যেতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, পূর্বের দ্রব্যের সঙ্গে বর্তমান দ্রব্যের যদি বস্তুগত উপাদান এক হয় এবং পূর্বের দ্রব্যের সঙ্গে বর্তমান দ্রব্যের যদি সামান্য কিছু পরিবর্তন দেখাও যায়, তাহলেও এই পরিবর্তনের মধ্যে বস্তু দুটির আবশ্যিক ধর্ম একই থাকে তবে এক্ষেত্রে বলা যাবে দ্রব্য দুটি অভিন্ন।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে একটি দ্রব্যের সমস্ত অংশ ক্রমাগত পরিবর্তন হওয়ার ফলে যদি দ্রব্যটির আমূল পরিবর্তন ঘটে তাহলে এই দ্রব্যটিকে পূর্বে দ্রব্যের সঙ্গে আর অভিন্ন বলা যাবেনা। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়- একটি ঘড়ির যদি প্রথমে তার ডায়াল বা Model, তারপর তার ফিতে, এইভাবে আস্তে আস্তে সমস্ত যন্ত্রাংশ পরিবর্তন করা হয়, তাহলে বর্তমান ঘড়িটিকে আর পূর্বের ঘড়ির সঙ্গে অভিন্ন বলে গণ্য করা যায় না। তবে প্রাণিজগতের ক্ষেত্রে যেমন, জন্তু-জানোয়ার বা ব্যক্তি-মানুষ এবং

উদ্ভিদের ক্ষেত্রে তাদের দেহের আকারের ক্রমাগত আমূল পরিবর্তন দেখা দিলেও তাদেরকে অভিন্ন ব্যক্তি এবং উদ্ভিদ বলেই গণ্য করা হয়। এই বিষয়টি আমরা একটি শিশুর মধ্যে খুবই স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করে থাকি। একটি শিশু যখন বড় হয়, তখন তার মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটে কিন্তু যেহেতু তা খুবই ধীর গতিতে ঘটে থাকে, তাই আমরা ঐ শিশু এবং বর্তমানের প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে অভিন্ন বলেই আমাদের মনে হয়। আবার এপ্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, ব্যক্তিকেও এক অর্থে দ্রব্য বলা যেতে পারে। অ্যারিস্টটল দ্রব্যের অভিন্নতা সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন, তা ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে, অভিন্ন ব্যক্তি বলতে বোঝায়- প্রথম ক্ষণের ব্যক্তি আর দ্বিতীয় ক্ষণের ব্যক্তি যদি একই বস্তু দিয়ে তৈরি হয়। এছাড়াও তিনি মনে করেন, শুধু ব্যক্তির দেহের আবশ্যিক ধর্ম অনুরূপ থাকলেই হবে না, সেই সঙ্গে প্রথম ক্ষণের ব্যক্তি ও দ্বিতীয় ক্ষণের ব্যক্তির মধ্যে কিছু মানসিক বৃত্তি এবং অনুভূতি অপরিবর্তিত থাকতে হবে।

আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে ব্যক্তির অভিন্নতার (Personal Identity) প্রশ্নের সমাধান বিষয়ে আলোচনা শুরু হয় মূলত বিট্রিশ দার্শনিক জন লক এর হাত ধরে। তিনি মনে করেন একজন ব্যক্তির অভিন্নতা যেমন- চেতন দ্রব্যের তাদাত্ম্যকে বোঝায় না, তেমনি জড় দ্রব্যের সঙ্গে অভিন্নতাকেও বোঝায় না। তাঁর মতে ব্যক্তির অভিন্নতা নির্ভর করে চৈতন্যের উপর এবং সেই চৈতন্য একজন ব্যক্তিকে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অভিন্নতা তৈরী করে।[34] তিনি আরও মনে করেন চৈতন্য, চিন্তন নামক কর্মের সঙ্গে অভিন্ন, যখন আমরা কোন কিছুকে প্রত্যক্ষ করি বা জানি বলে দাবি করি, চেতনার সাহায্যে একজন ব্যক্তিকে সেই ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করি, যেহেতু সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সেই ব্যক্তি অভিন্ন থাকে চিন্তন নামক ক্রিয়ার দ্বারাই। তিনি আরো মনে করেন যে, ব্যক্তির অভিন্নতা নির্ভর করে দ্রব্যের ধারণার অতিরিক্ত কিছু। যেমন- প্রানীর অভিন্নতার মূলে হল 'প্রানীসত্তা এবং তা শুধু দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল নয় এবং প্রাণীর ক্ষেত্রে চিন্তন হল অপ্রাসঙ্গিক দ্রব্য সত্তা। তাঁর মতে চৈতন্যই একমাত্র সত্তা যা একটি

---

[34] Locke, John, *An Essay Concerning Human Understanding*, Oxford University, United Kingdom, 1853, pp-222-223.

মানুষের কাছাকাছি বা দূরবর্তী অভিজ্ঞতাগুলিকে সংঘবদ্ধ করে। চৈতন্য ছাড়া একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অন্তর্হিত হয়ে যায়। তিনি মনে করেন দেহ, আত্মা এবং চৈতন্য একে অপরের থেকে ভিন্ন এবং প্রত্যেকটি একে অপরের সাথে সংযুক্ত হয় বিভিন্ন ভাবে। বিভিন্ন রকম সংযুক্তিকরণ হওয়া সত্ত্বেও আমরা বলতে পারি, আমাদের চৈতন্যের কোন পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ চৈতন্য অভিন্নই থাকে। লক মনে করেন, দেহ, আত্মা এবং সচেতনতা হল একে অপরের সঙ্গে ভিন্ন হলেও তারা কিন্তু বিভিন্নভাবে সংযুক্ত হতে পারে। তারা বিভিন্নভাবে সংযুক্ত হলেও, তারা একই সচেতনতা তৈরী করতে সক্ষম। কাজেই, লকের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, ব্যক্তির অভিন্নতার মূলে আছে সচেতনতার ঐক্য।

অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির যোগ্য উত্তরসূরী ডেভিড হিউমও ব্যক্তির অভিন্নতা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। একজন ব্যক্তিকে মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে তিনটি সম্ভবনা আছে, যথা- ব্যক্তি হল আত্মা বা Soul, দেহ ও উভয়ের সম্বন্বয়। ব্যক্তির অভিন্নতা বিষয়ে ডেভিড হিউম এর বক্তব্য লুকিয়ে আছে তাঁর ধারণার উৎপত্তি বিষয়ক মতবাদের মধ্যে। তাঁর মতে ধারণার উৎপত্তির মূলে হল মুদ্রণ "All our ideas are coming from impression."[35] বস্তুস্থিতি কখনো পূর্বতসিদ্ধ নয়, তা অবশ্যই পাওয়া যায় অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে। তাঁর মতে ব্যক্তির ধারণা নির্ভর করে জড় দ্রব্যের উপর কারণ অভিজ্ঞতাই হল জ্ঞানের একমাত্র উপাদান এবং আমাদের সমস্ত ধারণাই মুদ্রণের প্রতিলিপি যদিও তার কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। একই রকম ভাবে স্থায়ী ব্যক্তিসত্তার কোন মুদ্রণ যেহেতু হয়না, তাই বলা যেতে পারে ব্যক্তি হল বিভিন্ন অসংলগ্ন প্রত্যক্ষনের সম্বন্বয়, কাজেই আমরা স্থায়ী সত্তার কোন মুদ্রণ পাইনা। তাই স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন ওঠে আমরা কিভাবে ব্যক্তিসত্তাকে প্রত্যক্ষ করি? একই ভাবে এই প্রশ্ন ওঠাও স্বাভাবিক আমরা মন বলতে কী বুঝি? ডেভিড হিউম মনকে তুলনা করেছেন একটি

---

[35] Hume, David, *An Enquiry Concerning Human Understanding,* Progress Publishers, Calcutta, 1999, p-13.

নাটকের সঙ্গে।[36] যেখানে বিভিন্ন ধরনের কলাকুশলী নিজেদেরকে উপস্থাপিত করে। বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ ব্যক্তিকে যেভাবে বিশ্লেষণ করেন, হিউম সেভাবে করেন নি। কারণ বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ ব্যক্তি বা আত্মাকে একটি নিত্য সত্তা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। হিউম এই ধারণার প্রত্যুত্তরে বলেন, যখন আমি আমার মধ্যে প্রবেশ করি বা আমাকে খোঁজার চেষ্টা করি তখন আমি সর্বদাই বিশেষ কিছু প্রত্যক্ষনকেই পাই। যেমন- কখনো ঠান্ডা, কখনো উষ্ণ, কখনো ভালো, কখনো খারাপ, কখনো ভালোবাসা, কখনো ঘৃনা, কখনো সুখ, কখনো দুঃখ ইত্যাদি এই সমস্ত প্রত্যক্ষনের অতিরিক্ত আত্মসত্তা (My Self) নামক কোন কিছু পাইনা।

> “for my part, when I enter most intimately into what I call myself, I always stumble on some particular perception or other, of heat or cold, light or shade, love or hatred, pain or pleasure, I never can catch myself at any time without a perception, and never can observe anything but the perception. When my perceptions are removed for any time, as by sound sleep; so long am I insensible of myself, and may truly be said not to exist........ . He may, perhaps, perceive something simple and continued, which he calls himself; who’ I am certain there is no such principle in me.”[37]

এখানে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, অভিন্নতা যেটা মানবিক মনের উপর আরোপ করি, তা বিভিন্ন ধরনের প্রত্যক্ষণের একই গুচ্ছের কীভাবে হয়। কারণ মন কখনোই ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষণের মধ্যে প্রকৃত কোন সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করতে পারেনা। এই পরিস্থিতিতে

---

[36] MacNabb, D. G. C, *David Hume: His Theory of Knowledge and Morality*, United Kingdom, Taylor & Francis, 2019, p-148.

[37] Hume, David, *A Treatise of Human Nature*, United Kingdom, Clarendon Press, 1888, P-252.

যৌক্তিকভাবে বলা যায় যে, ব্যক্তি হল অসংখ্য প্রত্যক্ষণ গুচ্ছের সমাহার। উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পুনরায় আগের প্রশ্নই উঠে আসে যে, দ্রব্যের ধারাবাহিকতা বা আত্মা বা ব্যক্তির অভিন্নতাকে হিউম কীভাবে ব্যাখ্যা দেবেন? এই সমস্যার সমাধানের জন্য হিউম স্মৃতি এবং কল্পনার ধারণাকে সংযোজন করেছেন। তিনি এই দুটি উপাদানের সাহায্যে উক্ত সমস্যার একটি সন্তোষজনক সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ব্যক্তি যে বিভিন্ন প্রত্যক্ষণের সমাহার তা প্রমাণ করার জন্য তিনি তিনটি নীতির সাহায্য নিয়েছেন এবং সেগুলি হল সাদৃশ্যের নীতি (Resemblance), সান্নিধ্যের নীতি (Contiguity in in Time or Place) ও কার্য-কারণ (Cause or Effect)।[38]

উক্ত ধারণাগুলির সম্বন্ধ সমূহের নীতিগুলির মধ্যে ১) সাদৃশ্যের নীতির উদাহরণে বলা যেতে পারে, কোন একজন বন্ধুর একটি ছবি দেখলে তৎক্ষণাৎ সেই বন্ধু সম্পর্কে অনেক তথ্য আমাদের মনে উদ্রেক হয়। ২) সান্নিধ্যের নীতির উদাহরণে হিউম বলেন যে, একটি বাড়ির একটি অংশ পরিদর্শন করে অন্য অংশেরও ঐ একই বিষয় উপস্থিত থাকার অনুমান আমরা করতে পারি। আবার ৩) কার্য-কারণের নীতির প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, কোন একজন ব্যক্তির গলার কাছে অন্য ব্যক্তি যদি ছুরি ধরে থাকে তাহলে আমরা অনুমান করি যে একটু অসাবধান হলেই যন্ত্রণার আবির্ভাব হতে পারে। হিউম অবশ্য স্বীকার করেছেন যে, এই তিনটি ছাড়াও আরো নীতি থাকতে পারে। অবশ্য এর বাইরে যদি কোন নীতি থেকেও থাকে, তাহলে সেই নীতিগুলিকেও এই তিনটি নীতির অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, আত্মা সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে সংযুক্তিকরণের নীতির বোধহয় প্রয়োজন পড়ে না। এই নীতির বাইরে স্থায়ী আত্মার অস্তিত্বে আমরা স্বীকৃতি দিয়ে থাকি। সুতারং ব্যক্তির অস্তিত্বের ধারাবাহিকতার প্রশ্নে বা তাদাত্ম সম্পর্কিত প্রশ্ন বিষয়ে ধারণার সম্বন্ধ সমূহ নীতিগুলিকে অতিক্রম করে একটি বিশেষ সত্তায় উপনীত হওয়ার প্রবণতা আমাদের থাকে। যখন আমরা আমাদের বর্তমান

---

[38] Hume, David, *An Enquiry Concerning Human Understanding,* Progress Publishers, Calcutta, 1999, p-16.

ইন্দ্রিয়জ এবং স্মৃতির ধারণার মধ্যে অভেদ (Identity) উপলব্ধি করি, তখন আসলে আমরা উভয়ের অভেদ কল্পনা করি বা উভয়ের অভেদের বিষয়টি ভান করি। আবার অনুরূপভাবে আমরা আমাদের অন্তর্দর্শনের প্রত্যক্ষণে (Perceptions of Reflection) মধ্যে অভেদ কল্পনা করি এবং আত্মার নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্ব ও অভেদে বিশ্বাস করি। আসলে আমরা অভিজ্ঞতায় কোন শাশ্বত আত্মা প্রত্যক্ষ করতে পারি না। আমরা যা প্রত্যক্ষ করি, তা হল পরিবর্তনশীল ইন্দ্রিয়জের পারস্পর্য মাত্র। কারণ স্মৃতি অতীত প্রত্যক্ষণের প্রতিরূপ আমাদের মনে জাগিয়ে তুলে, আমাদের প্রত্যক্ষণের মধ্যে সাদৃশ্যের সম্বন্ধ উৎপন্ন করতে সাহায্য করে। যার ফলে কল্পনা প্রত্যক্ষণগুলিকে নিরবচ্ছিন্ন ও স্থায়ী বস্তুরূপে প্রতীতি করায়। আবার আমাদের প্রত্যক্ষনগুলি কার্য-কারণ সম্বন্ধের সাহায্যে পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকায়, ইন্দ্রিয়জগুলি তার অনুরুপ ধারণা গুলিকে উৎপন্ন করে এবং সেই ধারণাগুলি আবার অন্য ইন্দ্রিয়জ উৎপন্ন করে। এক্ষেত্রে স্মৃতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, স্মৃতির সাহায্যেই আমরা প্রত্যক্ষণের মধ্যে যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ তার সম্পর্কে অবহিত হতে পারি। কাজেই বলা যেতে পারে ব্যক্তি অভেদের (Personal Identity) আসল উৎস হল স্মৃতি। আমরা কল্পনায় অনুষঙ্গের সাহায্যে আমাদের প্রত্যক্ষণ গুলিকে সংযুক্ত করি এবং পরস্পর সংযুক্ত প্রত্যক্ষণের পারস্পর্য ব্যাহত হলেও তাতে অভেদত্ব আরোপ করি।

ব্যক্তির অভেদ সম্পর্কিত সুমেকারের মতঃ

সুমেকার (Shoemekar) ব্যক্তির অভেদ (Person Identity) প্রসঙ্গে বলেন- ব্যক্তির ধারণার মধ্যে তার দৈহিক দিক (Physical Sates) এবং তার মানসিক দিক (Mental States) দুটি বর্তমান থাকে। এখানে দৈহিক দিক বলতে মস্তিষ্ক, দেহের আকার-আকৃতি ইত্যাদি দৈহিক অঙ্গকে বোঝায়। আর অপর দিকে মানসিক দিক বলতে তার ভাবনা-চিন্তা, আবেগ-অনুভূতি ইত্যাদিকে বোঝায়। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি এই দুই ধরনের উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত হয়। এখন আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে- ব্যক্তির অভিন্নতা তার দৈহিক দিকের অভিন্নতা? নাকি মানসিক দিকের অভিন্নতাকে বোঝায়?

সুমেকার (Shoemekar) এই প্রশ্নের উত্তরে একটি কাল্পনিক পরীক্ষণের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করেছেন। এপ্রসঙ্গে তিনি যদিও সরাসরি দেহ পরিবর্তনের কথা বলেন নি, তিনি আসলে মস্তিস্কের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে দৈহিক ক্ষেত্রের পরিবর্তনের কথা বলেছেন। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে এভাবে বলা যেতে পারে যে, রাম এবং শ্যাম নামক দুজন ব্যক্তি পরস্পরের সাথে দেহ পরিবর্তন করলো। ফলত: শ্যাম নামক ব্যক্তির দেহ ধারণকারী রাম নামক ব্যক্তি, শ্যাম নামক ব্যক্তির স্মৃতির অধিকারী হল। আবার রাম নামক ব্যক্তির দেহধারণকারী শ্যাম নামক ব্যক্তি, রাম নামক ব্যক্তির স্মৃতির অধিকারী হল। অর্থাৎ, তাঁর পরীক্ষণে রাম নামক ব্যক্তির মস্তিষ্ক, শ্যাম নামক ব্যক্তির দেহে এবং শ্যাম নামক ব্যক্তির মস্তিষ্ক, রাম নামক ব্যক্তির দেহে স্থাপিত হল। যার ফলে রাম নামক ব্যক্তির দেহ ধারণকারী শ্যাম নামক ব্যক্তি যে আচরণ করবে, তা স্বাভাবিক ভাবেই শ্যাম নামক ব্যক্তির আচরণ। অপরদিকে শ্যাম নামক ব্যক্তির দেহ ধারণকারী রাম নামক ব্যক্তি যে আচরণ করবে, তা স্বাভাবিকভাবেই রাম নামক ব্যক্তির আচরণ।[39]

ব্যক্তির অভেদ সম্পর্কিত বার্নাড উইলিয়ামস্ এর মতঃ

বার্নাড উইলিয়ামস্ তাঁর ‘Problems of the Self’ নামক বিখ্যাত গ্রন্থের ‘Self and the Future’ নামক অধ্যায়ে দেহের অভিন্নতার সঙ্গে ব্যক্তিঅভেদের ব্যাখ্যা করেছেন। যদিও তা আবশ্যিক শর্ত কিন্তু পর্যাপ্ত শর্ত নয়। তাছাড়া তিনি তাঁর ‘Personal Identity and Individuation’ নামক প্রবন্ধে স্মৃতি নির্ভর ব্যক্তি অভিন্নতার সমালোচনার মধ্য দিয়েই ব্যক্তি অভিন্নতার তত্ত্বটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তিনি একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করেছেন। ধরা যাক, দুজন ব্যক্তি রাম এবং শ্যাম উভয়েই দাবি করেছেন যে, তারা তৃতীয় এক ব্যক্তি যদু এর সঙ্গে অভিন্ন। এর অর্থ রাম এবং শ্যাম শুধু যে এমনকিছু ঘটনা মনে করতে পারছে- যা যদুর জীবনে ঘটেছিল বলে অন্যরা জানে। শুধু তাই নয়, তারা এমনও অনেক ঘটনা মনে করতে পারছে যা কারও জানা ছিল না। অথচ সেই স্মৃতিগুলি সঠিক

---

[39] Richard, Shoemaker. S, *Personal Identity*, Basil Blackwell, Oxford, 1984, p-13.

হওয়ার সম্ভবনা খুবই বেশি। কারণ সত্যিই যদি ঘটনা গুলি সেইভাবেই ঘটে থাকে, যেভাবে তারা বলছে, তাহলে যদুর জীবনের বহু ঘটনার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, যার ব্যাখ্যা এতদিন দেওয়া যাচ্ছিল না।

রাম ও শ্যাম এর স্মৃতি যদি অভিন্ন হয় এবং স্মৃতি ভিত্তিক ব্যাখ্যা যদি আমরা মেনে নিই, তাহলে বলতে হবে রাম ও শ্যাম একই ব্যক্তি। যেহেতু তাদের স্মৃতি একই কিন্তু আমরা তো চোখের সামনে দেখছি যে, তারা দুজন ভিন্ন ব্যক্তি, তাদের জীবনযাত্রা ভিন্ন, তাদের আবেগ-অনুভূতি সমস্ত কিছুই ভিন্ন, শুধুমাত্র যদু এর স্মৃতি তারা দুজনেই বহন করছে।[40]

এজন্যই বার্নার্ড উইলিয়ামস্ মনে করেছেন যে, স্মৃতিভিত্তিক ব্যাখ্যা স্বীকার করলে, ‘ব্যক্তি অভিন্নতা’ ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ সেক্ষেত্রে দ্বি-করণের সম্ভাবনা (The Possibilty of Duplication) দেখা দেয়। এবিষয়ে সুইনবার্ন নামক অপর একজন তাত্ত্বিকও মনে করেন যে, আমরা স্মৃতির অভিন্নতা মস্তিষ্কের অভিন্নতার দ্বারা ব্যক্তির অভেদকে প্রতিষ্ঠা করে থাকি। তবুও মনে রাখতে হবে যে, এই জাতীয় ব্যাখ্যাতে সর্বদাই উপরোক্ত ভ্রান্তির সম্ভাবনা থেকে যায়।

‘Personal Identity and Individuation’ প্রবন্ধে বার্নার্ড উইলিয়ামস্ দাবী করেছেন যে, সবসময় দেহের অভিন্নতা, ব্যক্তি অভিন্নতার একটি আবশ্যিক শর্ত। একই সঙ্গে তিনি একথাও বলেছেন যে, ব্যক্তির অভিন্নতা নির্দেশ করার জন্য দেহের অভিন্নতা নির্দেশ করাই যথেষ্ট নয়। কারণ যেহেতু দেহের অভিন্নতা, ব্যক্তির অভিন্নতার পর্যাপ্ত শর্ত নয়। এরজন্য ব্যক্তির আরও কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন, বিশেষ করে স্মৃতিও অভিন্ন হওয়া প্রয়োজন। উইলিয়ামস্ এর ভাষায় বলা যেতে পারে যে,

---

[40] Williams, Bernard, *Personal Identity and Individuation, Problems of the Self,* Cambridge University Press, Cambridge, 1973, P-8.

> “Identity of body is at least not a sufficient condition of personal identity and other considerations, personal characteristics, and above all, memory must be invoked.”[41]

তিনি আরও মনে করেছেন যে, দেহ নিরপেক্ষভাবে ব্যক্তির অভেদকে যতই আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চাই না কেন, অথবা কোন ব্যক্তিকে নিরপেক্ষভাবে যতই চিহ্নিত করার চেষ্টা করি না কেন, এই চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়ায় কোন না, কোন পর্যায়ে আমাদের দেহের সাহায্য নিতেই হবে। অর্থাৎ পরিশেষে বলা যায়, বার্নার্ড উইলিয়ামস্ ব্যক্তির অভেদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে স্মৃতি বা মানসিক বৃত্তির সাথে সাথে দেহের গুরুত্বকেও মেনে নিয়ে ছিলেন।

১.৩ সমাজ বিজ্ঞান ও মানবিক বিজ্ঞানে পরিচিতিঃ

বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই ধারণাটি তেমন ভাবে জনপ্রিয় ছিলনা। কিন্তু তার পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে Riceman ও Stein কর্তৃক সম্পাদিত ‘The Lonley Crowd’(১৯৫০) ও ‘Identity an Anxiety’(১৯৬০) গ্রন্থদ্বয় প্রকাশের মাধ্যমে বিষয়টি অতি জনপ্রিয়তা লাভ করে। সমাজ বিজ্ঞানে এবং মানবিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও গবেষণায় পরিচিতির ধারণাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই সমস্ত তত্ত্ব ও গবেষণায় ‘আত্মা’ ও ‘Self’ শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয় পরিবর্তন যোগ্য শব্দ হিসাবে। আবার অনেক সময় আত্ম পরিচিতি (Self Identity) ও অহং পরিচিতি (Ego Identity) ধারণা দুটিকে একত্রিত করার মধ্য দিয়ে পরিচিতি বিষয়টিকে বোঝানো হয়ে থাকে। যেমন- রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় পরিচিতি ইত্যাদি। সমাজবিজ্ঞানের এবং মানবিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাতেও পরিচিতি নামক ধারণাটির গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। এখন দেখা যাক এই ধারণাটির পদ্ধতিগত দিক থেকে এর বিভিন্ন শাখাগুলি কীভাবে বিভিন্নতা প্রদান করে। সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব ও গবেষনায় বিভিন্ন ধরনের পরিচিতির মধ্যেও পৃথকীকরণ করা হয়। যেমন-পরিচিতির ‘ধরণ’ হিসাবে জাতিগত,

---

[41] Williams, Bernard, *Personal Identity and Individuation, Problems of the Self,* Cambridge University Press, Cambridge, 1973, P-48.

লিঙ্গগত, গোষ্ঠীগত, ভাষাগত, পেশাগত, সংস্কৃতিগত, দৈহিক, অধ্যায়ন বিষয়ক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের পরিচিতির ধারণার মধ্যে একটি সাধারণ পার্থক্য তৈরী হয়- যেমন একদিক থেকে ব্যক্তিগত ও অন্যদিক থেকে সামাজিক পরিচিতির মধ্যে। ব্যক্তিগত পরিচিতি (Personal Identity) বলতে আমরা সাধারণতঃ কোন ব্যক্তির অনন্য বা অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যকে বুঝে থাকি। ব্যক্তিগত পরিচিতির মধ্যে ব্যক্তিগত মূল্য, মতামত, বিভিন্ন সুবিধার প্রাধান্য, সেই সঙ্গে দৈহিক (শারীরিক) বৈশিষ্ট্য এবং পছন্দ অনুযায়ী জীবন-যাপন প্রভৃতিকেও বুঝে থাকি। অন্য অর্থে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ করে একজন ব্যক্তির পরিচিতিকে। সেই সঙ্গে অন্যব্যক্তির থেকে নিজেকে পৃথকীকরণ করা হয়-এই সমস্ত বৈশিষ্টের মাধ্যমে। অপরপক্ষে সামাজিক পরিচিতি বলতে বোঝায় একজনের সামাজিক ভূমিকাকে (Role)। যেমন– সামাজিক ভূমিকা হিসাবে লিঙ্গ পরিচিতি, জাতীয় পরিচিতি, ধর্মীয় পরিচিতি, পেশাগত পরিচিতি, রাজনৈতিক পরিচিতি, আদর্শগত সেই সঙ্গে জাতীয় গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে যে পরিচিতি। এই ভাবে বিশেষ করে এই সমস্ত ভূমিকা গুলির সংযোজনের সাহায্যে একজন ব্যক্তির পরিচিতি গড়ে ওঠে। যেমন- দৈহিক কাঠামো, একই ভাবে কথা বলা, একই সামাজিক শ্রেণির মধ্যে অবস্থান, একই অর্থনৈতিক কাঠামো ইত্যাদি। ঠিক এই রকমই আরেকটি পরিচিতি হল পেশাগত পরিচিতি। তাহলে আমরা লক্ষ্য করলে বুঝতে পারব সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির একাধিক পরিচয় বর্তমান। তবে প্রাথমিকভাবে সমাজের মানুষের বা প্রত্যেক ব্যক্তির পরিচিতি দুই ভাবে নির্ধারিত হয়ে থাকে-

প্রথমতঃ আরোপিত অর্থে অর্থাৎ একজন ব্যক্তি জন্মসূত্র অনুযায়ী সমাজে তার পরিচয় বা পরিচিতি; এবং

দ্বিতীয়তঃ অর্জিত অর্থে অর্থাৎ নিজের চেষ্টায় একজন ব্যক্তি তার বুদ্ধি ও দক্ষতা দ্বারা সামাজিক পরিচিতি অর্জন করতে পারে।

আমরা সাধারণত দেখি যে, একজন শিশুর জ্ঞান শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে সামাজিকীকরণ করা হয়ে থাকে, ফলে সে সমাজের আদর্শ, মূল্যবোধ, ঐতিহ্য ও নানা ধরনের কর্তব্য বিষয়ে সচেতন হয়। তার জন্মের পরিপ্রেক্ষিতে তার শিক্ষাদীক্ষা–

আদবকায়দা তৈরী হয়। যেমন– একজন শিশু ছেলে হয়ে জন্মালে তার এক ধরনের এবং মেয়ে হয়ে জন্মালে ভিন্ন ধরনের, অর্থাৎ কাজ কর্ম, পোষাকাশাক ইত্যাদি পাল্টে যায় বা পাল্টাতে সহায়তা করা হয়। ফলে তার সমাজিক পরিচিতিটাও ভিন্ন ভিন্ন হতে থাকে। তাহলে উক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়-

ক) একজন মানুষের লিঙ্গভেদে তার পরিচিতির ভিন্নতা এবং এই ভিন্নতা তাকে আজীবন তার কাজকর্ম ও আচার-ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করে, অর্থাৎ এই জাতীয় পরিচিতি স্থায়ী। যদিও বর্তমানে বিজ্ঞানের অভাবনীয় প্রযুক্তির দ্বারা লিঙ্গভেদে যে স্থায়ী পরিচিতি গড়ে ওঠে সেই পরিচিতিও পরিবর্তনযোগ্য। যদিও তার সংখ্যা আমাদের দেশে খুবই কম।

খ) অন্য দিকে বয়সের বিভেদের কারণে একজন ব্যক্তির সামাজিক পরিচিতিও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে, যেমন– একজন ব্যক্তি শৈশবে যে পরিচয় নিয়ে সমাজে পরিচিত, কৈশরে ভিন্ন, যৌবনে ও বার্ধক্যে ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় বহন করে। আর এই পরিচয় অনুযায়ী তাদের সামাজিক ভূমিকা পালন করতে হয়।

এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে, বয়সের বিভেদ বা পার্থক্য অনুযায়ী যে সামাজিক পরিচিতি নির্ধারিত হয়, সেটিও এক দৃষ্টিকোন থেকে স্থায়ী। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বলতে পারি যে, একজন 'মা' তার সন্তানের বয়স যতই বেশীহোক না কেন, তবুও ঐ মা তার সন্তানের সঙ্গে সন্তান তুল্য আচরণই করেন।

গ) অপর এক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কোন ব্যক্তি যে বংশে বা পরিবারে জন্মায় তার বংশ ও পদ-মর্যাদা দ্বারা তার পরিচয় নির্ধারিত হয়। যেমন– একজন ব্যক্তি ব্রাহ্মণ উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন বংশে জন্মগ্রহণ করলে সমাজে সে এক ধরনের পরিচিতি লাভ করে। আবার অপর একজন অপেক্ষাকৃত নিম্নবংশে জন্মালে ভিন্ন এক ধরনের পরিচয় বহন করে, বংশ বা পরিবার অনুযায়ী একজন ব্যক্তির সুযোগ সুবিধা, বংশ মর্যাদা লাভ বিষয়টি যে শুধু আমাদের দেশে বর্তমান রয়েছে তা নয়, মার্কিন–যুক্তরাষ্ট্র বা দক্ষিন আফ্রিকায় নিগ্রো পরিবারজাত ব্যক্তির মধ্যেও বর্তমান। এক্ষেত্রে বলা যায় একজন ব্যক্তি কোন বংশে বা জাতিতে জন্মগ্রহণ করছে তা দিয়ে যদি তার পরিচয় নির্ধারিত হয়,

তাহলে জাতিভেদ প্রথার মতো একটা জঘন্য সামাজিক ব্যধিকে সমাজ থেকে কখনোই দূর করা সম্ভব হবে না।

ঘ) অপর একটি দৃষ্টিকোন থেকে কোন এক ব্যক্তি যে কাজ করে অর্থাৎ দক্ষতার উপর, ভিত্তি করে ঐ ব্যক্তির একটি পরিচয় নির্ধারিত হয় সমাজে, যাকে আমরা পেশাগত পরিচিতি বলি। যদিও এই পেশাগত পরিচিতি স্থায়ী নয়। কারণ সে তার বুদ্ধিমত্তা বা কর্মকুশলতার উন্নতি ঘটিয়ে সে ভিন্ন পেশায় যুক্ত হয়ে তার পরিচিতির পরিবর্তন করতে পারে।তাহলে আমরা দেখছি একজন ব্যক্তি সমাজে জন্মাবার পর থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির স্থান, কাল, পেশা, চিন্তা-ভাবনা, আদর্শ ইত্যাদির ভিত্তিতে তার পরিচিতিও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম অর্থ বহন করে, কোন বিরোধ ছাড়াই। বিষয়টি একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো যেতে পারে– একজন দরিদ্র কৃষকের সন্তান সে তার মেধা বা কর্ম দক্ষতার দ্বারা তিনি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক প্রভৃতি পেশায় নিযুক্ত হয়ে তার পরিচিতি নির্ধারণ করতে পারে। আবার ঐ ব্যক্তি বাড়িতে তার পিতা-মাতার কাছে সন্তান, তার নিজের সন্তানের কাছে সে পিতা, আবার তার বন্ধুদের কাছে তার ভিন্ন ভিন্ন পরিচিতি পরিলক্ষিত হয়।

১.৪ পরিচিতির গঠন সম্পর্কিত তত্ত্ব (Theories on Identity Formation):

পরিচিতি গঠন সম্পর্কিত তত্ত্বগুলির উন্নতি লুকিয়ে আছে তার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে। এই বিষয়ে দুটি তত্ত্ব বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এরিকসনের মনস্তত্ত্ব উন্নয়নের তত্ত্ব (Identity versus Role Confusion) এবং জেমস মারিয়ার পরিচিতির অবস্থা তত্ত্ব (Theory of Identity Status)। এরিকসন (Erikson) বিশ্বাস করেন যে, প্রত্যেক মানুষ জীবনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংকটময় পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা লাভ করেন। প্রত্যেকটি দ্বন্দ্বই জীবনের কোন একটি নিদিষ্ট সময়ে উঠে আসে এবং এগুলিকে সফল ভাবে সমাধানের জন্য আটটি স্তরের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। এরিকসন (Erikson) এর বিশ্বাস যে, পরিচিতি গঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিশেষ স্তরটি সংগঠিত হয় বয়স সন্ধিক্ষণের সময় (১২-১৮ বছর), এই স্তরটিকে ‘Identity versus Role Confusion’ নামে অভিহিত করা হয়।

The Identity versus Role Confusion এই স্তরটি সেই সকল বয়স সন্ধিক্ষণের ছেলে-মেয়েদের মধ্যেই থাকে যারা নিজেদেরকে চিনতে চায়, ‘তারা কারা’? এক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য হল তাদের মৌলিক পরিচয় গঠন করা, যে পরিচয়টা তারা সারা জীবনে গঠন বা নির্মান করতে চায়। এই মৌলিক পরিচয় তত্ত্বের প্রাথমিক বিষয়গুলি হল সামাজিক পরিচয় ও পেশাগত বা বৃত্তিগত পরিচয়। একবার যদি সেই বয়স সন্ধিক্ষণের ছেলে বা মেয়ে নিজেকে (‘সে কে’?) পরিমাপ বা চিহ্নিতকরণের কাজটি সম্পন্ন করতে পারে, তাহলে সে এরিকসনের যে তত্ত্ব ‘Intimacy versus Isolation’ বা ‘অন্তরঙ্গতা বনাম বিচ্ছিন্নতা’ এর পরবর্তী স্তরটিতে প্রবেশ করতে পারে। যেখানে তারা অন্যের সঙ্গে দৃঢ়বন্ধুত্ব ও বন্ধুত্বের বোধটি তৈরী করতে পারে। যদি এই সমস্যাটি সমাধান করা না হয়, তাহলে ঐ ছেলে বা মেয়েটি পরিচিতির ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং একই সঙ্গে তারা প্রাপ্ত বয়স্ক হিসাবে কোন ভূমিকা পালন করবে সে বিষয়ে তারা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ব্যাপারটি বা বিষয়টি এই রকম যে, নিজের পরিচয় গঠনের ব্যর্থতা অন্যের সঙ্গে অংশিদারী পরিচয় গঠনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা নিয়ে আসে, এর ফলে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থায়িত্বের অভাবের সম্মুখীন হতে পারেন। এরিকসন এর মনস্তাত্তিক উন্নয়ন তত্ত্বের অন্তর্গত পরিচয় গঠনের স্তরটি হল জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর।

Erik Erison এর মতানুসারে, মানুষের যে অহং পরিচয় বা Ego Identity থাকে তা পর্যায় ক্রমে তাদের সারাজীবনের বয়স কালের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় এবং এই পর্যায়গুলি বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে অর্জন করতে হয়। তাঁর মতে এই পর্যায় ৮ টি,[42] সেগুলি হল-

১। শৈশবঃ- প্রাথমিক বিশ্বাস বনাম অবিশ্বাস (জন্ম থেকে ১৮ মাস)। (Infancy: Basic Trust versus Mistrust.)

---

[42] Erikson, Erik. H, *Childhood and Society,* Paladin Grafton Books, London, 1987, P-222.

২। শিশুঃ- স্বায়ত্ত শাসন বনাম লজ্জা এবং সন্দেহ (১৮ মাস থেকে ৩ বছর)। (Toddler: Autonomy versus Shame and Doubt.)

৩। প্রাকবিদ্যালয়ের বয়সঃ- উদ্যোগ বনাম অপরাধ বোধ (৩ বছর থেকে ৫ বছর)। (Preschool: Initiative versus Guilt.)

৪। প্রাথমিক স্কুলে যাবার বয়সঃ- উৎপাদনশীলতা বনাম নিকৃষ্টতা (৫ বছর থেকে ১২ বছর)। (School Age: Industry versus Inferiority.)

৫। বয়ঃসন্ধিকালঃ- পরিচয় বনাম পরিচয় বিভ্রান্তি। (১২ বছর থেকে ১৮ বছর) (Adolescence: Identity versus Identity Confusion.)

৬। যুবক বা তরুণ প্রাপ্তবয়স্কতাঃ- ঘনিষ্ঠতা বনাম বিছিন্নতা। (১৮ বছর থেকে ৪০ বছর) (Young Adulthood: Intimacy versus Isolation.)

৭। মধ্যবয়স্কাঃ- উৎপাদনশীলতা বনাম স্থবিরতা। (৪০ বছর থেকে ৬৫ বছর) (Middle Age: Generativity versus Stagnation.)

৮। বৃদ্ধাবস্থাঃ- সততা বনাম হতাশা। (৬৫ বছর এর উপরে) (Older Adulthood: Integrity versus Despair.)

উপরোক্ত স্তরগুলি নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হল-

১। শৈশবঃ- প্রাথমিক বিশ্বাস বনাম অবিশ্বাস (জন্ম থেকে ১৮মাস)। (Infancy: Basic Trust versus Mistrust.)

শিশুর জন্ম থেকে শুরু করে ১৮ মাস পর্যন্ত বয়স কালকে এরিকসন মনোসামাজিক বিকাশের প্রথম পর্যায় বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই স্তরে শিশু তার নিজের এবং অন্য মানুষদেরকে বিশ্বাস করতে শুরু করে। কিন্তু একইভাবে সে যে পরিবেশে বেড়ে ওঠে, সেই পরিবেশকে অবিশ্বাসও করে। তবে শিশুর এই বিশ্বাসের উন্নতি ঘটানো যায় তার আত্মসম্মান এবং স্বাস্থ্যকর আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ যারা শিশুটির দেখাশোনা করেন বা তার বাড়ীর মানুষদের আচার-ব্যবহার যদি

শিশুর পক্ষে মানানসই হয়। অপরপক্ষে তার অবিশ্বাস বৃদ্ধি পায় যদি তার প্রতি পারিপার্শ্বিক মানুষের অবহেলা, ভালোবাসার প্রতিকূলতা, অসঙ্গতিপূর্ণ চিকিৎসার দ্বারা।

২। শিশুঃ- স্বায়ত্তশাসন বনাম লজ্জা এবং সন্দেহ (১৮ মাস থেকে ৩ বছর)। (Toddler: Autonomy versus Shame and Doubt.)

শিশুর ১ বছর ৬ মাস বয়স থেকে শুরু করে তিন বছর বয়স পর্যন্ত সময় কালকে এরিকসন মানসিক বিকাশের দ্বিতীয় স্তর বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই স্তরে শিশুরা নিজের থেকে যে সমস্ত কাজ বা প্রতিক্রিয়া দেয় তা তাদের অনেকটা আত্মবিশ্বাস এবং আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করতে সাহায্য করে। তবে এক্ষেত্রে শিশুর এই আত্মমনা কাজে তার পিতা-মাতা বা আত্মীয়স্বজনের সমালোচনা বা শিশুর প্রতি তার আত্মীয় পরিজনের অতিরিক্ত সচেতনতা তাকে লজ্জায় ফেলে দেয়। যার ফলে তার নিজের কাজে সে কখনো কখনো সন্দেহ পোষণ করে। যেমন, একটি শিশু যখন প্রথম হাঁটতে শেখে তখন সে হাঁটতে গিয়ে অনেকবারই হোঁচট খায়, সেই সময় যদি তার আপনজনেরা তাকে অনুৎসাহিত করেন তাহলে তার হাঁটা শেখার ইচ্ছটা নষ্ট হয়ে যায়।

৩। প্রাকবিদ্যালয়ের বয়সঃ- উদ্যোগ বনাম অপরাধ বোধ (৩ বছর থেকে ৫ বছর)। (Preschool: Initiative versus Guilt.)

শিশুর তিন বছর বয়স থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত মানসিক বিকাশের স্তরকে এরিকসন তৃতীয় পর্যায় বলেছেন। এই সময়ে শিশু যে সমস্ত কাজ করে অর্থাৎ খেলাধুলা, বিভিন্ন চিন্তা এবং অন্যান্য ক্রিয়া-কলাপ এর ক্ষেত্রে যদি শিশু সফলভাবে তা সম্পাদন করতে পারে, তাহলে তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস বা ঐ কাজে উদ্যোগী হয়। কিন্তু যদি তার চিন্তাভাবনা এবং কাজকর্ম বার বার ব্যর্থ হয় বা সে সমালোচনার সম্মুখীন হয় তখন শিশুর নিজের প্রতি সন্দেহ এবং অপরাধবোধ কাজ করে।

৪। প্রাথমিক স্কুলে যাবার বয়সঃ- উৎপাদনশীলতা বনাম নিকৃষ্টতা (৫ বছর থেকে ১২ বছর)। (School Age: Industry versus Inferiority.)

এরিকসনের মতে মানসিক বিকাশের চতুর্থ ধাপটি শিশুর ৫ বছর বয়স থেকে ১২ বছরের মধ্যে ঘটে। এই সময়ে সকল শিশু তার কাজের প্রতি উৎপাদনশীল এবং তার উৎপাদনশীলতার মূল্যায়ন করতে শেখে। তবে যখন সে তার কাজে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে তখন তার মনে হয় সে কাজটির জন্য অযোগ্য বা নিকৃষ্ট।

৫। বয়ঃসন্ধিকালঃ- পরিচয় বনাম পরিচয় বিভ্রান্তি। (১২ বছর থেকে ১৮ বছর) (Adolescence: Identity versus Identity Confusion.)

এরিকসন বর্ণিত মানসিক বিকাশের পঞ্চম স্তরটি হল পরিচয় বনাম পরিচয় বিভ্রান্তি। এই স্তরে বয়ঃসন্ধিকালে ঘটে যাওয়া একটি পরিচিতির সংকট দ্বারা চিহ্নিত হয়। কারণ এই সময় শিশুর কৈশোর থেকে যৌবন এর মধ্যবর্তী সময়। এই পর্যায়ে প্রত্যেকটি কিশোর-কিশোরীর কিছু শারীরিক পরিবর্তন দেখা যায়। এই সময়ে ব্যক্তির মানসিক বিকাশে স্থগিতাদেশ অনুভব করে এমনকি এই পর্যায়ে তারা বিভিন্ন ধরনের বিভ্রান্তিতে মানসিক অবসাদে ভোগে।

৬। যুবক বা তরুণ প্রাপ্তবয়স্কতাঃ- ঘনিষ্ঠতা বনাম বিছিন্নতা। (১৮ বছর থেকে ৪০ বছর) (Young adulthood: Intimacy versus Isolation.)

মানসিক বিকাশের ষষ্ঠ পর্যায় হল ঘনিষ্ঠতা বনাম বিচ্ছিন্নতা। এই স্তরটি শুরু হয় ব্যক্তির বয়ঃসন্ধিকালের শেষ থেকে বিবাহ পর্যন্ত এবং প্রাথমিক পারিবারিক জীবনের মধ্য দিয়ে মধ্যবয়স পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সময়ে ব্যক্তি নিজের পরিচয় না হারিয়ে নিজের প্রতি যত্ন নিতে শেখে। যদি তারা পরিবার থেকে কাজকর্মের পরিপূর্ণতা না পায়, তাহলে তারা একাকিত্ব বা বিচ্ছিন্নতা অনুভব করে। আগে মানসিক স্তরের একটি সমন্বিত পরিচয়ের সত্যিকারের বিকাশ ঘনিষ্ঠতা অর্জনের সুযোগ করে দেয়। আর এর নেতিবাচক ফল বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে।

৭। মধ্য-বয়স্কাঃ- উৎপাদনশীলতা বনাম স্থবিরতা। (৪০ বছর থেকে ৬৫ বছর) (Middle Age: Generativity versus Stagnation.)

উৎপাদনশীলতা বা সৃজনশীলতা বনাম স্থবিরতা পর্যায়টি হল এরিকসনের মানসিক বিকাশ পর্যায়ের সপ্তম স্তর। উৎপাদনশীলতা হল মাঝবয়সী ব্যক্তির লক্ষ্য পূরণের ইতিবাচক দিক। যা শুধুমাত্র বংশবিস্তার বা প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই নয়, সৃজনশীলতার দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই স্তরের মানুষেরা তাদের পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি একজন পরিপূর্ণ মাতা-পিতার এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করে।

৮। বৃদ্ধাবস্থাঃ- সততা বনাম হতাশা। (৬৫ বছর এর উপর) (Older Adulthood: Integrity versus Despair.)

সততা বনাম হতাশা- এরিকসন এর মানসিক বিকাশের আটটি স্তরের সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত পর্যায়। যা কিনা বৃদ্ধ বয়সে ঘটে। এই স্তরেই ব্যক্তি যে সারাজীবন সততার সঙ্গে একটি সুস্থ এবং নৈতিক জীবন অতিবাহিত করেছে তার একটি সন্তুষ্টি নিজের মানসপটে অনুভব করে, ফলে এই সুন্দর জীবন কালের নিয়মে শেষ হয়ে যাবে, এই হতাশা থেকে তার একটি তিক্ততার অনুভূতি তৈরি হয় এবং মৃত্যু ভয়ে অহং অখণ্ডতা বনাম হতাশা অনুভূত হয়।

১.৫ ব্যক্তি পরিচিতির ধরণ বা প্রকারঃ

একজন ব্যক্তির বিশ্বাস এবং ধারণার উপর তার নিজের সম্পর্কে একটি বোধ তৈরী হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নিজের সম্পর্কে বোধ (Self Concept) আর নিজের সম্পর্কে চেতনার (Self Conciousness) মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নিজের সম্পর্কে বোধ বলতে সাধারণত তার দৈহিক, মানসিক এবং সামাজিক গুণগুলিকে বোঝায়। যেগুলি একজন ব্যক্তির বিশ্বাস, অভ্যাস ইত্যাদি গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়। যা থেকে একজন ব্যক্তি তার নিজের সম্পর্কে একটি চিত্র (Self Image) তৈরী করে নেয়। একজন ব্যক্তির বিভিন্ন ধরনের পরিচিতি আমরা লক্ষ্য করি। যেমন- সাংস্কৃতিক পরিচিতি, গোষ্ঠীগত বা জাতিয় পরিচিতি, ধর্মীয় পরিচিতি, লিঙ্গ পরিচিতি প্রভৃতি। নিম্নে এই পরিচিতিগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল-

ক) সাংস্কৃতিক পরিচিতি (Cultural Identity):

সাংস্কৃতিক পরিচিতি বা পরিচয় হল কোন একটি দল বা সংস্কৃতি অথবা কোন ব্যক্তির পরিচয়ের অনুভূতি বা বোধ, যা কিনা যতটা সম্ভব সেই ব্যক্তি ঐ দল বা সংস্কৃতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রভাবিত হন। এই সাংস্কৃতিক পরিচিতিটা পরিচয়ের রাজনীতির সঙ্গে সদৃশ্য বা একই রকম কিন্তু সমার্থক নয়। আবার একই সঙ্গে এই বিষয়টি অনেক সময় একে অন্যকে অতিক্রম করেও যায় । সংস্কৃতি বিষয়ে অনেক আধুনিক প্রশ্ন রয়েছে, সেগুলি পরিচয়ের প্রশ্ন হিসাবে রূপান্তরিত হয়।

সাংস্কৃতিক পরিচিতির (Cultural Identity) ধারণা আসলে কমিউনিকেশনের ধারণার মধ্যেই নিহিত। 'সাংস্কৃতিক' এর ধারণাটি জটিল এবং বৈচিত্র্যময় হওয়ার কারণে তার মধ্যে যেমন অনেক মতো পার্থক্য বর্তমান, তাই সাংস্কৃতিক পরিচিতির ধারণাটিকে বিভিন্ন তত্ত্বগত, পদ্ধতিগত এবং সত্তাগত দিক থেকেও আলোচনার প্রয়োজন দেখা যায়। সাংস্কৃতিক পরিচিতি এক অর্থে সমাজবদ্ধ মানুষের পরিবর্তনশীল অভিজ্ঞতা, প্রকাশ, এবং আপস-আলোচনা হিসাবে বোঝা যেতে পারে। একাধিক গোষ্ঠীর মধ্যে একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি নিজের গ্রহণযোগ্যতা কামনা করে। কারণ মানুষ নিজের সত্তা শুধুমাত্র একটি গোষ্ঠীতেই চিহ্নিত করেনা। বরং তা চিহ্নিত করে একাধিক গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে। আবার, একজন তার সাংস্কৃতিক পরিচিতি'কে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করবে, তা তাদের প্রেক্ষাপট, সমস্যা, এবং পারিপার্শ্বিক মানুষদের ওপর নির্ভরশীল।

গতকয়েক দশক ধরে সাংস্কৃতিক পরিচিতি বিষয়ে বিভিন্ন সমাজ দার্শনিক এবং গবেষকদের মধ্যে আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে। বস্তুত, বেশ কয়েকটি সাম্প্রতিক আলোচনার দিকে চোখ রাখলে দেখা যায়, সাংস্কৃতিক পরিচিতি আসলেই ইন্টারকালচারাল কমিউনিকেশন স্টাডিজের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।[43] সাংস্কৃতিক পরিচিতি গবেষকদের গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে। বিভিন্ন ধারণার মধ্যে পণ্ডিতরা যে একটি বিষয়ে একমত তা হল সাংস্কৃতিক পরিচিতি

---

[43] Bardhan, N, Orbe, M. P, (Eds.), *Identity Research in Intercultural Communication*, Lanham, MD: Lexington Books, 2012, pp- xiii–xxv.

আসলে একটি ছাতার মতো বা ‘Umbrella Term’[44] যার মধ্যে অন্যান্য পরিচিতি সম্পর্কিত গোষ্ঠী পরিচয় বর্তমান। যেমন, জাতি, বর্ণ, বয়স, লিঙ্গ, যৌনতা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, আঞ্চলিক পরিচয়, জাতিগত পরিচয়, রাজনৈতিক পরিচিতি, ক্ষমতা, এবং অক্ষমতা জড়িয়ে আছে। ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিচিতি সহজাতভাবে সম্পর্কযুক্ত, এবং যোগাযোগ পছন্দ, আচরণ, এবং প্রকাশ দ্বারা রূপায়িত।

সময়, ক্ষেত্র এবং স্থান জুড়ে ইন্টার কালচারাল স্কলাররা কিছু নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিচিতিতে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মন (Moon,1996) 1978 থেকে 1980 র দশকে বিভিন্ন ইন্টারকালচারাল নিবন্ধগুলিতে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বলেছেন যে, সাংস্কৃতির ওপরে থাকে জাতি-রাষ্ট্রের আধিপত্য। শাইন (Shin) এবং জ্যাকসন (Jackson,2003) ইন্টারকালচারাল কমিউনিকেশন স্কলারদের জাতিসত্তা এবং জাতির ভাষাগত পরিচয়ের ওপর জোর দেওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। আবার অন্যবহু তাত্ত্বিক তাঁদের ইন্টারকালচারাল কমিউনিকেশন স্টাডিজে, মন, হোলিং এবং নাক্যামা ও মার্টিন (Moon & Holling, 2015; Nakayama & Martin, 1999) জাতিগত পরিচয়ের প্রাধান্যের দিকে মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু এই ভিন্ন ভিন্ন তাত্ত্বিকদের সাংস্কৃতিক পরিচিতি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও, একথা সত্য যে, সাংস্কৃতিক পরিচিতি আসলে একাধিক পরিচিতির সংমিশ্রণে তৈরি। যা একই সাথে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক বিষয়।[45]

সুতরাং সাংস্কৃতিক পরিচিতি কিভাবে গঠিত হয় এবং এই পরিচিত গঠনে ইন্টার কালচার কমিউনিকেশন কী ভূমিকা পালন করে? ঔপনিবেশিকতা, ইতিহাস, অর্থনীতি, ভূ-রাজনৈতিক সম্পর্ক, শক্তি এবং জ্ঞান প্রভৃতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচিতির ধারণাটি বুঝতে কীভাবে উৎসাহিত করে, সেই বিষয়টির দিকে অবশ্যই আমাদের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

---

[44] Chen, Yea-Wen, Lin , Hengjun, *Cultural Identities,* Oxford Research Encyclopaedias, Oxford University Press, USA, 2016, P-2.

[45] Ibid, P-2.

সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে (Social Scientific Approaches) :

সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সাংস্কৃতিক পরিচিতি হল একটি "সামাজিক শ্রেণীকরণের পদ্ধতি", যা একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ এবং তার সাথে যুক্ত গোষ্ঠীগুলির সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে।[46] অন্যভাবে বলা যায় যে, সাংস্কৃতিক পরিচিতি ব্যক্তির নিজস্ব এবং সামাজিক উভয় অর্থকেই গ্রহণ করে, যা আসলে অবিচ্ছেদ্য। বিশেষ করে সমাজ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, যেমন- Cross-Cultural Psychology সাধারণত জাতি বা অন্যান্য বৃহৎ গোষ্ঠীর পরিপ্রেক্ষিতে জাতিগত বা আঞ্চলিক গোষ্ঠীকে নির্ণয় করে।

বেরী (Berry,1980) ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই Cross-Cultural Psychology তথ্যের বৈচিত্র্যকে আসলে বৃদ্ধি করে।[47] প্রাথমিকভাবে, সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিগুলি ব্যক্তির আইডেন্টিফিকেশন, সাইকোলজিক্যাল এটাচমেন্ট এবং ইমোশনাল সিগনিফিকেন্স এর উপর নির্ভরশীল। এগুলি সে গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে গোষ্ঠীর মূল্যবোধ, রীতিনীতি, নিয়ম বা যোগাযোগের অনুশীলন হিসেবে জেনে আসে।

ব্যাখ্যামূলক সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি (Interpretative Cultural Approaches):

ব্যাখ্যামূলক সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি (Interpretative Cultural Approach)- সাংস্কৃতিক পরিচিতিকে সামাজিক সাংস্কৃতিক নির্মাণ হিসাবে দেখে, যা শুধুমাত্র নিজের দ্বারা সৃষ্ট নয়। বরং অন্যান্য একাধিক বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল এবং গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্য, বা অ-গোষ্ঠীর সদস্যদের সাথে মিথস্ক্রিয়া দ্বারা গঠিত হয়। আর এই ব্যাখ্যামূলক সাংস্কৃতিক পদ্ধতির লক্ষ্য হল কীভাবে কোন ব্যক্তি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ধারণা উৎপন্ন করে। এপ্রসঙ্গে বলা যায় কলিয়ার

---

[46] Yep, G, *Approaches to Cultural Identity: Personal notes from an Auto-Ethnographical Journey*, Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2004, P-74.

[47] Berry, J. W, Triandis, H. C,(Eds.), *Handbook of cross-cultural psychology* (Vol. 1), Boston: Allyn and Bacon, 1980, p- 3.

(Collier) এবং থমাস (Thomas,1988) সাংস্কৃতিক পরিচয় তত্ত্বের তাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক পরিচিতিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এইভাবে-

> "Cultural identity as a negotiated identification with and perceived acceptance into a group that has shared systems of symbols and meanings as well as norms/rules for conduct"[48]

একইভাবে, জ্যাকসন (Jackson, 1999) 'Cultural Contract Theory' র লেখক সাংস্কৃতিক পরিচিতিকে ব্যখ্যা করেছেন-

> "the sense of belonging to a cultural community that reaffirms self or personhood for the individual and is created by: the people, their interactions, and the context in which they relate."[49]

অর্থাৎ জ্যাকসন (Jackson) এর মতানুসারে, সাংস্কৃতিক পরিচিতিটি, পক্ষান্তরে কালচারাল কমিউনিটি আসলে গঠিত হয়, "মূল্যবোধ, নিয়ম, অর্থ, প্রথা, এবং বিশ্বের সাথে সম্পর্কিত বিশ্বাস"এর ভিত্তিতে। ব্যাখ্যামূলক সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি একটি নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর উদীয়মান, গতিশীল, মিথস্ক্রিয়াসম্পন্ন সাংস্কৃতিক পরিচিতির প্রাসঙ্গিক প্রকৃতির ওপর জোর দেয়।

বিশ্লেষণ মূলক দৃষ্টিভঙ্গি (Critical Interpretive Approach):

ক্ষমতার লড়াই, ঔপনিবেশিক ইতিহাস এবং প্রতিনিধিত্বের সংকট ইত্যাদি বিষয়ের সমালোচকদের প্রত্যুত্তরে কলিয়ার (Collier) এবং তার সহকর্মীরা সাংস্কৃতিক

---

[48] Collier, M. J, Thomas, M, *Identity in Intercultural Communication: An Interpretive Perspective.* In Y. Y. Kim & W. B. Gudykunst (Eds.), *Theories of Intercultural Communication, International and Intercultural Communication Annual* (Vol. 12), Newbury Park, CA: SAGE, 1988, P-113.

[49] Jackson, R. L, *The Negotiation of Cultural Identity: Perceptions of European Americans and African Americans*, Westport, CT: Prager, 1999, p-10.

পরিচিতির ধারণাকে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, যেখানে সাংস্কৃতিক পরিচিতি হল, সাংস্কৃতিক অবস্থান এবং শনাক্তকরণের একটি সংযোগ। এই সংযোগ আসলে "ঐতিহাসিক, ক্ষেত্রবিশেষ এবং সম্বন্ধযুক্ত নির্মাণ।" বিশ্লেষণ মূলক দৃষ্টিভঙ্গি (Critical Interpretative Approach) এর পরিপ্রেক্ষিতে সাংস্কৃতিক পরিচিতি হল "সামাজিকভাবে নির্মিত, গঠনগতভাবে সক্রিয় এবং সীমাবদ্ধ, বিস্তীর্ণভাবে গঠিত হওয়ার এবং কথা বলা ও আচরণ যা নির্দিষ্ট অথচ পরিবর্তনশীল, একাধিক অথচ অবিসংবাদিত, রাজনৈতিক, এবং আপাতবিরোধী।" অর্থাৎ

> "socially constructed, structurally enabled or constrained, discursively constituted locations of being, speaking, and acting that are enduring as well as constantly changing, multiple yet non-summative, and political as well as paradoxical"[50]

খ) গোষ্ঠীগত ও জাতিগত পরিচিতি (Ethnic and National Identity):

গোষ্ঠীভিত্তিক পরিচয় হল, কোন একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর পরিচয়। যা কিনা কোন একটি পূর্বকল্পিত সাধারণ বংশের উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়। অন্য ব্যক্তিদের দ্বারা একটি সুনির্দিষ্ট জনজাতিগত দল হিসাবে পরিচয়টা অনেক সময়ই এই পরিচয়ের সীমাবদ্ধতার উন্নয়ের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাধারণ সাংস্কৃতিক, আচরণ মূলক, ভাষাতাত্ত্বিক বা ভাষাগত, প্রথাগত অথবা ধর্মীয় বিশ্বাসের দ্বারা এই জনজাতি দলগুলি বেশীরভাগ সময়ই সংঘবদ্ধ হয়।

এই ধরনের পরিচয়ের আবির্ভাবের ক্ষেত্রে যে, প্রক্রিয়া গুলি মূখ্য ভূমিকা পালন করে সেগুলিকে সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয় গোষ্ঠীগত বিদ্যা বা জনজাতিগত বিদ্যা। নানা রকম সংস্কৃতির অধ্যায়ন বা বিদ্যা এবং সামাজিক তত্ত্ব সাংস্কৃতিক ও গোষ্ঠীগত পরিচয়ের প্রশ্ন গুলিকে আলোচনা করে। সাংস্কৃতিক পরিচয়টি যে বিষয়গুলি নিয়ে গড়ে

---

[50] Chen, Yea-Wen, Lin, Hengjun, *Cultural Identities,* Oxford Research Encyclopaedias, Oxford University Press, USA, 2016, P-4.

ওঠে তা হল, যেমন- স্থান, লিঙ্গ, জাতি, ইতিহাস, জাতীয়তাবোধ বা নাগরিকত্ব, যৌন অভিযোজন, ধর্মীয় বিশ্বাস সমূহ ইত্যাদি। জাতীয় পরিচয় হল একটি নৈতিক বা দার্শনিক ধারণা, যেক্ষেত্রে বা যার দ্বারা সকল মানুষ কিছু গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়, যে দল বা গোষ্ঠীগুলিকে বলা হয় রাষ্ট্র বা জাতি। সেই জাতি বা রাষ্ট্রের অন্তর্গত সদস্যরা একটি সাধারণ পরিচয় বহন করে এবং একই সঙ্গে একটি সাধারণ পরিচিতিকেও বহন করে, যা কিনা তাদের বংশ পরম্পরা থেকে প্রাপ্ত।

'এথনিক' বা 'Ethnic' শব্দটির উৎস ল্যাটিন শব্দ Ethnicus এবং গ্রীক শব্দ 'Ethnikas' থেকে। যার উভয়ের অর্থই হল জাতি বা Nation। ঐতিহাসিকভাবে শব্দটি বিধর্মীদের (Heathen) বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রীকভাষায় 'Ethos' এর অর্থ হল স্বভাব বা বৈশিষ্ট্য। এই Ethnikas এবং Ethos শব্দ দুটির সম্মিলিত অর্থ বোঝায় একদল মানুষ যারা দলগতভাবে থাকে এবং কিছু সাধারণ রীতিনীতি, প্রথা মেনে চলে। অপরদিকে 'Identity' শব্দটি ল্যাটিন Identitas থেকে উদ্ভূত যা আবার Idem শব্দ থেকে গঠিত, যার অর্থ 'একই'। সুতরাং যে শব্দটি একতা, সাদৃশ্য এবং একত্বের ধারণা প্রকাশ করে।[51] আরও স্পষ্ট করে বললে, পরিচয় মানে "কোনও ব্যক্তি বা জিনিসের সর্বাবস্থায় সমস্ত পরিস্থিতিতে একই অবস্থার বা একটি অপরিবর্তনীয় সত্য যা একজন ব্যক্তি বা জিনিসের সংজ্ঞা সে নিজেই।"[52] অর্থাৎ

> "the sameness of a person or thing at all times in all circumstances; the condition or fact that a person or thing is itself and not something eles"।

'Identity' এবং 'Ethnicity' র সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যার সমন্বয় করে, এই ধারণায় পৌঁছানো যেতে পারে যে 'Ethnic Identity' বলতে সাধারণত প্রথা, ঐতিহ্য,

---

[51] Fisher, Celia. B, Lerner, Richard. M (Eds.) *Encyclopaedia of Applied Developmental Science,* (Vol. 1.), Sage Publications, 2005, P-415.

[52] Simpson, J. A, Weiner, E. S, *The Oxford English Dictionary* (2nd ed. Vol.7), Oxford, UK: Clarendon, 1989, p-620.

ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এবং কিছু ক্ষেত্রে ভৌগলিক বাসস্থান ভাগ করে নেওয়া জাতির অভিন্নতাকে বোঝায়।[53]

জাতিগত পরিচিতির ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি (Historical Approaches to Ethnic Identity):

জাতিগত পরিচিতির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় বিংশ শতকের গোড়ার দিকের নৃতাত্ত্বিক এবং সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্যে, অ-পশ্চিমা সংস্কৃতি ক্ষেত্রের দিক দিয়ে। Ethnic Groups এবং Ethnicity শব্দদুটি প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল একই সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত এবং একই প্রথা, ভাষা এবং ঐতিহ্যকে ভাগ করে নেওয়া লোকদের বোঝাতে। বছরের পর বছর ধরে জাতিগত পরিচয় বিভিন্ন উপাদানগুলির সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে বলে মনে করা হয়। ‘Ethnic Identity’ র ধারণার উল্লেখ ঊনিশ শতকের শুরুর দিকে খুঁজে পাওয়া যায়। 1808 সালে হুগ মারি (Hugh Murray) মানসিক চিত্রায়নের ওপর ব্যক্তি-স্বীকৃতির বিষয়টি উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

> “But I think it evident that the characteristic qualities ... are wholly unconnected with those external by which races which are distinguished . Mind is more flexible substance and yields more readily to the influence of altered circumstances.”[54]

1896 সালে ফরাসি জাতীয়তাবাদী এবং বিজ্ঞানী Georges Vacher de la Pouge প্রথম Ethnic Identity শব্দটি একটি জনগোষ্ঠীর “প্রাকৃতিক এবং নকল” সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করতে ব্যবহার করেন।

---

[53] Fisher, Celia. B, Lerner, Richard. M (Eds.) *Encyclopaedia of Applied Developmental Science,* (Vol. 1.), Sage Publications, 2005, P-415.

[54] Murray, H, *Enquiries Historical and Moral, Respecting the Character of Nations, and the Progress of Society,* Edinburgh, Scotland, 1808, PP- 33-34.

জাতিগত পরিচিতির আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি (Modern Approaches to Ethnic Identity):

গবেষকদের ব্যাখ্যায়িত তত্ত্ব অনুসারে ‘জাতিগত পরিচিতি’র সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়। ‘জাতিগত পরিচিতি’র সংজ্ঞা বিষয়ে ঐক্যমত না থাকায় বিষয়টি সম্পর্কে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। সাধারণত ‘জাতিগত পরিচিতি হল একটি সম্বন্ধযুক্ত গঠন যার মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তি নিজেদের এবং অন্যদের দ্বারা একটি নির্দিষ্ট জাতিগত বা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর অন্তর্গত হিসাবে জীবন কাটায়।আবার একজন ব্যক্তি একটি গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত হতে পারার বিষয়টি বেছে নিতে পারেন। এই পছন্দের বিষয়টি আবার জাতিগত, জন্মগত, প্রতীকী এবং সংস্কৃতিগত কারণের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।[55] কিভিস্টো (Kivisto) ও নেফজার (Nefzger) মনে করেন, জাতিগত কারণের সাথে শরীরবৃত্তীয় এবং শারীরিক ব্যবহার জড়িত। জন্মগত কারণের সাথে ‘মাতৃভূমি’ বা ব্যক্তির পিতামাতা এবং আত্মীয়দের উৎস জড়িত; এবং প্রতীকী জাতিগত পরিচিতি এর মধ্যে ছুটির দিন, খাবার, পোশাক, শিল্পকর্ম ইত্যাদি যুক্ত থাকে। তবে ব্যক্তির জাতিগত বা জাতিগত গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি তাদের আচরণের উপর কমবেশি প্রভাব ফেলে।[56]

Yuet Cheung (1993) জাতিগত পরিচিতির বা ‘Ethnic Identity’ কে “the psychological attachment to an ethnic group or heritage” হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। আবার Barth এর মতে, Ethnic Identity হল একটি গোষ্ঠী থেকে অপর গোষ্ঠীকে পার্থক্য করার একটি উপায়।[57]

---

[55] Fisher, Celia. B, Lerner, Richard. M (Eds.) *Encyclopaedia of Applied Developmental Science,* (Vol. 1.), Sage Publications, 2005, P-417.

[56] Ibid, P-417.

[57] Barth, F, *Ethnic groups and boundaries : The social organization of culture difference*, Boston : Little, Brown, 1969.

গ) ধর্মীয় পরিচিতি (Religious Identity):

ধর্মের ধারণা (The Concept of Religion):

অনেক পন্ডিত ধর্মকে বিভিন্ন উপায়ে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন। তবে আপাতভাবে ধর্মের কোন সাধারণ স্বীকৃত সংজ্ঞা নেই যেহেতু ধর্মের সাথে বৈচিত্র্যের দিকটি আমরা এড়িয়ে যেতে পারিনা। এই বৈচিত্র্য হল ধর্ম এবং ধর্মীয় অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য, ধর্মীয় উৎসের বৈচিত্র্য। তবে অনেক ধর্মতত্ত্ববিদ, দার্শনিক, মনোবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী এবং পণ্ডিতগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে ধর্মকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন।

তবে বিভিন্ন সংজ্ঞার দিকে তাকালে একটি সাধারণ বিষয় বোঝা যায় যে ধর্মকে যে উপায়েই সংজ্ঞায়িত করা হোক না কেনো, তা একটি নির্দিষ্ট চিন্তা বা শৃঙ্খলার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই। উদাহরণস্বরূপ, ধর্মের প্রতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলি প্রায়শই ধর্মের সামাজিক বা মনস্তাত্ত্বিক কার্যক্রম এবং বিশ্বাসের দিকদুটিকেই নির্দেশ করে। Etymological ভাষায় ব্যুৎপত্তিগত অর্থে 'Religion' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Religare' থেকে এসেছে যার অর্থ 'আবদ্ধ করা' বা 'পুনরায়- বাঁধাই করা'("to bind back" or "to re-bind")[58]।

ধর্মীয় পরিচিতি (Religious Identity):

ধর্মীয় পরিচয় হল একগুচ্ছ বিশ্বাস এবং অনুশীলন। যেগুলি সাধারণত কোন একজন ব্যক্তির দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। যিনি বিধিবদ্ধ বিশ্বাস এবং আচরণ, পূর্বপুরুষ সংক্রান্ত অধ্যায়ন অথবা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিবন্ধ, ইতিহাস এবং পৌরাণিক আখ্যান এবং তার সঙ্গে সাধারণ বিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে দৃঢ়ভাবে জড়িত। 'ধর্মীয় পরিচিতি' এই বিষয়টি মানুষের ব্যক্তিগত অনুশীলন (যেগুলি সাম্প্রদায়িক বিশ্বাস এবং আচার-আচরণ এবং এই ধরনের বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত) এগুলিকে নির্দেশ করে।

---

[58] Oppong, Steward Harrison, *Religion and Identity*, American International Journal of Contemporary Research, Vol. 3 No. 6, USA, 2013, P-11.

এই পরিচিতির গঠনটা আরম্ভ হয় পিতা মাতার ধর্মীয় সংযোগের (বিষয়) সাথে সাথে, আবার কোন ব্যক্তির 'ব্যক্তি' হয়ে ওঠাটা নির্ভর করে বা ওঠার জন্য দরকার তার পিতা-মাতার সদৃশ্য ধর্মীয় পরিচিতি বা পরিচয় গ্রহণের মাধ্যমে অথবা পৃথক কোন ধর্মীয় বিষয় গ্রহণের মাধ্যমে।

দুর্খেম (Durkheim) কে উল্লেখ করে হ্যামন্ড (Hammond) বলেছেন যে, ধর্ম হল সামাজিক পরিস্থিতির একটি আহরণ, যা জীবনযাপনের অনৈচ্ছিক গ্রহণযোগ্যতার জন্য পরিবেশ তৈরি করে, বিশেষত গোষ্ঠীর সদস্যতার ফল হিসেবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের ঐক্য এবং অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বোধ প্রকাশ করে থাকে আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস-ব্যবস্থা, অভিযোজন এবং আচরণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সদস্য চিহ্নিত করে থাকে, কোন প্রতীক বা বস্তুকে কেন্দ্র করে যা তারা পবিত্র বলে মনে করে।[59] একথা স্বীকার্য যে Religion এবং Ethnicity র মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান। এই পারস্পরিক সম্পর্ক কেউ জাতিগতভাবে, বিষয়গতভাবে বা বস্তুনিষ্ঠভাবে উপলব্ধি করে। এমনকি যখন কেউ ভান করেও কোন জাতিসত্তাকে গ্রহণ করার চেষ্টা করে, সেখানেও একটি গোষ্ঠীতে একজন ব্যক্তির সংযোজন বা আত্তীকরণ ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, একটি ধর্মবিশ্বাসে অংশগ্রহণ বা সদস্যপদ গ্রহণ একজনের জাতিগত বৈশিষ্ট্য বা সেটি বেশিরভাগই একজনের জাতিগতসত্তার সাথে অত্যন্ত সম্পর্কযুক্ত।

ধর্ম এবং জাতিসত্তার সম্পর্কটি আমরা ভালো করে বুঝতে পারব যদি আমরা যুবসম্প্রদায়ের ওপর পরিচিতি নির্মাণে ধর্মের ভূমিকার দিকে চোখ রাখি। এরিকসন (Erikson,1965), একজন যুবকের পরিচিতি তৈরিতে ধর্মের ভূমিকার কথা বলেছেন। তাঁর মতে ধর্ম সামাজিক-ঐতিহাসিক বিষয়ের সাথে জড়িত। এই সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের ওপর ভিত্তি করেই একজন মানুষের পরিচিতির গঠন উন্নত হয়। তিনি

---

[59] Ibid, P-12.

আরও বলেন যে, ধর্ম অন্যতম প্রাচীন একটি প্রতিষ্ঠান যা নিয়মানুবর্তিতা, ও আনুগত্যের জন্ম দেয়। এই নিয়মের মধ্যে সংযোজিত হওয়াই তার ব্যক্তি-সংকট দূর হয়।[60]

ঘ) লিঙ্গগত পরিচিতি (Gender Identity):

পরিচয় বা পরিচিতির সংকট সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে আমরা লক্ষ্য করতে পারি ব্যক্তির ভূমিকায় পারিবারিকভাবে, সামাজিকভাবে, রাজনৈতিক বা অন্যান্য ব্যক্তি হিসেবে অর্থাৎ ব্যক্তির চেহারা, গুণাবলী, ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করে।[61]

পরিচিতি হল সেই মূল্যবোধ যা একজন ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তির থেকে পৃথক করে তোলে। পরিচিতি হল সর্বদাই পরিবর্তনশীল চলমান বিষয়বস্তু। আমরা ভেবে দেখলেই দেখতে পারব, একজন ব্যক্তি ছোট বাচ্চা শিশু থেকে শুরু করে মৃত্যুকাল পর্যন্ত কখনো সে বাবা, কখনো মামা, কখনো আবার দেশের নেতা-মন্ত্রী ,আবার সেই বৃদ্ধ বয়সে দাদু। তাহলে, লক্ষ্য করতে পারি যে পরিচিতি বিষয়টি পরিবর্তনশীল।[62]

ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত পরিচিতির বিষয়টিকে আমরা আলোচনা করতে গেলে লিঙ্গ ভাষা ধর্ম পেশাগত প্রভৃতি পরিচিতি সম্পর্কে আলাদাভাবে আলোচনা করা যেতে পারে, যদি ব্যক্তিগত পরিচিতির বিষয়টিকে আলোচনা করতে চাই তাহলে প্রথমে একটি বিষয় মাথায় আসে, সে পুরুষ, না নারী অর্থাৎ তার লিঙ্গ। লিঙ্গ শারীরিক ভাবে এবং মানসিক ভাবে দুভাবে আমরা ভাগ করতে পারি, শারীরিকভাবে পুরুষ এবং মহিলা। কিন্তু মানসিকভাবে অর্থাৎ কোন ব্যক্তি পুরুষের শরীর থাকার সত্বেও মানসিকভাবে সে মহিলা, আবার অনুরূপভাবে কোন ব্যাক্তির মহিলা শরীর থাকার সত্ত্বেও পুরুষের মত আচরণ। আর সমস্যার সৃষ্টি হয় এখানেই। আমাদের লিঙ্গ পরিচয় হল পুরুষ বা

---

[60] Ibid, P-14.

[61] Burke, Peter, Kivisto, Peter (ed.), *Identity*, The Cambridge Handbook of Social Theory: Volume 2: Contemporary Theories and Issues, Cambridge University Press, vol. 2, 2020, pp-63–78.

[62] Kurzwelly, J, *Being German, Paraguayan and Germanino: Exploring the Relation Between Social and Personal Identity*, 2019, PP-144–156.

মহিলার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শারীরিক দিক দিয়ে আলোচনা করি না, তাদের লিঙ্গের পরিচিতির জন্য পৃথক শব্দের ব্যবহার করা হয়। যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ পায়।

লিঙ্গভিত্তিক পরিচিতি অর্থাৎ নিজেকে মহিলা বা পুরুষ হিসেবে বিবেচনা করা। লিঙ্গভিত্তিক পরিচয়ের সনাক্তকরণ করা হয় বাহ্যিক এবং আন্তর কারণগুলির সংমিশ্রণে। কোন ব্যক্তি নিজেকে পুরুষ বলে মনে করেন এবং পুরুষ হিসেবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন তাহলে তার লিঙ্গের পরিচয় হবে তিনি পুরুষ। এটি আবার অনেক সময় বিপরীত হয়, অর্থাৎ শারীরিকভাবে পুরুষ হলেও সে নিজেকে পুরুষ হিসেবে সমাজে পরিচয় দিতে দ্বিধাগ্রস্থ হয়, নিজেকে নারী বলে দাবি করে, ফলে সৃষ্টি হয় লিঙ্গ পরিচয়ের সংকট। আর এই সমস্যা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশি পরিমাণে জটিল করে তোলেন। ড: শুভ ঘোষের মতে,

> “transgender role is often an out-word expression of gender identity, but not necessarily so. In most individuals, gender identity and gender role are congruous.”[63]

পূর্ববর্তী সময়ে এই লিঙ্গ পরিচিতির সংকট বেশি পরিমাণে দেখালেও সে তার লিঙ্গ পরিবর্তন করাতে পারত না। কিন্তু বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসার অসামান্য উন্নতির ফলে পুরুষ, নাড়ীতে আবার নারী পুরুষে রূপান্তরিত হতে পারে। যেমন- নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়ে রূপান্তরিত হয়েছেন। একটা জিনিস আমরা এখানে লক্ষ্য করতে পারি, চিকিৎসা বিজ্ঞান, আইন যাই হোক না কেন, তবে সাধারনত সমাজের নিম্নস্তরের মানুষদের কাছে আজও এই বিষয়টি কিন্তু স্বীকৃতি পায়নি। [64]

---

[63] Ghosh, Shuvo, (Ed), *Gender Identity*, Medscape, Dec, 2020. https://emedicine.medscape.com/article/917990-overview

[64] Morrow, D. F, *Sexual Orientation and Gender Identity Expression*, New York: Columbia University Press, 2006, pp- 3–17.

১.৬ আন্তঃব্যক্তিক পরিচিতির গঠন (Interpersonal Identity Development):

পারস্পরিক পরিচয় বা সামাজিক সম্পর্ক্য বা সম্বন্ধ বলতে নানা রকম সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে বোঝায়। এই সামাজিক সম্পর্ক্য গুলি সামাজিক অবস্থা বা পদমর্যাদা এবং সামাজিক ভূমিকা পালনকারী দুই বা ততোধিক লোকের মধ্যে সামাজিক বিধি বিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সমাজতাত্ত্বিক বৈশ্যমের বিষয়ে সামাজিক সম্বন্ধটা আচরণগত, কর্মগত, বা সামাজিক আচরন, সামাজিক কর্ম, সামাজিক যোগাযোগ এবং সামাজিক আন্তঃসম্পর্কের থেকে অনেক বেশী উন্নত। এই সামাজিক সম্বন্ধ গুলো সামাজিক সংঘ, সামাজিক সংগঠন বা পরিকাঠামো, সামাজিক আন্দোলন এবং সামাজিক নিয়ম- এই সকল ধারণার ভিত্তি রচনা করে।

আন্তর্ব্যক্তিক পরিচিতির উন্নয়নের বিষয়টি তিনটি উপাদানের সম্বন্বয়ে গঠিত –

১) শ্রেণীকরণঃ- নিজেদেরকে অন্যদের থেকে আলাদা করার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা।

২) পরিচিতিকরণঃ- একই ধরনের গোষ্ঠী গুলিকে পরস্পর গোষ্ঠী গুলির সঙ্গে যুক্ত করা।

৩) তুলনাঃ- বিভিন্ন গোষ্ঠী গুলির মধ্যে তুলনা করা।

আন্তর্ব্যক্তিক পরিচিতির উন্নতির বিষয়ে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠনে যে উপাদান গুলি প্রয়োজন সেগুলি হল, যথা- ধারণা, বিশ্বাস, আচরণ এই উপাদানগুলি সম্পর্কে প্রশ্ন করতে এবং পরীক্ষা করতে সুযোগ করে দেয় কোন ব্যক্তিকে। অন্য মানুষের কাজ কর্ম এবং চিন্তা-ভাবনা একজন ব্যক্তির পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিশেষ সামাজিক প্রভাব পালন করে। এই সামাজিক প্রভাবের উদাহরণ গুলি সামাজিকীকরণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ চাপ সৃষ্টি করে কোন মানুষের আচরণের উপরে। যিনি নিজের সত্তা বা আত্মাকে চিন্তা করছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে একই বিষয়কে গ্রহণ করছে এবং ভিন্ন বিষয়টি বর্জনের ক্ষেত্রে চিন্তা করছে, ঐ গ্রহণ বা বর্জনের বোধটা আসে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে (অন্য মানুষের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে)। এই আন্তর্ব্যক্তির পরিচিতির উন্নয়ন সংঘঠিত হয়, যখন কোন

মানুষ অভিযান মূলক আত্মবিশ্লেষণ বা আত্ম মূল্যায়ন করেন। এই মূল্যায়ন অনেক সময়ই আত্মা বা পরিচিতি বোধের ক্ষেত্রে সহজবোধ্য এবং সুদৃঢ় বোধ গঠনের মাধ্যমে সমাপ্ত হয় অর্থাৎ ঐ আত্মমূল্যায়নটা তখনই শেষ হয় যখন আমি খুব সহজ ভাবে এবং কার্যকরীভাবে বা সুদৃঢ় ভাবে জানতে পারি।

১.৭ পরিচিতির উপর বিভিন্ন প্রভাব (Influences on Identity):

পরিচিতি গঠনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম প্রভাব লক্ষ্য করা যায়– এই নিবন্ধের অন্যান্য বিভাগে এই বিষয়ে ইতি মধ্যেই ঐ প্রভাবগুলির কিছুটা আলোচিত হয়েছে। এই প্রভাব গুলির মধ্যে চারটি প্রভাব বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলি হল- জ্ঞানীয় প্রভাব (Cognitive Influences), শিক্ষাগত প্রভাব (Scholastic Influences), সামাজিক সাংস্কৃতির প্রভাব (Socio-cultural Influences) এবং পিতা-মাতার প্রভাব (Parenting Influences)।

পরিচিতি গঠনের উপর জ্ঞানীয় প্রভাব (Cognitive Influences):

পরিচিতি গঠনের ক্ষেত্রে জ্ঞানীয় উন্নয়নের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যখন বয়ঃসন্ধিক্ষণের ছেলে বা মেয়েরা কোন বিষয়কে বিমূর্ত ভাবে অর্থাৎ কাল্পনিকভাবে ভাবতে পারেন এবং কোন বিষয়কে যৌক্তিকভাবে কার্য-কারণ সূত্রে আবদ্ধ করতে পারেন, তখন বলা যেতে পারে যে, তারা পূর্বের তুলনায় সহজ ভাবে সম্ভাব্য পরিচয় গুলিকে খুঁজতে সক্ষম হয়েছে এবং সেই বিষয়ে অনুধাবন করতে পারে। আবার যখন একটি ছেলে বা মেয়ে যথার্থ জ্ঞান উন্নয়ন এবং পরিপক্কতা লাভ করে, তখন সে সতীর্থদের তুলনায় পরিচিতির বিষয়টিকে আরো বেশী করে সমাধান করতে চায়। যে সতীর্থরা জ্ঞানীয় দিক থেকে তার থেকে কম উন্নত। আবার যখন পরিচিতির বিষয়টি সহজতর বা উন্নতভাবে সমাধান করা হয়, তখন সেই পরিচিতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে আরো বেশীকরে সময় এবং প্রচেষ্টা বা শ্রম দেয়। আগে থেকেই কোন সুদৃঢ় পরিচিতি থাকাটা কাম্য, পরিস্থিতি এবং তা ব্যক্তির জীবনে অভীপ্সিত লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে একটা প্রাথমিক পদক্ষেপ।

পরিচিতি গঠনের উপর ঘরানাগত প্রভাব (Scholastic Influences):

বয়ঃসন্ধিক্ষণের ছেলে-মেয়েরা যারা উত্তর মাধ্যমিক শিক্ষা পেয়েছে তারা আরো একটু বেশী মূর্ত বিষয় এবং স্থায়ী পেশাগত প্রতিশ্রুতি পালন করতে চায়। অতএব মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে গমনের ক্ষেত্রে সফলতার দিক থেকে একজন ব্যক্তির পরিচিতি গঠনকে প্রভাবিত করে, অনেক সময় অবশ্য বিপরীতটাও সত্য হতে পারে, যেখানে পরিচয়টাই শিক্ষা এবং শিক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়কে প্রভাবিত করে, এই দুটি পারস্পরিক ভাবে একে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করে চলতে পারে। যার ফলস্বরূপ একজন মানুষের পরিচয় গড়ে ওঠে। কোন ব্যক্তি পরিচিতি নির্মাণের প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং উপায়ের উপর ভিত্তি করে সুশিক্ষিত হবে। পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর ঘরানাতে শিক্ষিত ব্যক্তিরা (Scholastics) আমাদের মস্তিস্ক (Brain) ক্ষেত্র যেমন গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়ের ক্ষেত্রেও ।

পরিচিতি গঠনের উপর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব (Sociocultural Influences):

সামাজিক ও সংস্কৃতিক প্রভাবগুলি বৃহত্তর সামাজিক এবং ঐতিহাসিক পটভূমিকার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, অতীতে যুবক-যুবতিরা সাধারণত তাদের পিতা-মাতার দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হবে। যেমন- একই চাকরী, ধর্মীয় বিশ্বাস গ্রহণ ইত্যাদি। বর্তমান সমাজে তাদের পরিচয়ের অভিযানে বা পরিচয় প্রতিস্থাপনে বা গঠনে আরোবেশী পছন্দ এবং আরো প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য আরো অনেক বিকল্প পথ খোলা আছে। পূর্বের এই প্রভাবগুলি ক্রমে ক্রমে কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে কারণ পরিচয় নির্মানের ক্ষেত্রে বিকল্প পথগুলি বর্তমানে অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে বিকল্পগুলি অতীতে কম গৃহীত হত, তাছাড়াও অতীতের পরিচয়ের এই বিকল্প পদ্ধতি বা রাস্তাগুলি বেশীর ভাগই বর্তমানে অস্বীকৃত এবং কম জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। পরিবর্তনশীল সামাজিক সাংস্কৃতি পরিস্থিতি ব্যক্তিদের বাধ্য করছে তার নিজ নিজ আশা-আকাক্ষার উপর ভিত্তি করে অনন্য পরিচিতি নির্মান করতে। অতীতের তুলনায় বর্তমানে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবগুলি পরিচিতি গঠনে ভিন্ন ভূমিকা

পালন করছে। যাইহোক এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবগুলি এখনো ভিন্ন পথে পরিচিতি গঠনে ভূমিকা পালন করে।

এই অধ্যায়ে আমি পরিচিতি কাকে বলে এবং তার শ্রেণিবিভাগ নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। আর এটা করতে গিয়ে প্রথমেই আমি সমাজ সম্বন্ধে বিভিন্ন সমাজ দার্শনিকরা কি বলেছেন তা আলোচনা করেছি এবং সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক কি তাও আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

জগতে প্রত্যেকটি ব্যক্তি ও বস্তুর নিজস্ব কোন না কোন পরিচিতি (Identity) বর্তমান। পরিচিতি নামক শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। অর্থাৎ পরিচিতি শব্দটি যেমন, মানবজাতির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে, তেমনি আবার অ-মানবজাতির ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু আমি মূলত মানবজাতির পরিচিতি নিয়েই আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। শুধু তাই নয়, এই মানবজাতিরও বিভিন্ন ধরনের পরিচিতি বর্তমান। তাই আমি এখানে সমাজস্থ ব্যক্তির পরিচিতি সমাজ দর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনের দৃষ্টি থেকেই আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। তবে এই আলোচনা প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ যেমন অ্যারিস্টটল, লক, ডেভিড হিউম থেকে শুরু করে বিভিন্ন দার্শনিক এই ব্যক্তিগত পরিচিতি (Personal Identity) সম্পর্কে তাদের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরারও চেষ্টা করেছি উক্ত অধ্যায়ে।

এরপর ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান, সামাজিক ভূমিকা অনুসারে পরিচিতিকে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন, ব্যক্তিগত পরিচিতি, জাতিগত পরিচিতি, লিঙ্গগত পরিচিতি, গোষ্ঠীগত পরিচিতি, ধর্মীয় পরিচিতি, ভাষাগত পরিচিতি, সাংস্কৃতিক পরিচিতি প্রভৃতি। ঠিক একই রকম আর এক প্রকার পরিচিতি হল পেশাগত পরিচিতি। কাজেই পরের অধ্যায়ে ‘পেশাগত পরিচিতি ও তার গঠন’ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পেশাগত পরিচিতি এবং তার গঠন

২.১ পেশা কাকে বলে?

সমাজবদ্ধ মানুষ জীবনে পারস্পারিক সাহায্য ও সহযোগিতার মধ্য দিয়ে সুখী ও সমৃদ্ধশালী জীবন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। কিন্তু মানুষের জীবনে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা সেই সুখ ও শান্তিকামী পরিবেশকে বিঘ্নিত করে। যেমন- প্রাকৃতিক বিপর্যয়, শিল্পোত্তর সমস্যা, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং বিশেষ করে বিশ্বায়ন প্রভৃতি মানুষের বিভিন্ন জটিল সমস্যাকে আরো জটিলতর করে তোলে। জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক এবং দৈহিক ও মানসিক সমস্যাগুলি যখন চরম আকার ধারণ করে, তখন মানুষের ব্যক্তিগত দানশীলতা, মানবপ্রেম, ধর্মীয় অনুশাসন ইত্যাদির মাধ্যমে যে সহযোগিতা গড়ে ওঠার কথা তা সফল করতে ব্যর্থ হয়। এর ফলে যোগ হয় এক নতুন মাত্রার সহযোগিতার অভাব ও নতুন কর্ম পদ্ধতির, যার সাহায্যে উদ্ভূত হয় বর্তমানের আধুনিক পেশাদার সমাজকর্মের। এই পেশাদার সমাজকর্মের জন্মভূমি ইংল্যান্ডে হলেও এর পরিপূর্ণতা পায় আমেরিকায়, আসলে ঊনবিংশ শতাব্দীর মানবতাবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়েই এই পেশার উদ্ভব হয়। সমগ্র পৃথিবীতে প্রত্যেকটি মানুষই কোন না কোন পেশার মধ্য দিয়েই জীবিকা অর্জন করে থাকে। তাই আমরা প্রথমেই জেনে নেব এই পেশা কাকে বলে অর্থাৎ পেশার সংজ্ঞা কি? 'পেশা' শব্দটি এসেছে ফারসি ভাষা থেকে,[65] যার অভিধানগত অর্থ হল 'বৃত্তি'। এই 'বৃত্তি' শব্দটির ইংরেজি অর্থ অকুপেশন (Occupation)। অনেকের মতে বৃত্তি বা Occupation বলতে বোঝায় জীবিকা বা জীবনধারণের উপায়। কিন্তু এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে পেশা বলতে বিশেষ এক ধরনের বৃত্তিকে বোঝায়। যার ইংরেজি প্রতিশব্দ প্রফেশন (Profession)। 'Occupation' আর 'Profession' শব্দ দুটি প্রচলিত অর্থে সমার্থক হলেও শব্দ দুটির

---

[65] শহীদুল্লাহ, মোঃ, 'সমাজকর্ম পরিচিতি' গ্রন্থ কুটির, ঢাকা, ২০১১, পৃ-২৩৭.

অন্তর্নিহিত অর্থ এক নয়। তবে সাধারণভাবে বৃত্তি বলতে আমরা যেকোন কাজকেই বুঝে থাকি। কিন্তু সব জীবিকা বা জীবনধারণের উপায়কে পেশা বলা যায় না। কারণ সমস্ত ধরনের বৃত্তির জন্য উচ্চতর তাত্ত্বিক জ্ঞান, ব্যবহারিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দরকার হয় না। যেমন- দিনমজুর, টোটো চালক, রিক্সা চালক, ঘরের কাজ প্রভৃতি হল বৃত্তির উদাহরণ। বৃত্তির ক্ষেত্রে কোন একজন ব্যক্তি একটি বৃত্তি ছেড়ে খুব সহজেই অন্য বৃত্তিতে যোগদান করতে পারে। যেমন- একজন ভিক্ষুক সে তার ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে টোটো চালাতে পারে। কিন্তু পেশা হল- জীবিকা অর্জনের জন্য বহুদিন ধরে সিলেবাস এর আওতায় থাকা তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, সেই জ্ঞানকে যখন অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে তথা জীবন ধারণের উপায় হিসাবে প্রয়োগ করা যায়, তখন তাকে পেশা বলে বিবেচিত করা হয়ে থাকে। সেই কারণে কোন বৃত্তিকে পেশা বলতে গেলে তার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। বিশেষকরে পেশার ক্ষেত্রে (Profession) অন্ততঃ দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক। যেমন- ক) পেশাগত কাজ প্রযুক্তি সম্পন্ন। ধরাযাক, একজন ডাক্তার তার ডাক্তারি পেশার জন্য চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করে ডাক্তার হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন; এবং খ) পেশাদার কর্মীদের কতকগুলি পেশাগত নীতি ও মূল্যবোধ মেনে চলা।[66] উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ধরা যাক, পেশাজীবীদের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু ব্যবহারিক নীতি মেনে চলা আবশ্যক, যা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত হয়। যেমন- শিল্পীদের নীতি হল দেশীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা। কারণ এই সব নীতি পেশাজীবীদের জন্য বিশেষ নীতিমালা হিসাবে কাজ করে। আবার একজন শিক্ষক তার পেশাগত মূল্যবোধের কারণেই জাতিধর্ম নির্বিশেষে যেকোন ছাত্রছাত্রীকে জ্ঞান প্রদান করেন।

এখন দেখা যাক বিভিন্ন পেশাগত পরিচিতি বলতে কি বোঝায়- হিপোক্রেটস (Hippocrates) এর সময় থেকে চিকিৎসক এবং তা অন্যান্য পেশার লোকেরা পেশাগত পরিচিতি অর্জন করেছিল এবং তা প্রকাশ করেছিল।

---

[66] Reynolds, George, *Ethics in Information Technology*, United States, Cengage Learning, 2018, p-56.

> ("Physicians and those in other occupations have acquired and demonstrated professional identities since at least the time of Hippocrates.")[67]

এভাবে পরিচিতি গঠন বা পরিচিতি গঠন করা একটা ধারণা মাত্র, নতুন কিছু নয়। যেমন- চিকিৎসাবিদ্যায় পেশাগত পরিচিতি নির্মাণের ক্ষেত্রে সমাজবিদ্যায় সর্বপ্রথম উক্ত বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়। এপ্রসঙ্গে মার্টন (Merton), 1957 সালে বলেন যে, চিকিৎসাবিদ্যার কাজ হল একজন শিক্ষানবিশকে চিকিৎসার ফলপ্রসু পেশাগত করে তোলা সহ, তাকে সবচেয়ে সহজলভ্য জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদান করা এবং তাকে এমন একটা পেশাগত পরিচিতির রূপ দেওয়া, যার ফলে সে নিজেকে একজন চিকিৎসক রূপে ভাবতে পারে।

> {Merton, in 1957 stated that the task of medical education is to "shape the novice into the effective practitioner of medicine, to give him the best available knowledge and skills, and to provide him with a professional identity so that *he comes to think, act, and feel like a physician*" (italics ours).}[68]

যে ধারণা পরবর্তীকালের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল। তবে মনে রাখতে হবে কেবল বর্তমানেই এই ধরনের পরিচয়ের প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে, এই পেশাগত পরিচিতি নামক বিষয়টির উন্নতিকে উন্নয়নমূলক মনস্তত্ত্বের আলোকে সাহিত্যের সঙ্গে সংযুক্ত করার চেষ্টা হয়েছে এবং সেই সমস্ত কারণগুলিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা হয়েছে, যেগুলি চিকিৎসকদের পেশাগত পরিচিতির উন্নতিকে তরান্বিত বা প্রভাবিত করে।

---

[67] Cruess, R. L, Cruess, S. R, Boudreau, J. D, Snell, L, and Steinert, Y, *Reframing Medical Education to Support Professional Identity Formation*, Acad Med. 2014, 1446-51. doi: 10.1097/ACM.0000000000000427. PMID: 25054423, P-1447.

[68] Merton, R. K, Reader, L. G, Kendall, P. L (eds.), *The Student Physician: Introductory Studies in the Sociology of Medical Education*, Cambridge, Mass: Harvard University Press; 1957, P-5.

বর্তমান সময়ে পরিচিতি নির্মানের বিষয়টির উপর নতুন কোন শিক্ষা সংক্রান্ত উপাদানের আভাস পাওয়া যায়না ঠিকই, তবে পেশাগত কাজ শেখা ও পেশাগত ব্যবহারের গুরুত্ব দেবার প্রচেষ্টাকে অস্বীকার করেনা। এটা সেই পন্থাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে যার দ্বারা সাধারণ নাগরিক দক্ষ চিকিৎসকে পরিণত হয় বা নিজেদেরকে পরিণত করে। তখন তারা তাদের নিজের পেশার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পরিচিতির মাধ্যমে নিজেদেরকে প্রকাশ করতে চায়। এক্ষেত্রে একটি বিষয় মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, পেশাগত পরিচিতির উন্নতি ব্যক্তিগত পরিচিতি নির্মাণের পরিসরেই ঘটে থাকে। এই প্রক্রিয়া মানুষের জন্ম থেকেই শুরু হয় এবং একটা জটিল পরিচিতি সমূহের সংমিশ্রনের মধ্যে দিয়ে তার ফল পাওয়া যায়। অর্থাৎ লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ প্রভৃতির দ্বারা তা গঠিত হয়।

২.২ পেশাগত পরিচিতির গঠনঃ

পেশাগত পরিচিতির (Professional Identity) গঠন আসলে একটি প্রক্রিয়া। পেশা এবং পেশাগত পরিচিতি অবশ্যই আলাদা দুটি বিষয়। তবে পেশাগত পরিচিতি গঠিত হওয়ার যে প্রক্রিয়া তা বোঝার আগে আমাদের পেশা নামক বিষয়টির ধারণা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

পেশা বা পেশাগত পরিচিতির বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে, যাদের বেশীরভাগই জোর দেয় কোন পেশার ক্ষেত্রে আকাঙ্খিত ব্যবহার বা বৈশিষ্ট্য প্রকাশের উপর। এ বিষয়ে লন্ডন (London) এর দ্য রয়েল কলেজ (The Royal College) এর ডাক্তাররা পেশাবাদের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হল- “এক গুচ্ছ মূল্যবোধ, আচরণ এবং সম্পর্কের এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি যা একজন মানুষের ডাক্তারদের প্রতি আস্থা নিশ্চিত করে।” অর্থাৎ

> “a set of values, behaviors and relationships that underpins the trust the public has in doctors.”[69]

অপরদিকে ‘The Oxford English Dictionary’ তে পরিচিতির সংজ্ঞায় বলা হয়, “একগুচ্ছ বৈশিষ্ট্যাবলী অথবা একটা বর্ণনা যা একজন ব্যক্তি বা বিষয়কে অন্যান্যদের থেকে পৃথক করে।” অর্থাৎ

> “Identity is a set of characteristics or a description that distinguishes a person or thing from others.”[70]

নির্দিষ্টভাবে ডাক্তারদের সম্পর্কে একটি সংজ্ঞা দেওয়ার প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে আমরা এরকম একটি প্রস্তাব দিতে পারি যে, একজন চিকিৎসকের পরিচিতি হল তার সত্তার প্রতিনীধিকরণ, যা অনেক সময়ধরে বিভিন্ন স্তরে অর্জিত। পেশার নীতিগুলি আত্মীকরণ করতে হয়, যা একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত ভাবনা-চিন্তা, কাজ-কর্ম এবং একজন চিকিৎসকের অনুভূতির মধ্যে উদ্ভূত হয়ে থাকে।

জার্ভিস ও সেলিংগার (Jarvis ও Selinger) প্রমূখ পরিচিতির গঠন বা নির্মাণ সম্বন্ধে একটি সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এইভাবে “একটি অভিযোজিত

---

[69] Royal College of Physicians of London, *Doctors in Society: Medical Professionalism in a Changing World*, London, UK, 2005. / Cruess, R. L, Cruess S. R, Boudreau, J. D, Snell, L, Steinert. Y, *Reframing medical education to support professional identity formation.* Acad Med., 2014, pp-1446-51. doi: 10.1097/ACM.0000000000000427. PMID: 25054423, p-1447.

[70] *Oxford English Dictionary*, (2nd ed), Oxford, UK, Clarendon Press; 1989./ Cruess, R. L, Cruess S. R, Boudreau, J. D, Snell, L, Steinert. Y, *Reframing medical education to support professional identity formation.* Acad Med., 2014, pp-1446-51. doi: 10.1097/ACM.0000000000000427. PMID: 25054423, p-1447.

উন্নয়নমূলক প্রক্রিয়া যা একইসাথে দুটি স্তরে সংগঠিত হয়- ১. ব্যক্তির মনে, অর্থাৎ এটি কোন ব্যক্তির মানসিক বিকাশের সাথে জড়িত। ২. সামগ্রিক স্তরে, অর্থাৎ যা কোনো ব্যক্তির সামাজিক দিক থেকে মানসিক পর্যায়ে উন্নীত করে।" অর্থাৎ

> "Jarvis-Selinger have provided a clear definition of the process of identity formation: "an adaptive developmental process that happens simultaneously at two levels (1) at the level of the individual, which involves a the psychological development of the person and (2) at the collective level, which involves the socialization of the person into appropriate roles and forms of participation in the community's work."[71]

পেশাগত পরিচিতির সংগঠন এবং উন্নয়ন আসলে ব্যক্তিগত পরিচিতি গঠনের মধ্যেই অন্তর্নিহিত। এই ব্যক্তি পরিচয় নির্মাণের বিষয়টি মানুষের জন্মলগ্ন থেকেই শুরু হয়ে যায় এবং লিঙ্গ, জাতি, বর্ণ, ধর্ম, শ্রেনী ইত্যাদি বিভিন্ন পরিচিতির সংমিশ্রণে ঘটে থাকে। কোন ব্যক্তি নিজেকে কিভাবে চিহ্নিত করবে বা অন্যদের কাছে সে নিজেকে কিভাবে চিহ্নিত হবে তা এই পরিচিতিগুলির সংমিশ্রণেই সম্ভব হয়।

জঁ পিয়াজে (Jean Piaget) এবং বারবেল ইনহেল্ডার (Barbel Inhelder) বলেছেন যে, জ্ঞানীয় বিকাশ প্রাথমিকভাবে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সময় পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ঘটতে থাকে।[72] এরিকসন (Erikson) এবং পরবর্তীতে কেগান (Kegan) ধারণাটিকে

---

[71] Jarvis-Selinger, S, Pratt, D. D, and Regehr, G, *Competency is not Enough: Integrating Identity Formation into the Medical Education Discourse*, Acad Med., 2012, p-1185–1191.

[72] Piaget, J, Inhelde, B, *The Psychology of the Child*, New York, Basic Books, 1969. / doi: 10.1097/ACM.0000000000000427. PMID: 25054423, p-1447.

পরিচয় গঠনের জন্য প্রসারিত করেন এবং একটি ধারাবাহিক স্তরের প্রস্তাব করেন, যার মধ্য দিয়ে মানুষ জন্ম থেকে বার্ধক্যের মধ্যে দিয়ে যায়।[73]

এখন এই পেশাগত পরিচিতি নির্মাণের বিষয়টি কয়েকটি পেশার ক্ষেত্রে দেখা যাক। চিকিৎসাবিদ্যায় পেশাগত পরিচিতি শেখানো চিকিৎসাবিদ্যার একটি মৌলিক উপাদান। ছাত্ররা যাতে পেশাদারিত্বের প্রকৃতি এবং মূল্যবোধ বুঝতে পারে এবং চিকিৎসায় পেশার মানোন্নয়নে আগ্রহী হতে পারে, তা নিশ্চিত করাই হলো এর উদ্দেশ্য। পেশাগত শিক্ষার লক্ষ্য হল পেশাগত পরিচয়ের অনুশীলনকারীদের বিকাশ নিশ্চিত করা। চিকিৎসা শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হল পেশাদার পরিচয়ের বিকাশ এবং এই উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য শিক্ষামূলক কৌশলগুলি তৈরি করা। ‘The Carriage Foundation’ এর রিপোর্ট অনুযায়ী বলা যায় যে, পরিচিতি নির্মাণ চিকিৎসা শিক্ষার একটি স্তম্ভ (Pillar)।

> (“The Carnegie Foundation report recommended that identity formation constitute a ‘pillar’ of medical education.”)[74]

জার্ভিস-সেলিংগার এবং তাঁর সহকর্মীরা জানিয়েছেন, “চিকিৎসাবিদ্যার সংগঠন এমন হওয়া উচিৎ নয় যে, তা শুধু ছাত্রদেরই দক্ষতার সাথে কাজ করা নিশ্চিত করবে, বরং এটিও দেখা উচিৎ যে কিভাবে চিকিৎসকদের পেশাগত পরিচিতির বিকাশ ঘটবে।”

> (“Jarvis- Selinger and her colleagues suggested that medical education should be designed not only to ensure that medical students and residents perform competently but to also

---

[73] Kegan, R, *The Evolving Self: Problems and Process in Human Development*, Cambridge, Mass: Harvard University Press; 1982.

doi: 10.1097/ACM.0000000000000427. PMID: 25054423, PP-1447-48.

[74] Cooke, M, Irby, D. M, and O, Brien. C, *Educating Physicians: A Call for Reform of Medical School and Residency*, San Francisco, Calif; Jossey-Bass, 2010. doi: 10.1097/ACM.0000000000000427. PMID: 25054423, p-1446.

> consider how professional identities as physicians are evolving.")[75]

২.৩ পেশাগত পরিচিতি নির্মাণের ইতিহাসঃ

চিকিৎসা এবং অন্যান্য বৃত্তিতে পেশাগত পরিচিতি অর্জন এবং প্রদর্শনের বিষয়টি হিপোক্রেটিস এর সময় থেকেই চলে আসছে। সুতরাং চিকিৎসাবিদ্যায় এই পরিচিতি নির্মাণের ধারণাটি নতুন নয়। মার্টন (Merton),সালে বলেন 1957 যে, "চিকিৎসাবিদ্যার কাজ হল একজন শিক্ষানবিশকে চিকিৎসাবিদ্যায় একজন কার্যোপযোগী অনুশীলনকারীতে পরিণত করা, তাকে সর্বোত্তম জ্ঞান এবং দক্ষতা প্রদান করা এবং তাকে সেই পেশাগত পরিচিতি প্রদান করা যাতে সে একজন চিকিৎসকের মতো ভাবতে পারে, আচরণ করতে পারে এবং অনুভব করতে পারে।"

> (Merton, in 1957 stated that the task of medical education is to "shape the novice into the effective practitioner of medicine, to give him the best available knowledge and skills, and to provide him with a professional identity so that he comes to think, act, and feel like a physician.")[76]

তবে এক্ষেত্রে পরিচিতি বিকাশের সকল নীতিগুলি বোঝা প্রয়োজন। কিন্তু মনে রাখতে হবে বিকাশমূলক স্তরের সকল বিবরণ অপরিহার্য নয়। তবে তিনটি বিষয় অ-পেশাগত

---

[75] Cruess, R. L, Cruess S. R, Boudreau, J. D, Snell, L, and Steinert. Y, *Reframing medical education to support professional identity formation,* Acad Med., 2014, pp-1446-51. doi: 10.1097/ACM.0000000000000427. PMID: 25054423, p-1447.

[76] Merton, R. K, Reader, L. G, and Kendall, P. L (eds.), *The Student Physician: Introductory Studies in the Sociology of Medical Education*, Cambridge, Mass: Harvard University Press; 1957, P-5.

পরিচিতি গঠনের জন্যে প্রয়োজন। প্রথমত, যখন শিক্ষানবিশ চিকিৎসকরা প্রশিক্ষণের সময়ে বিভিন্ন পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্যে দিয়ে যায় (ধরা যাক, মেডিকেল স্কুলে প্রবেশ, আবাসিক প্রশিক্ষণে প্রবেশ এবং অনুশীলনে প্রবেশ), তখন তাদের ব্যক্তিগত পরিচিতি যা তারা দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রহ করে এসেছে। ব্যক্তিগত পরিচিতির ওপর ভিত্তি করেই সবসময় পেশাগত পরিচিতি তৈরী হয়। আর এই প্রাথমিক পরিচয়গুলির উল্লেখযোগ্য দিকগুলি ভবিষ্যতেও অনুশীলনকারীদের মধ্যে উপস্থিত থাকে।

> ("However, Knowledge of three aspects is helpful. First, as physicians in training approach transitional phases of their life (entry into medical school, entry into residency training, and entry into practice), they do so with the personal identities they have developed during their life.")[77]

দ্বিতীয়ত, শারীরিক ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও মেডিকেল ছাত্র-ছাত্রী, তাদের আবাসিক বন্ধু, পরিবার, লিঙ্গ এবং অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণগুলি ব্যক্তির পরিচয়ের চলমান বিকাশের উপর প্রভাব ফেলে। এক্ষেত্রে পেশা যদি অন্যকিছুও হয়, তাহলেও এই প্রভাবগুলি থেকেই যায়।[78] বিবো (Bebeau), জার্ভিস-সেলিঙ্গার এবং তাঁর সহকর্মীরা কেগানের প্রস্তাবিত "গঠনমূলক উন্নয়ন তত্ত্ব"-এর মধ্যে দিয়ে চিকিৎসাবিদ্যায় পেশাগত পরিচিতি গঠনের অবস্থা তৈরী হয় বলে মনে করেন।[79] এই প্রসঙ্গে ক্রুয়েস

---

[77] Monrouxe, L. V, *Identity, Identification and Medical Education: Why Should We Care*? Med Educ., 2010, pp- 40–49.

[78] Monrouxe, L. V, Rees, C. E, and Hu, W, *Differences in Medical Students' Explicit Discourses of Professionalism: Acting, Representing, Becoming,* Med Educ., 2011, pp-585–602.

[79] Kegan, R, *The Evolving Self: Problems and Process in Human Development*, Cambridge, Mass: Harvard University Press; 1982. / Cruess, R. L, Cruess S. R, Boudreau, J. D, Snell, L, and Steinert, Y, *Reframing medical education to support professional identity formation,* Acad Med., 2014, pp-1446-51.

(Cruess) বলেন একজন চিকিৎসকের একটি সম্পূর্ণ সংহত নৈতিক সত্তা থাকা উচিত। যার ব্যক্তিগত এবং পেশাগত মূল্য সম্পূর্ণরূপে একত্রিত এবং ধারাবাহিকভাবে যা প্রয়োগযোগ্য।

> (“They point out that one would not expect a fully developed professional identity to be present until Kegan’s last stage, which occupies the early to mid-30s. At that point a physician should possess a fully integrated moral self (one whose personal and professional values are fully integrated and consistently applied).”[80]

পেশাগত বিষয়টি প্রত্যেকের কাছে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু তাকে সংজ্ঞায়িত করা বেশ কঠিন কাজ। পেশানামক বিষয়টির উপর একটি বিস্তীর্ণ এবং ক্রমবর্ধমান সাহিত্য রয়েছে, বিশেষ করে চিকিৎসাশাস্ত্রে।[81] চিকিৎসাবিদ্যায় পেশাগত বর্ণনা সাধারণত পরীক্ষিত ও ব্যবহারিক সক্ষমতার উপর জোর দেওয়া হয়। তারা মূল নৈতিক মূল্যবোধের উপর জোর দেয় তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগের ক্ষেত্রেও।

> (“Statements of medical professionalism typically emphasize a series of testable, practical competencies. In addition, they propose a core of ethical values to which members, in theory, subscribe.”) [82]

---

[80] Cruess, R. L, Cruess, S. R, *Teaching Medicine as a Profession in the Service of Healing*, Acad Med, 1997, Pp-941–952.

[81] Sullivan, W. M, *Medicine Under Threat: Professionalism and Professional Identity*, CMAJ 2000, pp-673-5.

82 Barry, E. Koehler,(Ed.), *Is Medicine Still a Profession*?, CMAJ, 2006,/ DOI:https://doi.org/10.1503/cmaj.060248

কিন্তু সমস্যা হল নৈতিক, সামাজিক মূল্যবোধের চেয়ে প্রযুক্তিগত দক্ষতার দ্বারা বিষয়টিকে সংজ্ঞায়িত করা, শেখানো এবং পরীক্ষা করা অনেক সহজ। এমনকি যেখানে আদর্শ স্পষ্ট সেখানে পরার্থপরতা, কল্যাণ, করুনা ইত্যাদি অনুশীলনের ক্ষেত্রে এর অর্থ কী হতে পারে, তা সাধারণত অস্পষ্ট থাকে।

তত্ত্বগত দিক দিয়ে, নৈতিক মূল্যবোধের অন্তর্ভুক্তি অনুশীলনের কর্মক্ষমতা এবং ব্যক্তিগত পরিচিতির অনুভূতি উভয়ই সরবরাহ করে, যা একেবারে পেশাগতভাবে সক্ষম এবং সামাজিকভাবে ব্যক্তিকে সংযুক্ত করে। চিকিৎসাবিদ্যা পাঠে প্রাথমিকভাবে দেখা হয় এই নৈতিক অনুশাসনগুলি অনুশীলনের বিষয়কে কীভাবে উৎসাহী বা নিরুৎসাহী করে। দ্বিতীয়ত, এই মূল্যবোধগুলি একজন চিকিৎসককে সমাজে বিশেষ পেশাগত পরিচিতি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে কিনা, সেই বিষয়টিও দেখা হয়।[83] যেকোনো সংগঠনই নিরন্তর চাহিদা ও অভিযোজনের সমন্বয় তৈরী হয়। কোন ভূমিকার আচরণ, নির্দিষ্ট সংগঠন বা সংস্থার চাহিদা নিজস্ব প্রয়োজন থেকে তৈরী হয়। এই তত্ত্ব অনুসরণ করে গেটজেলস (Getzels) এবং গুবা (Guba) ‘Role Behavior’ কে Ideographic এবং Nomothetic Dimensions বলেছেন। আমরা সমাজ ব্যবস্থাকে দুটি প্রধান ঘটনার সাথে বিবেচনা করি। যেগুলির একটি হল ধারণাগত দিক থেকে স্বাধীন এবং অন্যটি হল অলৌলিকভাবে মিথস্ক্রিয়ার সাথে যুক্ত। প্রথমতঃ একটি প্রতিষ্ঠানের নিদিষ্ট ভূমিকা এবং প্রত্যাশা থাকে। যার পরিপ্রেক্ষিতে সেই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যপূরণ হয়। দ্বিতীয়তঃ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অবস্থিত কিছু ব্যক্তি তাদের ব্যক্তিত্ব এবং প্রয়োজনের মিথস্ক্রিয়ার ভিত্তিতে যে বিষয়টি উঠে আসে, তাকে সামাজিক আচরণ রূপে আখ্যায়িত করা হয়। প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা, প্রত্যাশা ইত্যাদি একত্রিত ভাবে গঠন করে Nomothetic বা আদর্শিক মাত্রা। একইভাবে একজন ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্ব, সেই সঙ্গে তার প্রয়োজন স্বভাব একত্রিত করে তৈরী হয় Ideographic বা ব্যক্তিগত মাত্রা তৈরী করে।

---

[83] https://www.jstor.org/stable/25699679. P-371.

> (“institution, role, and expectation, which together constitute the nomothetic, or normative, dimension of activity in a social system; and individual, personality, and need-disposition, which together constitute the idiographic, or personal, dimension of activity in a social system”)[84]

তবে এমন ধরনের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে নিম্নপদস্থ ব্যক্তিদের ওপর যেমন কর্তৃত্ব করার মানসিকতা থাকে, তেমনই উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের প্রতি আজ্ঞাবহতাও থাকে। অর্থাৎ এর থেকে আমরা আসলে তার নিজের পেশাগত পরিচিতির প্রভাবে নিজেকে পরিস্থিতি অনুযায়ী নমনীয় করার প্রবণতা দেখতে পাই। একেই ওয়ার্ড-ওয়েল (Wardwell) প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যের সাথে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার কথা বলেছেন। (“coming to terms with organizational values”)।[85]

আবার ব্রাউনি (Browne) এর মতে পরিচিতির ধারণা এইরূপ, “যেভাবে কোন মানুষ নিজেকে দেখে, সংজ্ঞায়িত করে এবং যেভাবে অন্যান্য মানুষরা তাকে দেখে ও সংজ্ঞায়িত করে।

> (“Professional identity is regarded by Browne (2011) as relating to how individuals see and define themselves and how other people see and define them.”)[86]

---

[84] Getzels, J. W, and Guba, E. G, *Social Behaviour and the Administrative Process*, School Rev., vol. 65, I957, p-424.

[85] Wardwell, W. I, *Reduction of Strain in Marginal Social Role*, Amer. T. Social., vol. 6I, I955, pp-I6–25.

[86] https://www.earlyyearseducator.co.uk/features/article/a-professional-identity-for-working-with-children#:~:text=Professional%20identity%20includes%20values%2C%20feelings,they%20are%20perceived%20by%20colleagues. Date-20.02.2022

মূল্যবোধ, অনুভূতি, বোঝাপড়ার মনোভাব, সেইসাথে প্রেক্ষাপট, জাতিসত্তা এবং সংস্কৃতি সবই পেশাগত পরিচতির সাথে যুক্ত। সেই পেশায় তাদের পদমর্যাদা, তাদের ভূমিকা, দায়িত্ব, অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্ক এবং তার সহকর্মীদের প্রতি উপলব্ধি এই সমস্ত বিষয়ও পেশাগত পরিচিতির সাথে জড়িত। এ বিষয়ে 'The Statutory Framework for the Early Years Foundation Stage (2017)', জানায় যে, একজন অনুশীলনকারির তার ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিৎ, কারণ তার যথাযথ অনুশীলন, পেশাগত উন্নতির জন্যে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করা উচিৎ, যাতে করে তারা উৎকর্ষ শিক্ষা এবং উন্নত অভিজ্ঞতা শিশুদের দিতে পারে, যা তাদের ক্রমাগত উন্নতিলাভ করতে সাহায্য করে ।

> ("The Statutory Framework for the Early Years Foundation Stage (2017) states that practitioners should have a clear understanding of their roles and responsibilities undertake appropriate training and professional development opportunities to ensure they offer quality learning and development experiences for children that continually improves.")[87]

নেওয়ারি (Neary,2014) মনে করেন, পেশাগত পরিচিতি হল এমন একটি ধারণা যা বর্ণনা করে যে, কিভাবে আমরা আমাদের পেশাগত প্রেক্ষাপটে নিজেদেরকে উপলব্ধি করি এবং কিভাবে আমরা অন্যদের সাথে এ বিষয়ে সংযোগ করি। এইভাবে পেশাগত উৎকর্ষে জড়িত থাকার ফলে আমরা আমাদের পেশার ওপর একধরনের দখলদারি আয়ত্ত করি। এটিই পেশাদারি হয়ে ওঠার সংজ্ঞা।

---

[87] https://www.earlyyearseducator.co.uk/features/article/a-professional-identity-for-working-with-children#:~:text=Professional%20identity%20includes%20values%2C%20feelings,they%20are%20perceived%20by%20colleagues. Date-20.02.2022

> {“Neary (2014) considers that Professional identity is the concept which describes how we perceive ourselves within our occupational context and how we communicate this to others.... equally important in that through investing in ourselves by engaging in professional development, we take ownership of our professionalism.”}[88]

আবার 1977 সালে লারসন (Larson) বলেন যে, পেশাগত পরিচিতি বিভক্ত করা হয় দক্ষতার উপর ভিত্তি করে। পেশাগত পরিচয় বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত থাকা কর্মীদের কাছে সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। ধরা যাক, কোন অধ্যাপক বা অধ্যাপিকা তার পরিচয় ‘Professor’ বা ‘Associate Professor’ বা ‘Assistant Professor’ কিংবা কলেজ শিক্ষক হিসাবে চাকরীর শিরোনাম ব্যবহার করে। আবার যারা চাকরির শিরোনামের মাধ্যমে নিজেদেরকে সংজ্ঞায়িত করে তারা প্রতিনিয়ত অনুভব করে যে, তাদের চাকরীর শিরোনাম তাদের নিজেদের পরিচয়ের তুলনায় বেশি শক্তিশালী। বর্তমান সময় আমরা রাস্তাঘাটে চলতে গেলে দেখতে পাই বিভিন্ন যানবাহনের সামনে কেউ- ‘CISF’, ‘BSF’, ‘ARMY’, ‘POLICE’, ‘PWD’ ইত্যাদি শব্দগুলি ব্যবহার করে থাকে। কারণ তাদের ব্যক্তিগত পরিচয়ের থেকে পেশাগত পরিচয়কেই বেশী গুরুত্ব দেয় বলে আমাদের মনে হয়। ব্যক্তিগত, পেশাগত কিংবা সাংস্কৃতিক পরিচয়ের উপর বিগত কয়েক বছর ধরে গবেষণা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ এটি একটি নতুন পরিচয়ের মাধ্যম হিসাবে সমাজে অবতীর্ণ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানিদের

---

[88] Neary, S, *Professional Identity: What I Call Myself Defines Who I am’,* in Career Matters 2, 2014, pp-14-15.

https://www.earlyyearseducator.co.uk/features/article/a-professional-identity-for-working-with-children#:~:text=Professional%20identity%20includes%20values%2C%20feelings,they%20are%20perceived%20by%20colleagues. Date-20.02.2022

মতে আধুনিক যুগের শেষের দিকে পরিচয়ের গতিবিধির স্থিতিশীলতার উপর প্রশ্নচিহ্ন উঠেছে।

এবিষয়ে কাস্টেল (Castells) বলেন যে, ব্যক্তি তার সাংস্কৃতিক বা সাংগঠনিক পরিচয় ধরে রাখার চেষ্টা করে, যা তার পছন্দসই স্থিতিশীল নিরাপত্তা প্রদান করে। এই কারণে পরিচয় কখনোই একটি স্থির সত্তা নয়। বরং বলা যায়, তা কমল, তরল, নমনীয় ও অনিশ্চিত কিছু। যা ব্যক্তি দ্বারা ক্রমাগত সংশোধন ও পুনঃনির্ধারিত করা হয়। ধরা যাক, একটি শিশু জন্মগ্রহণের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকে। কখনো তিনি পিতা বা মাতা, কখনো তিনি সেনাবাহিনীর প্রধান, কখনো তিনি সংগঠনের কর্মকর্তা হিসাবে নিজেকে সমাজের সামনে তুলে ধরেন। [89]

গিডেন্স (Giddens) এর মতে, মানুষের আত্মপরিচয় একটি স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য নয়। এটি তার জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির দ্বারা প্রতিফলনের ফলশ্রুতি। আত্মপরিচয় হল স্থান এবং কাল বিশেষে স্বপরিচয়ের ধারাবাহিকতা। ব্যক্তি একটি নিজস্ব গল্পের মাধ্যমে তাদের স্বতন্ত্র্য পরিচয় তৈরী করে। যা কেবল অতীতকে স্মরণ করায় না বরং নিজেকে এমনভাবে আবিস্কার করে যাতে বিষয়টি সামাজিক ভাবে স্বীকৃতি পেতে পারে। [90]

পেশাগত পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে আমরা এভাবে ভাবতে পারি যে, ব্যক্তিরা কিভাবে নিজেদের দেখে ও সংজ্ঞায়িত করে এবং অন্যলোকেরা কিভাবে তাকে দেখে ও সংজ্ঞায়িত করে। ধরা যাক, বিমল নিজেকে সৎমানুষ হিসাবে দেখে কিন্তু অন্যান্য লোকেরা বিমলকে শিক্ষক হিসাবে চেনেন। অর্থাৎ বিমলের পরিচয়

---

[89] Castells, M, *The power of Identity, the Information Age: Economy, Society and Culture*, vol.-II, London, Blackwell, 1997.

file:///C:/Users/USER/Downloads/Manuel_Castells_and_the_Information_Age.pdf, pp-1-4. Date-12.05.2022

[90] Giddens, A, *Modernity and Self- Identity: Self and Society in the Late Modern Age*, Cambridge, Polity Press, 1991.

শুধুমাত্র সৎ মানুষ বা শুধুমাত্র শিক্ষক হিসাবে নয়, তার পরিচয় সৎ-শিক্ষক হিসাবেও। এখানে তার পরিচয় তার পেশার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে, সে না চাইলেও। পেশাগত পরিচয়ের মধ্যে রয়েছে মূল্যবোধ, অনুভূতি, বোঝা-পড়ার মনোভাব, সেই সাথে পটভূমি, জাতিসত্তা এবং সংস্কৃতি। এটি তাদের পেশার মধ্যে মানুষের অবস্থা, তাদের ভূমিকা, দায়িত্ব, অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্ক এবং সহকর্মীদের সঙ্গে তারা কিভাবে সম্পর্কগুলি উপলব্ধি করে তার সাথে সম্পর্কিত।[91]

প্রথমদিকে তারা তাদের পেশাকে কিভাবে পেশাগত শিক্ষায় বিবেচনা করবেন তা কিছু নিয়মনীতির উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। কর্মীদের জন্য ক্রমাগত শিখনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এতে করে তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ গ্রহন এবং সহকর্মীদের সাথে সহযোগিতাপূর্ণ হয়ে ওঠার ব্যাপারটি নিশ্চিত করে। কারণ কর্মীদের একে অপরের কাছ থেকে শেখার ধারণাটিকে অনুশীলনের একটি অংশ হিসাবে দেখতে হয়। এ বিষয়ে Wenger, McDermott এবং Snyder (2002), বলেছেন, "একদল মানুষ যাদের আবেগ, উদ্বেগ অভিন্ন, তারা প্রতিনিয়ত নিজেদের মধ্যে তাদের জ্ঞান আদান-প্রদানের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা আরো দৃঢ় করতে পারে।"

> ("Groups of people who share a concern, a set of problems, or a passion about a topic, and who deepen their knowledge and expertise in this area by interacting on an on going basis".)[92]

---

[91] Antonio Bolívar Botía, Jesús Domingo Segovia, Purificación Pérez-García, *Crisis and Reconstruction of Teachers' Professional Identity: The Case of Secondary School Teachers in Spain*, The Open Sports Science Journal, Betham Open, 2014, pp-106-112.

[92] Wenger, E, McDermott, R, and Snyder, W, *Cultivating Communities of Practice, A Guide to Managing Knowledge*, Harvard Business School Press: Boston, Massachusetts, USA, 2002.

https://www.earlyyearseducator.co.uk/features/article/a-professional-identity-for-working-with-

এ বিষয়ে মিলার (Miller) এবং পাউন্ড Pound) দাবি করেন যে, একটি সম্প্রদায় সম্পর্কে ওয়েঙ্গারের ধারণা হল এমন যেখানে সদস্যরা যৌথ কার্যকলাপ ও আলোচনায় যুক্ত হয়ে একে অপরকে সাহায্য করে এবং নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগা-ভাগি করে। আবার আনের (Anner) স্থানান্তরের ধারণাটি শিক্ষক ও শিক্ষানবিশের ধারণার মধ্যে স্পষ্ট, যেখানে শিক্ষানবিশ গুরুর কাছ থেকে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে। কর্মীরা আরও অভিজ্ঞ সহকর্মীদের কাছ থেকে শেখে, যার ফলে জ্ঞান, দক্ষতা এবং বোঝাপড়া একে অপরকে সমৃদ্ধ করে। তারা বুঝতে পারে যে প্রাথমিক বছরগুলিতে পেশাগত উন্নতি, তাদের কথাবার্তার দক্ষতার ওপর, দক্ষতা বিনিময় করার ওপর ও দৈনন্দিন অনুশীলনের উন্নতি একে অপরকে সাহায্য করার ওপর নির্ভর করে।

> {“Miller and Pound (2011) contend that Wenger's concept of a community is one where' members engage in joint activities and discussions, help each other, and share information. The transfer of knowledge is evident in the concept of master/apprentice (Lave and Wenger, 1991), in which the apprentice acquires skills from the master.”}[93]

পেশাগত শিক্ষা উপলব্ধির প্রতিফলন, যা ঘটেছে তা নিরীক্ষণ করার, কী ভাল হয়েছে তা চিহ্নিত করার এবং আরও কীভাবে ভালো করা যেতে পারে তা বোঝার সুযোগ দেয়। ব্রক (Brock) এর মতানুযায়ী প্রতিফলিত অনুশীলন হল, “একজনের

---

children#:~:text=Professional%20identity%20includes%20values%2C%20feelings,they%20are%20perceived%20by%20colleagues. Date-20.02.2022

[93] Miller, L, Pound, L, *Theories and Approaches to Learning in the Early Years*, SAGE Publications, London, 2011.

https://www.earlyyearseducator.co.uk/features/article/a-professional-identity-for-working-with-children#:~:text=Professional%20identity%20includes%20values%2C%20feelings,they%20are%20perceived%20by%20colleagues. Date-20.02.2022

পেশাগত ভূমিকা, এর ব্যবহারিক প্রয়োগ এবং এবিষয় সম্পর্কে একজনের নিজস্ব চিন্তাভাবনাকে প্রতিফলিত করার, মূল্যায়ন করার ক্ষমতা ও নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা করার বিষয়ই প্রাথমিক বছরগুলিতে পেশাদারিত্বের চাবিকাঠি হতে হবে।"

> {"For Brock (2006) reflective practice is: The ability to reflect on and evaluate one's professional role, its practical application and one's own thoughts about it must be the key to professionalism in the early years."}[94]

এছাড়াও এবিষয়ে মিলার এবং পাউন্ডের অভিমত হল, "আপনি কী করেন এবং কেন আপনি এইভাবেই কাজটি করেন" এইসমস্ত প্রশ্ন গুলি এই ধারণার সাথে জড়িত।

> ("It involves questioning what you do and why you do it in the way that you do").[95]

পেশাগত পরিচিতি সহকর্মীদের সাথে সম্পর্কের উপর, পেশাগত শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা ভাগ করে নেওয়ার ইচ্ছা এবং অনুশীলনে অভ্যস্ত জ্ঞান ও দক্ষতা প্রতিফলিত করার ক্ষমতার উপর প্রভাব ফেলে। ইতিবাচক পেশাগত সম্পর্ক, ছোট বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা এবং কিভাবে পেশাদার শিক্ষা বজায় রাখা যায় সে সম্পর্কে একটি ধারণা অনুশীলনকারীদের দ্বারা উন্নত ব্যবস্থা প্রদান করার দিকটি নিশ্চিত করে। পেশাদারিত্বের এই দিকগুলি নিশ্চিত করা গেলে তার ফল হিসাবে এমন একজন অনুশীলনকারীকে পাওয়া যাবে যিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আত্মবিশ্বাসী এবং ছোট বাচ্চাদের শিখনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম।

এইচ আইবেরা (H. Ibarra) এর মতে, পেশাগত পরিচিতি বলতে "গুণ, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, উদ্দেশ্য এবং অভিজ্ঞতার অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল এবং স্থায়ী ভূমিকা

---

[94] Brock, A, *Dimensions in Early Years Professionalism-Attitudes Versus Competences*? Leeds Metropolitan University: Leeds, 2006.

[95] Miller L, Pound, L, *Theories and Approaches to Learning in the Early Years*, SAGE Publications, London, 2011.

হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে, যার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষেরা পেশাগত ভূমিকায় তাদের নিজেদেরকে সংজ্ঞায়িত করে”।

> (Professional identity can be defined as “the relatively stable and enduring constellation of attributes, beliefs, values, motives, and experiences in terms of which people define themselves in a professional role”)[96]

এখন দেখা যাক, এই যে বিভিন্ন ধরনের পেশাগত পরিচিতি অর্থাৎ বিশ্বায়নের ফলে উন্নয়নশীল দেশের নিচুস্তরের একটি শ্রেণীর মানুষের বংশপরম্পরা, ঐতিহ্যবাহি পেশাগত পরিচিতি কিভাবে সঙ্কটের সম্মুখীন হচ্ছে। এই বিষয়টি আমরা এখন একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝার চেষ্টা করব। সাধারণত যেকোন বিষয়ই সঙ্কটের সম্মুখীন হয় তার কিছু প্রতিবন্ধকতার কারণে বা সময়ের সঙ্গে খাপখাওয়াতে না পারলে। এখন যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে, এই পেশাগত পরিচিতির সঙ্কট দুভাবে তৈরী হয়, যেমন- ১) পূর্বের বংশপরম্পরা পেশাকে ধরে রাখার কারণে এবং ২) অপর পক্ষে নয়া-উদারিকরণের ফলে অর্থাৎ বিশ্বায়নের ফলে বংশপরম্পরা পেশাকে টিকিয়ে রাখতে না পারার কারণে।

এই অধ্যায়ে আমি প্রথমেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি পেশা কাকে বলে? আর তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পেশা বা ‘Profession’ শব্দটির উৎপত্তি ও তার অভিধানগত অর্থ আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। এছাড়া বিভিন্ন সমাজ দার্শনিক, রাষ্ট্র দার্শনিক এবং বিভিন্ন গবেষকগণ এই পেশা বা Profession এর যে সমস্ত সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছেন এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদাহরণসহ আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

---

[96] Ibarra, H, *Provisional selves: Experimenting with Image and Identity in Professional Adaptation*, Administrative Science Quarterly, 44(4), Schein, 1978, pp-764-765.

এরপর ‘পেশাগত পরিচিতির সংকট ও বিশ্বায়ন’ নামক অধ্যায়ে কিভাবে এই পেশাগত পরিচিতির সংকট তৈরি হতে পারে এবং তার কারণ কি বিশ্বায়ন? এই প্রসঙ্গে সবিস্তারে আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

তৃতীয় অধ্যায়

পেশাগত পরিচিতির সংকট ও বিশ্বায়নঃ

শেক্সপিয়ারের ভাষায়, মানব সভ্যতায় কতকগুলি স্রোত আছে, যাকে বলা হয় Tides of History। আর এই সময়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাওয়া অনেক সময়ই অসম্ভব।[97] সময়ের ধারা বিশ্বায়ন সেই রকমই একটি স্রোত। এই ই-দুনিয়ায় বিশ্বায়ন আসলে এক বিশ্ব-বীক্ষা। বর্তমান সময়ে জীবনের পরতে পরতে বিশ্বায়ন নামক সত্তা উপলব্ধ হয় আমাদের কাছে। তথ্যপ্রযুক্তি, ইন্টারনেট, বহুজাতিক কোম্পানি, উগ্র অর্থনীতি, মুক্তবাজার, বিকেন্দ্রীকরণ, প্রাইভেটাইজেশন, ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ও বীমা, ই-গভর্ননেন্স, ই-কমার্স ও ই-লার্নিং এর সহায়তায় আমাদের জীবনে বিশ্বায়ন এর প্রভাব অনুভব করতে পারি। জীবন ও বিশ্বায়ন– যেন হর-গৌরী সম্পর্কে সম্পর্কিত। যদিও এই সখ্যের নিবিড়তা বিষয়ে আমরা খুব যে ওয়াকিবহাল- তেমন কথা বলতে পারি না। কেননা সাধারণ মানুষের কাছে বিশ্বায়ন শুধুমাত্র একটি শব্দ ছাড়া আর কিছু নয়। জীবনে এর ব্যাপ্তি যে কীভাবে আছে এবং তা কতটা প্রসারিত, সেই সম্পর্কে তাদের হয়তো তেমন কোন ধারণায় নেই। বিশ্বায়নকে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিভিন্ন ব্যবস্থার যোগফল হিসাবে ভাবা যেতে পারে। বিশ্বায়ন তত্ত্বের অধীনে অর্থনৈতিক আন্তঃনির্ভরতার কথা বারবার বলা হয়ে থাকে। যা রাজ্য, দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী প্রসারিত। যদিও বিশ্বায়ন নামক শব্দটি শিক্ষার অঙ্গনেই বেশি প্রচলিত।

বলা যায় বিশ্বায়ন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যা বিশ্বের মানুষকে এক সূত্রে গ্রথিত করে। অর্থাৎ পৃথিবীতে একটি সমাজের অস্তিত্বই থাকবে, যার নাম বিশ্বসমাজ (Global Society)। 'বিশ্বায়ন' শব্দটি ১৯৮০ সাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণভাবে বলা যায়, তথ্য বিপ্লব গোটা কয়েক রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানের

---

[97] Jena, Pradeep kumar, "*Indian Handicrafts in Globaliation Times: Analysys O Global-local Dyanies*" Center for The Study o Social Systems, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, Vol.8, No-2, 2010, P-122.

হাতে ভয়ংকর শক্তি কেন্দ্রীভূত করছে। গড়ে উঠছে এক নতুন সাম্রাজ্য। এই নতুন সাম্রাজ্যে আমাদের মূল্যবোধ, ভাবনা, জীবনধারা, অর্থনীতি– সবকিছুর বদল ঘটছে। এই বদল ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই দিক থেকেই। আমাদের পর্যবেক্ষণের অভিমুখ যেহেতু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রকে ঘিরে– সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বের এই উন্নয়নের আবর্তে ক্ষুধিত, বঞ্চিতের নিত্যচিত্তবিক্ষোভ, তাদের হাহাকার ক্রমশ আবর্তিত হচ্ছে। অর্থাৎ বিশ্বায়ন সারা পৃথিবীর মতো এই উপমহাদেশে কিছু মানুষকে রুটি-রুজির বিপন্নতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সেই সঙ্গে মানুষের পেশাগত পরিচিতিকে প্রশ্নচিহ্নের মুখোমুখি করছে। মানুষের পেশায় বিশ্বায়নের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনার আগে বিশ্বায়নের স্বরূপ সম্পর্কে দু'চারটি কথা বলার অবকাশ রয়েছে।

৩.১ বিশ্বায়ন নিয়ে দু'চার কথা:

বিশ্বায়নের ধারণা বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে ঐক্যমত তৈরী হয়নি। বিশ্বায়নের প্রধান তাত্ত্বিক রোনাল্ড রবার্টসন বিশ্বায়নকে 'বিশ্বের সংকোচন' এবং 'পরস্পর নির্ভরশীলতা' বলেছেন। অর্থাৎ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের উন্নতি মানুষের কাছে 'দূর-কে নিকট' করেছে এবং এমন একটা সিস্টেমের বা পদ্ধতির মধ্যে মানুষকে এনে ফেলেছে, সেখানে আমরা পরস্পর পরস্পরের উপর অজান্তেই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনি মার্টিন আলব্রোর কথায়। তিনি বিশ্বায়নকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন একটি সামগ্রিক সম্প্রদায়ের (কমিউনিটির) মধ্যে সমস্ত মানুষকে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া বলে। আর ম্যাকগ্রু বিশ্বায়নকে আধুনিক বিশ্ব-ব্যবস্থার অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং সমাজের মধ্যে বহুবিধ সংযোগ এবং সম্পর্কের নির্মিতিকে বোঝাতে চেয়েছেন। ম্যাকগ্রুর বক্তব্যও রোনাল্ড রবার্টসনের ধারণা থেকে পৃথক কিছু নয় বলেই মনে হয়। বিশ্বায়ন সম্পর্কে ধারণা প্রসারিত হয় 'The Stanford Encyclopedia of Philosophy'র কথায়। তাদের ধারণা অনুযায়ী- বিশ্বায়ন আসলে উন্মুক্ত বাজার উদারনীতির প্রসার আমেরিকা, ইংল্যান্ডের সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক প্রভাব। তথ্য ও সংস্কৃতির প্রসার ইন্টারনেট বিপ্লব যার মধ্য দিয়ে এক বিশ্বায়িত মানবতাবোধের ভাবনা তৈরি হয়। যেখানে সমস্ত সামাজিক দ্বন্দ্ব নিরসন ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

> "Globalization, or globalization (commonwealth Ennglish; see spelling differences), is the process of interaction and integration among people, companies, and governments worldwide. Globalization has accelerated since the 18th century due to advances in transportation and communication technology. This increase in global interactions has caused a growth in international growth in international trade and the exchange of ideas and culture. Globalization is primarily an economic process of interaction and integration that is associated with social and cultural aspects. However, disputes and diplomacy are also large parts of the history of globalization, and of modern globalization." [98]

তবে বিশ্বায়নকে জানতে গেলে কোনও নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা বেশ কঠিন। এর উদ্ভব ও বিকাশ, প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন। গত এক শতাব্দী যাবৎ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ খুব দ্রুত গতিতে পরস্পরের কাছাকাছি চলে এসেছে। কিন্তু এর শুরুটা হয়েছিল অনেক আগেই। বিশ্বকে যুক্ত করার প্রথম প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ঔপনিবেশিক যুগের প্রথম দিকে সারা দুনিয়া জুড়ে টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপনের মাধ্যমে। পঞ্চাশের দশক থেকে প্রথমে ট্রানজিস্টার রেডিও এবং পরে টেলিভিশন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগের সেতুবন্ধন তৈরি করে। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কম্পিউটারের উদ্ভাবনা ঘটে। আর ১৯৬৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে ARPANET নামক একটি প্রজেক্টের মাধ্যমে সূচিত হয় ইন্টারনেটের। এর

---

[98] . https://en.m.wikipeia.org/wiki/Globalization . Date-25.0.2021

Or, Jena, Pradeep kumar, "*Indian Handicrafts in Globaliation Times: Analysys O Global-local Dyanies*" Center for The Study o Social Systems, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, Vol.8, No-2, 2010, P-122.

উদ্দেশ্য ছিল সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এমনভাবে যুক্ত করা যাতে পরমাণু যুদ্ধের সময়ে নেটওয়ার্কের কিছু ধ্বংস হয়ে গেলেও যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখা যায়। তবে ইন্টারনেট এবং এই ইন্টারনেট-ভিত্তিক টেলিফোন এখন সারা বিশ্বজুড়ে যোগাযোগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগ ও পরস্পর নির্ভরশীলতা অনেক বেড়ে গিয়েছে। এখন পৃথিবীর এক কোণে যদি কিছু ঘটে বা কোনও ভাবাদর্শ উচ্চারিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে সেটা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। সারা পৃথিবী থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখার আর কোন বিকল্প নেই। অর্থাৎ বিশ্বায়ন ভূগোলের বিকাশকেই চিহ্নিত করে। তাই বিশ্বায়ন হল দূরত্বের মৃত্যু। ভৌগোলিক এবং জাতীয় সীমারেখা এই সময়ে দাঁড়িয়ে তাই একটি অবাস্তব ধারণায় পরিণত হয়েছে। প্রযুক্তি, তথ্যের সম্প্রসারণ, পৃথিবীর যাবতীয় জিনিসকে ঘরের কোণে এনে দিয়েছে। ইন্টারনেট ব্যবস্থায় আর্থিক উন্নতির প্রতিটি বিষয় সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তের বাজার যে কোনও জায়গায় গিয়ে ব্যবসা করতে পারে। এই কারণে অনেকে পৃথিবীকে ‘গ্লোবাল ভিলেজ’ নামে আখ্যা দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ স্থানীয় স্থানিক গ্রাম এখন বৈশ্বিক গ্রাম। একটু খুঁটিয়ে দেখলে আমাদের খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছেদ কিংবা আচার-আচরণে এই প্রভাব দেখা যাবে। বাংলার বুটিক শাড়ি পড়ে হলিউড মডেলের র‍্যাম্প ‘শো’তে হাঁটা আজ আমাদের আর অবাক করে না।

এই প্রযুক্তি বিস্তারের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বৈশ্বিক অর্থনীতির (Global Economy) ইতিহাস। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন বহুজাতিক সংস্থাগুলি ইউরোপে উৎপাদন শুরু করে। ১৯৭০ সালের পর ইউরোপীয় সংস্থাগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন শুরু করে। এই পথেই বিভিন্ন ক্ষমতাশীল দেশে বিশাল বিশাল বহুজাতিক সংস্থা গড়ে উঠছে। এই সংস্থাগুলি তাদের প্রযুক্তি এবং ব্যবসায়িক কৌশল একদেশ থেকে অন্যদেশে খুব সহজে বিস্তার লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। ১৯৯৭ সালে বিশ্বের প্রায় ১৯০টি দেশ বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক-রাষ্ট্রনৈতিক পারস্পরিক সম্পর্কের বৃত্তের আওতায় আসে। বৃত্তের কেন্দ্রে আছে ২৯টি দেশ। এই পুঁজিবাদী ক্লাব, যার অপর নাম ‘Organisation for

Economic Co-operation and Development' (OECD). উত্তর আটলান্টিক দেশসমূহ, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, নিউজিল্যান্ড, ফিনল্যান্ড এই ক্লাবের মূল সদস্য। বিশ্বের অন্যান্য দেশের কাছে এই সংস্থার দরজা একসময় প্রায় বন্ধ ছিল। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময় মেক্সিকো, চেক রিপাবলিক হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, কোরিয়া এই সংস্থার সভ্যপদ গ্রহণ করে। এর দ্বিতীয় বৃত্তে আসে পূর্বেকার সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের কিছু দেশ। আর এর তৃতীয় বৃত্তে রয়েছে তৃতীয় বিশ্বের ১২৬ টি অনুন্নত দেশ। এই দেশগুলি অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও রাষ্ট্রনীতির প্রেক্ষাপটে বিশ্ব অর্থনীতির সর্বনিম্নে অধিষ্ঠান করে। অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে পরস্পর নির্ভরশীলতাকে 'বিশ্বায়ন' নামক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে বর্তমানে একটি বহুল প্রচারিত কথার উল্লেখ করলে বিশ্বায়নের আসল তাৎপর্য বুঝতে সুবিধা হবে। 'থিংক গ্লোবালি বাট অ্যাক্ট লোকালি'।

বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট্যঃ

প্রথমত, স্থানিক বেড়াজালের বাইরে এক সামাজিক নতুন বিন্যাস। এই ব্যবস্থায় পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পর্কস্থাপন ক্ষীণ সময়েই সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের যে বিভিন্ন সমাজ– তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কের বিনিময়তা, প্রভাব ও গতি বৃদ্ধি।

তৃতীয়ত, ম্যানুয়েল ক্যাসেল ও এ্যান্থনি গিডেন্সের(*Anthony Giddens*) মতে, জ্ঞান এবং বিশেষজ্ঞ ব্যবস্থা ও যোগাযোগের ভিত্তিতে এক নতুন সমাজ এর উদ্ভব। একে বলা যেতে পারে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ।

চতুর্থত, অনেকের মতে, বিশ্বায়ন দ্বান্দিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত।

৩.২ বিশ্বায়ন বনাম পেশাগত পরিচিতির সংকট:

যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি কে, আপনি তার উত্তর দেবেন। যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি কী,আপনি আরেকটি উত্তর দেবেন। আপনার এই 'কে' এবং 'কী' ই আসলে একজনের ব্যক্তিপরিচয়। এই 'কে', 'কী'র অসংগতি পরিচিতি সংকটের জন্ম দেয়। ব্যক্তিপরিচয়ের যথাযথ মূল্যায়ন ব্যবহারিকতা বজায় রাখতে পারে না। পরিচিতি হল কোন ব্যক্তি বা বস্তুর পরিচয়। একজন ব্যক্তির পরিচয় যেমন তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে, কোন বস্তুর পরিচয় হয় তার রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যে। মানুষের শরীর রাসায়নিক এবং জৈবিক পদার্থ দ্বারা গঠিত হলেও, একজন মানুষকে শারীরিক ধর্ম দ্বারা বিচার করা হয় না। অর্থাৎ, একজন মানুষের বিশেষত্ব হল সে প্রথমে একজন মানুষ, সে একটি দেশ বা ভূখণ্ডের নাগরিক (যেমন ভারতীয়), স্ত্রী বা পুরুষ, তারপর সে কোন পরিবারের সদস্য (অর্থাৎ বাবা-মা, ভাই, বোন, কাকা, পিসি ইত্যাদি)। তারপর আসে নির্দিষ্ট ধর্মপরিচয় যেমন হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান। এ ছাড়া ভাষা, বর্ণ, পেশা ইত্যাদি বিভিন্ন দিক দিয়ে মানুষ চিহ্নিত হয়।

মানুষের পরিচয়ের কিছু অংশ জন্মগতভাবে আসে যা সে পরিবর্তন করতে পারে না। অর্থাৎ এতে তার কোন হাত নেই। যেমন- শ্রেণী বা জাতি। তারপর কিছু পরিচয় মানুষ নিজেই অর্জন করে। অর্থাৎ যোগ্যতার ভিত্তিতে সে তার পেশা নির্ধারণ করে। ধরা যাক, দর্জি, কুমোর, তাঁতি প্রভৃতি বর্তমান ভারতীয় সমাজে এই পেশার ভিত্তিতেই মানুষের মূল্যায়ন করা হয়। Liberalism অর্থাৎ উদারনৈতিক চিন্তাভাবনার পূর্বে মানুষের পেশা তার জন্মের ভিত্তিতে নির্ধারিত হত, যেমন রাজার পুত্র হত রাজা। ডাক্তার, পুরোহিত সবই বংশগত ছিল। উদারনৈতিক আন্দোলনের পর থেকে এই জন্মগত পরিচয়ের বদল ঘটতে থাকে। জন লক এই উদারনীতির জনক। (Locke was a key thinker of early liberalism.)[99] তাঁর লেখার মাধ্যমে তিনি সাম্য এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর জোর দেন। মানুষ তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের পেশা বেছে নেবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে উদারনীতির এই বর্তমান যুগেও আমরা এখনও

---

[99] Heywood, Andrew, *Politics*, 4th ed. Palgrave foundations, 2013, p-31.

এই জন্মভিত্তিক পেশার (শুধু ব্রাহ্মণরাই পুরোহিত হতে পারে) বিষয়টি মান্যতা দিই। যেহেতু আমার গবেষণাটি পেশাগত পরিচিতির ওপর দৃষ্টি নিবন্ধ করে, তাই আমরা অন্যান্য সমস্ত ধরনের পরিচিতিগুলিকে একপাশে রেখে প্রধানত পেশাগত পরিচিতিগুলি নিয়ে আলোচনা করব। এখন প্রশ্ন, এই উদারনীতি বা বিশ্বায়নের যুগই কি পেশাগত পরিচিতি বা স্বীকৃতি সংকটের একমাত্র কারণ? নাকি এর অন্য কোন কারণ আছে? বিশ্বায়নের আগে কি পরিচয়ের এমন সংকট ছিল? যদি তাই হয়, তাহলে তা কেমন ছিল? কিন্তু তা না হলে বিশ্বায়ন কীভাবে পেশাগত পরিচয়ের সংকট তৈরি করল? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়- বিশ্বায়নের পূর্বেও পেশাগত পরিচিতির সঙ্কট বিভিন্ন পেশায় লক্ষ্য করা যায়, আধুনিকীকরণের প্রভাবের ফলে। বিশেষ করে শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী সময় থেকে। তবে এই সময় পেশাগত পরিচিতির সঙ্কটের যে রূপ আমরা দেখতে পাই, তা বিশ্বায়নের বা নয়া-উদারনীতিবাদের পরবর্তী সময়ের পেশাগত পরিচিতির সংকটের ভয়ঙ্কর রূপ থেকে ভিন্ন এক রূপ হিসাবে। শিল্পবিপ্লবের পূর্বে মানুষের পেশা ছিল তাদের বংশ পরম্পরা অর্থাৎ জাতভিত্তিক পেশা। যেমন- একজন ব্রাহ্মনের ছেলে পুরোহিতের কাজ করবে, একজন কৃষকের ছেলে কৃষকই হবে, কুমোরের ছেলে মাটির তৈরী জিনিসপত্র তৈরী করবে, ছুতোরের ছেলে কাঠের কাজ করবে, আবার মুচির ছেলে চামড়ার জিনিস তৈরী করবে, ডোমের ছেলে মড়া কাটবে, কিন্তু শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী সময়ে কিছু কিছু মানুষ তাদের পূর্বপুরুষের পেশা ছেড়ে ভিন্ন পেশায় অর্থাৎ শহরে নতুন গড়ে ওঠা শিল্পকারখানায় নিজের ইচ্ছায় শ্রমিকের কাজকে পেশা হিসাবে বেছে নেয় বা নিজেজের দক্ষতা এবং আগ্রহ অনুসারে ভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হন। এক্ষেত্রে নিজের পেশা ছেড়ে ভিন্ন পেশায় যোগদান তাদের কাছে অনেকটা ইচ্ছার স্বাধীনতার বহিঃপ্রকাশ ছিল। এখানে কোন আপসোস্ বা পরাধীনতা ছিল না।

এখন দেখা যাক বিশ্বায়নের প্রয়োজনীয়তা কি? এ প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে বিশ্বায়ন কাকে বলে এ সংজ্ঞার মধ্যে। যদিও বিশ্বায়ন কাকে বলে, বিভিন্ন তাত্ত্বিকগণ এই প্রসঙ্গে কি বলেছেন, তা এই অধ্যায়ের শুরুতেই আলোচনা করা হয়েছে, তবুও সংক্ষেপে বলা যায় বিশ্বায়ন হল-সমগ্রবিশ্বের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সংস্কৃতির

একত্রীকরণের একটি প্রক্রিয়া। যা সমগ্র বিশ্বকে একটি গ্রামে পরিণত করেছে, পৃথিবীর সমস্ত ধরনের সীমানা ভেঙ্গে। সময় এক গতিশীল ধারা, যাকে কখনোই ধরে রাখা যায় না। এই সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনযাপন এবং কর্মযজ্ঞও পরিবর্তিত হচ্ছে। পুঁজিবাদ ও তার ব্যতিক্রম নয়, সেও এই পরিবর্তনের হাত ধরে নতুন কৌশলে নিজেকে নতুন রূপে বর্তমান সমাজের সামনে তুলে ধরেছে বিশ্বায়ন হিসেবে। আসলে বলা যায় বিশ্বায়ন আমাদের সমস্ত কিছুকে অর্থাৎ যা-কিছু মানবীয় তার সমস্ত কিছুর উপর বিশ্বায়নের প্রভাব আছে। এখানে প্রভাব না বলে, বলা ভালো আমরা বর্তমান সময়ের মানুষেরা বিশ্বায়নের মধ্যে দিয়ে চলেছি। বিশ্বায়ন আমাদের সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে ফেলেছে। সবকিছুকে এই যে বিশ্বায়িত বা ভুবনীকরণ করে ফেলা, এটাই হচ্ছে বিশ্বায়নের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বিশ্বায়নের বিভিন্ন ধারা সারা বিশ্বে প্রচলিত বা বহমান। খুব দ্রুততার সঙ্গে তা প্রসার লাভ করেছে তথ্যপ্রযুক্তি সহ ইন্টারনেট, বহুজাতিক সংস্থা, উদার অর্থনীতি, মুক্তবাজার, বিকেন্দ্রীকরণ, প্রাইভেটাইজেশন, ই-ব্যাঙ্কিং, ই-গভর্নেন্স, ই-কমার্স ও ই-লার্নিং এর সহায়তায়। এর কায়দা হিসেবে বলা যায়-তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলির উন্নয়নের প্রলোভনে প্রথমে ঢালাওভাবে ঋণদানের ব্যবস্থা তৈরি করা যাতে তার মধ্য দিয়ে খুব সহজেই বিদেশী পুঁজির প্রসার ঘটানো যায়। তারপর ওই দেশগুলিতে প্রবেশ করে দেশীয় অর্থনীতিকে মন্দাক্রান্ত করার ব্যবস্থা নিতে পারে। এর পরবর্তী সময়ে দেশীয় সমস্ত কাঁচামালকে রপ্তানি করা। যার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে নিজেদের একচেটিয়া আধিপত্য থাকার কারণে রপ্তানির দর নিয়ন্ত্রণ করে বাণিজ্যে মন্দা নিয়ে আসে।

IMF (International Monetary Fund) বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার নীতিধারা অনুসারে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সরকার বিশ্বায়নের গতিধারাকে আরো ব্যাপক ও তীব্রতর করে তুলেছে। এই নতুন ধারার বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে উন্নয়নশীল দেশগুলি নিজেদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় এনেছে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন। যার ফলে উন্নত দেশগুলি বিশ্বায়নের চাবি হাতে নিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে তাদের

আর্থিক বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্য অবাধে চালিয়ে নিজেদের স্বার্থ কায়েম করেছে। যে কারণে তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত, ক্ষুদ্র ও অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল রাষ্ট্রগুলি বিশ্বায়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে অসমর্থ হচ্ছে। যার প্রভাব পড়েছে অত্যাধিক জনসংখ্যা যুক্ত উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলির দরিদ্র শ্রমিক, কৃষক, নারীসহ ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের শ্রমিকদের উপর, যার ফলে দেখা দিয়েছে নতুন এক সমস্যা, তা হল পেশাগত পরিচিতির সংকট।

এখন স্বাভাবিক ভাবেই একটি সমস্যা দেখা দেবে, তা হল তৃতীয় বিশ্বের অর্থাৎ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলি যদি বিশ্বায়নকে গ্রহণ না করে, তবে এই দেশগুলি পিছিয়ে পড়বে, যার ফলে ঐদেশের মানুষকে উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত করা হবে। আবার অপরপক্ষে যদি বিশ্বায়নকে গ্রহণ করা হয়, তাহলে সমাজের উন্নতি ঘটবে ঠিকই কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু সমস্যারও উদ্ভব ঘটবে। যেমন ধরাযাক, উপরে আলোচিত পেশাগত পরিচিতির সঙ্কট। যা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন।

এরপর আমাদের চিত্তে আরেকটি প্রশ্নের উদ্ভব ঘটবে, সেটি হল- রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কি?

সমাজ কীভাবে একটি পেশাকে দেখে, পেশাগত পরিচিতির বিষয়টি তার ওপর নির্ভর করে। তথাকথিত উন্নত পেশার জন্য মানুষ শ্রম-শক্তি এবং মেধা বা বুদ্ধি ব্যয় করে। পরিচয় সংকট দেখা দেয় তখনই যখন একজন ব্যক্তি মানসিকভাবে একটি নির্দিষ্ট কাজ করার চেষ্টা করে কিন্তু সামাজিকভাবে সে সেই কাজের সঙ্গে মানিয়ে উঠতে পারেনা।

> ("Professional Identity depends on how seriously society views that profession. We can call it an advanced profession; people spend a lot of energy and talent on the so-called advanced profession. This identity crisis occurs when a person is

> mentally trying to do a certain task but is socially incompatible with that task.")[100]

তবে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন অর্থাৎ বিশ্বায়ন এই পেশাগত পরিচিতিতে নতুন সংকট তৈরি করেছে। প্রযুক্তির পরিবর্তন যেমন নতুন কাজের দিক নির্দেশনা দিয়েছে, তেমনি আবার পুরনো বংশগত কাজের গুরুত্বও কমে গেছে। যেসব পেশায় মানুষ আবেগ নিয়ে কাজ করতো, সেইসব পেশার গুরুত্ব অনেকটা কমে গেছে। সুতরাং দেখা দিয়েছে স্বীকৃতি বা পেশাগত পরিচিতির সংকট।

> "However, economic, social, political, and technological changes have created a new crisis in this professional technology. As changes in technology have dictated the direction of new jobs, the importance of old jobs has also declined. In those professions where people used to work with emotions, the importance of those professions is less; there has been a recognition crisis."[101]

একজন মানুষের কাজ বেছে নেওয়ার পেছনে কিছু কারণ থাকে। যেমন সেই পেশায় অগ্রগতি, আর্থ-সামাজিক স্বীকৃতি এবং কাজের থেকে প্রেরণা। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক বিবেচনার ভিত্তিতেই পেশা বেছে নেওয়ার প্রবণতা ঘটতে দেখা যায়। অনেক সময় আবেগ বা ভালোলাগাকে গুরুত্ব না দিয়ে পেশা বেছে নেওয়া হয় এবং তখনই কাজ থেকে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতার ভাবনা উদয় হয়। অনেক সময় সেই পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি সেই কাজের প্রতি মোহভঙ্গ হয়ে যায়। অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা এবং

---

[100] Webb, S. A (Ed.), *Professional Identity and Social Work*, Routledge, 2017. https://doi.org/10.4324/9781315306957

[101] Webb, Stephen. A, '*Professional Identity and Social Work*', 5th International Conference on Sociology and Social Work: New Directions in Critical Sociology and Social Work: Identity, Narratives and Praxis, 2015.

আবেগ মানব মস্তিষ্ককে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে যে সে কোন কাজটি করবে। মানুষ ভালো কাজের খোঁজ করে যা তাদের যথেষ্ট বেতন এবং দৈনিক স্বাচ্ছন্দ্যের চাহিদা পূরণ করবে। Harris Interactive Problem অনুযায়ী দেখা যায়, শুধুমাত্র 20 শতাংশ মানুষ তাদের আবেগকে প্রাধান্য দিয়ে পেশা নির্বাচন করে। 40 শতাংশ মানুষ শুধুমাত্র আর্থিক কারণেই পেশা বেছে নেয়। Pew Research Center এর আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে যে 49 শতাংশ মানুষ তাদের কাজ নিয়ে সন্তুষ্ট। এখানে একটা বিষয় পরিষ্কার যে পরিস্থিতির চাপে মানুষ পছন্দ না হলেও কাজ করতে বাধ্য হয়। তাদের কেউ কেউ আবার নতুন কাজকে ভালোবাসতেও শুরু করে, নিজেকে কাজের সাথে মানিয়ে নিতে শুরু করে। কিছু কারণের উপর ভিত্তি করে, অনেক মানুষ আবেগ এবং অর্থের মধ্যে একটিকে বেছে নেয়। অনেকে আবার দুটি বিকল্পের কোনটিকে নির্বাচন করতে অসমর্থ হয়। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজটি সহজ হয় না কারণ সেক্ষেত্রে বিবেচনা করার অনেক বিষয় থাকে, যেমন- সম্ভাব্য আয়, জীবনের লক্ষ্য, জীবন থেকে চাহিদা এবং কখনও কখনও এসবের সবগুলির ওপরেই সিদ্ধান্ত নির্ভর করে।[102]

পেশার ধরণ অনুযায়ী পেশাদারিত্বকে তিনটি বিভাগে ভাগ করা যেতে পারে- পেশা বা Profession, কর্মসংস্থান বা Employment এবং ব্যবসা বা Business, অন্য সব বৃত্তি গুলিকে এই তিন ধরনের পেশার মধ্যে নিযুক্ত করা যেতে পারে।

ক) পেশাঃ

যে সমস্ত পেশা বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার কথা বলে অর্থাৎ যে পেশায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। এই জ্ঞান উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নয়। যেমন, ডাক্তার হতে হলে নির্দিষ্ট পড়াশোনা ও প্রশিক্ষণ নিতে হয়। যেমন আইন, নার্সিং, ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি নিয়ে পড়াশোনা। পেশার এই ক্ষেত্রগুলি নির্দিষ্ট পেশাদারি সংস্থা

---

[102] *Education Advice Passion Vs Money: Should You Choose a Job You Love or One That Pays*? January 21, University of the Potomac, 2022.

https://potomac.edu/should-you-choose-a-job-you-love-or-high-pay/

দ্বারা পরিচালিত হয়ে সমাজে পরিষেবা প্রদান করে। এই ধরনের পেশা অবলম্বনের ক্ষেত্রে সেই পেশাদারি ব্যক্তিকে তার সেই পেশাদার সংস্থা দ্বারা কিছু নির্দিষ্ট আচরণবিধি সর্বদা কঠোরভাবে অনুসরণ করা প্রয়োজন পড়ে। সেই কঠোর আচরণবিধি একটি নির্দিষ্ট পেশার সাথে যুক্ত সমস্ত পেশাদারদের কাজের অভিন্নতা নিশ্চিত করে।

খ) কর্মসংস্থানঃ

কর্মসংস্থান বলতে এমন ধরনের পেশা যেখানে একজন ব্যক্তি অন্যদের জন্য কাজ করে এবং বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করে। সরকারী ও বেসরকারি কর্মচারীরা, ব্যাঙ্ক অফিসার, কারখানার কর্মী, ইত্যাদি সবাই এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। কারণ, এখানে নির্দিষ্ট বেতন, নির্দিষ্ট শর্ত এবং সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় বলে। একজন কর্মচারীকে প্রদেয় পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট করা হয় এবং তা বেতন হিসাবে দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য একজন কর্মচারী কাজে অনুপস্থিত থাকলেও একটি নির্দিষ্ট সময় কাল পর্যন্ত বেতন পান।

গ) ব্যবসাঃ

ব্যবসা এমন একটি পেশা যেখানে পণ্য ক্রয় বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করা হয়, যেখান থেকে আয়ের পরিমাণ ভিন্ন এবং আয়ের পরিমাণ সময় বিশেষে পরিবর্তিত হয়। যেমন ট্রেডিং, মাইনিং, ম্যানুফ্যাকচারিং ইত্যাদি। পৃথিবীর সকল প্রকার কাজকে সাধারণত এই তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। কারণ কোন ব্যক্তি নিজের কিছু যোগ্যতা অর্জন করে কাজ করে অথবা সে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হয়ে কাজ করে বা ব্যবসা করে। এই তিন ধরনের পেশায় পরিচিতি সংকটের মাত্রা আলাদা। এখন কোন ধরনের পেশায় কী ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে তা আলোচনায় আনা যাক। [103]

---

[103] Chand, Smriti, *Types of Occupation: a. Profession b. Employment and c. Business.* https://www.yourarticlelibrary.com/business/types-of-occupation-a-profession-b-employment-and-c-business/23363

পেশা-

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, পেশা একজন ব্যক্তিকে বিশেষ জ্ঞান বা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাকে কৃতকার্য করে থাকেন। যেমন- ডাক্তারি পড়া, বা আইন পড়া ইত্যাদি পেশা। এই সমস্ত পেশার মানুষের সমস্যা তাদের আত্মনিযুক্তির স্তরে গিয়ে আলোচনা করলে ভুল হবে না।

1. আত্মনিযুক্তি বা স্ব-কর্মসংস্থান হল একজন ব্যক্তির নিজের মতো করে উপার্জন করা এবং নিজের সময় মতো কাজ করা।

2. স্ব-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিদের নিয়োগ করতে পারে।

3. স্ব-কর্মসংস্থানে অর্জিত অর্থের পরিমাণ নির্দিষ্ট নয়। কখনও কখনও পরিস্থিতি এমন হয় যে জীবনের চলার পথে সংকট দেখা দেয়। এখানে শুধু ডাক্তার বা আইনজীবীদের বিচার করা উচিত নয়। অনেক কাজেই একটি নির্দিষ্ট দক্ষতা প্রয়োজন হয়। একটি উদাহরণ যা বিষয়টিকে আরও ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করতে পারে। ধরা যাক, একজন রেডিও মেরামতকারী যিনি তার সারা জীবন রেডিও এবং টেপ রেকর্ডার মেরামত করে জীবন অতিবাহিত করেছেন। পরবর্তীকালে অর্থাৎ বর্তমান সময়ে রেডিওর প্রচলন প্রায় না থাকায় তার জীবন ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে, যদি না সে অন্য পেশায় নিজেকে নিয়োজিত না করেন। সুতরাং, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রেডিও মেরামতের পেশাটি বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি সংকটজনক অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু স্ব-কর্মসংস্থানে একজন ব্যক্তি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কিভাবে তার কাজ পরিচালনা করবেন এবং তার নিজের নিয়ম অনুযায়ী কাজ করার পূর্ণ স্বাধীনতা তার সবসময় থাকবে।[104]

কিন্তু এমন কার্যপরিচালনায় অনেক সুবিধা থাকলেও, কিছু অসুবিধেও থাকে।

1. আয়ের অনিশ্চয়তাঃ- যখন কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করেন, তখন তিনি একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ

---

[104] National institute of open schooling, *Self –Employment,* chapter 25. https://nios.ac.in/media/documents/srsec319new/319EL25.pdf

উপার্জন করেন। সেই টাকার বিনিময়ে সেই পরিমাণ অর্থ জীবনের বিভিন্ন খাতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এ অবস্থায় ব্যক্তির আয়ের নিশ্চয়তা না থাকায়, সে বিশেষ কোন ঝুঁকি নিতে পারে না।

2. ব্যয়ের প্রাচুর্যঃ- এই ধরনের পেশায় ব্যয়ের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায় কারণ এই জাতীয় পেশাগুলিতে দক্ষ হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট প্রমাণ ও অভীক্ষণে উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও প্রচুর খরচের ব্যাপার থাকে। উদাহরণস্বরূপ আমরা যদি চিকিৎসা পেশা নিয়ে আলোচনা করি, তাহলে দেখব যে একটি ছেলে বা মেয়ে দ্বাদশ শ্রেণি পাস করার পর NEET-এর জন্য প্রস্তুতি নেয়। এবং বর্তমানে পরীক্ষার প্যাটার্নের পরিবর্তনের সাথে সাথে, ভাল প্রতিষ্ঠানে কোচিং করা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। কারণ অন্যথায়, সেই ছেলে বা মেয়েটির NEET-এর মতো পরীক্ষায় পাশ করার নিশ্চয়তা কম বলে মনে করা হয়। এমবিবিএস এর পরের পাঁচ বছরও অনেক খরচ। সুতরাং, এটি দেখা যায় যে একটি পেশায় প্রবেশ করতে 27 থেকে 30 বছর সময় লাগে। অন্যদিকে, একজন ছেলে বা মেয়ে সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য 18 থেকে 21 বছর বয়সের মধ্যে পেশায় যুক্ত হতে পারে। প্রত্যেকের পক্ষে এত দীর্ঘ সময় ধৈর্য ধরা কঠিন হয়ে পড়ে, বিশেষ করে ভারতের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে যেখানে বেশিরভাগ মানুষই দরিদ্র।[105]

এছাড়া দেখা যায় যে কেউ যদি সরকারী বা বেসরকারী সেক্টরে কাজ করে তাহলে সে বিভিন্ন সুবিধা ভোগ করে থাকে। যেমন পেনশন, স্বাস্থ্য বীমা, অতিরিক্ত সময় কাজের বেতন, সঞ্চিত অবসরকালীন ছুটি, অসুস্থতার কারণে ছুটি এবং এছাড়াও কখনও কখনও একটি সরকারি বা কোম্পানির গাড়ি ব্যবহার করার সুযোগ পেয়ে থাকে। বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একটি বিষয় লক্ষ্য করতে পারি, কোভিড-19 মহামারীর সময়ে সবার অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল হলেও সরকারি কর্মচারীদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তেমন কোন ঘাটতি নেই। বিশেষ করে ছোট ব্যবসা

---

[105] Next Insurance Staff, Risks and Challenges of Being Self-Employed – How to Reinforce Your Small Business, Jul 26, 2018.

যেমন ইলেকট্রিশিয়ান, দর্জি, হার্ডওয়ার, ট্রেনের হকার, রাজমিস্ত্রি, ফেরীওয়ালা সকলেই আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়।

এই সমস্ত সমস্যা থাকা সত্ত্বেও কেউ নিজের পছন্দ অনুযায়ী কাজ করতে থাকলেও পরবর্তীতে এই সমস্ত সমস্যার মুখোমুখি হয়ে পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। অনেক ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক মনোভাব তাদের পূর্বের পেশা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে অনেক সময় এক পেশাকে ছেড়ে অন্য পেশায় নিযুক্ত হয়। ফলে পেশাগত স্বীকৃতির সংকট দেখা দেয়।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায় মানুষ শৈশব থেকেই কোন না কোন পেশা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায়, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে। এখানে তৈরি হয় পেশাগত পরিচয়ের সংকট। আমরা এখন যা দেখব তা হল ব্যবসায় কীভাবে পরিচয় সংকট দেখা দেয় এবং পরবর্তী ধাপে এই পুরানো পেশাদার সংকট কীভাবে নতুন বাজার ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়।

বর্তমান সময়ে কিছু লেখক ব্যবসায়িক সংকটের বিভিন্ন ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। যেমন, চার্লস এবং হার্ট এই সংকটের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন, সেগুলি হল-

1. একটি বিপজ্জনক সংকটাবস্থার অনুভূতি। 2. উচ্চ-অনিশ্চয়তা। 3. গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা।

> “Charles and Hart that crisis events feature: (1) a severe threat or an unfavorable, destructive, and often life-threatening change to the victim’s environment; (2) a high degree of

> uncertainty; (3) the need for prompt, yet critical and potentially irreversible, decisions”[106]

শিল্পবিপ্লব উদীয়মান প্রযুক্তির বর্ধিত ব্যবহারকে নির্দেশ করে। যেমন- কৃত্রিম ডেটা, মেশিন লার্নিং, মোবাইল প্রযুক্তি, ইন্টারনেট অফ থিঙ্ক, জিও-ট্যাগিং, স্পিচ রিকগনিশন ইত্যাদি। বুদ্ধিমত্তা-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনগুলি প্রযুক্তিগতভাবে সর্বোত্তম ব্যবসায়িক ফলাফল অর্জনের সুযোগ নিয়ে আসে। যেমন পরিষেবার গুণমান, উৎপাদনশীলতা এবং ব্যয় কার্যকর পরিষেবার শ্রেষ্ঠত্ব বৃদ্ধি। আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) বলতে বোঝায় প্রযুক্তির একটি বিস্তৃত শ্রেণী : যা কম্পিউটারকে এমন কাজগুলি সম্পাদন করে দেয় যেগুলির জন্য পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ মানবিক জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। [107]

পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষ এই সমস্ত ভূমিকাগুলি দক্ষতার সাথে পরিচালনা করার চেষ্টা করে এবং প্রতিটি ভূমিকার চাহিদাগুলির মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়, আপাতদৃষ্টিতে তা সমস্যাজনক মনে হলেও, কিন্তু কর্মজীবনে দ্বন্দ্ব তখনই ঘটে যখন একজন ব্যক্তির একাধিক ভূমিকার যে সময় এবং শক্তির চাহিদাসমূহ তা একে অপরের সাথে অসঙ্গত হয়ে পড়ে। কর্মরত পেশাদারদের সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলির মধ্যে একটি হল কর্মক্ষেত্রে চাহিদা এবং পারিবারিক চাহিদার দাবির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে না পারা। এই কর্মজীবন ও পারিবারিক জীবনের দাবিগুলি কর্মীদের জন্য তাদের সমস্ত ভূমিকা ভালভাবে সম্পাদন করা অসম্ভব না হলেও কঠিন হয়ে পড়ে। এই বিষয়টি দুটি দিক দিয়ে দেখা যেতে পারে- কাজ-পরিবার হস্তক্ষেপ (WTF) যেখানে কাজে পারিবারিক জীবনের চলার পথে রাস্তা তৈরী করে দেয়, আরেকটি পরিবার কাজ

---

[106] Muşetescu, Radu-Cristian & Shayb, Hezi-Aviram, *Exploring the Concept of Crisis in Businesses: A Critical Step in the Formulation and Implementation of Crisis Management*, Proceedings of the International Conference on Business Excellence. 13, Sciendo, 2019, P-963.

[107] Laurent, Giraud, Ali, Zaher, Selena, Hernandez, and Al, Ariss. Akram, *The Impacts of Artificial Intelligence on Managerial Skills,* Journal of Decision Systems, 2022, pp-1-34.

হস্তক্ষেপ (FTW) যেখানে পারিবারিক জীবনের চাহিদা বা দায়িত্বগুলি (যেমন সন্তানপালন, বাবা-মা'য়ের দেখাশোনা ইত্যাদির) কাজের বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।(Role interference in turn consists of two factors i.e. work to family interference (WTF), where work gets the way of family life and family to work interference (FTW) where family demands (such as, child or elder care etc.) affects work) কিন্তু কর্ম ও ব্যক্তিজীবনের ভারসাম্য অর্জন করা একজন কর্মচারীর স্বতন্ত্র ইচ্ছা হতে পারে। তবে একাকী যোদ্ধা হওয়া তার একার দায়িত্ব নয়। কর্মক্ষেত্রের নিয়ম ও শর্তাবলী নির্ধারণের প্রবক্তা হিসাবে নিয়োগকর্তাদের কর্ম ও পারিবারিক জীবনের ভারসাম্যের কারিগর হিসেবে দেখা হয়।[108]

উন্নয়নশীল বিশ্বে যুব কর্মসংস্থানের সমস্যাগুলি অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কারণের একটি জটিল মিথস্ক্রিয়া। অনুমান করা হয় যে আগামী 10 বছরে ভারতের শ্রমশক্তি প্রতি বছর প্রায় 10 মিলিয়ন শ্রমিক বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে, গত এক দশক ধরে প্রতি বছর প্রায় 5 মিলিয়ন শ্রমিকের হারে কৃষি কর্মসংস্থান হ্রাস পাচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ভারতে উৎপাদন ও পরিষেবা খাতে কর্মসংস্থানের অংশ 2000-2010 এর মধ্যে বাড়তে থাকে। অনেক অর্থনীতিবিদের মতে, ভারত পরিষেবা খাতের অভিযোজন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনাকে উন্নত করতে আগ্রহী। বেকারত্বের হারকে সাধারণত যুবসমাজের কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তবে বেকারত্ব ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত মূল কারণ ও সমস্যাগুলি বোঝা দরকার। চ্যালেঞ্জ যেকোন কাজেরই অংশ। কিন্তু এই চ্যালেঞ্জগুলি কোন নেতিবাচক দিক নয় কারণ চ্যালেঞ্জ আসলে শেখার সুযোগ দেয়। তবে এই শেখার

---

[108] Mohanty, A, and Jena, L, *Work-Life Balance Challenges for Indian Employees: Socio-Cultural Implications and Strategies*, Journal of Human Resource and Sustainability Studies, **4**, 2016, pp-15-21. doi: 10.4236/jhrss.2016.41002.

বিষয়টি নির্ভর করে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি একজন ব্যক্তি প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে বা কাটিয়ে উঠতে তার দক্ষতা ব্যবহার করতে প্রস্তুত কিনা।[109]

৩.৩ বিশ্বায়নের প্রভাবঃ প্রতিযোগিতা, অর্থের অভাব, ব্যর্থতার ভয়

বিশেষ করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যারা মুদিখানা ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিক্রি করেন, তাদের ব্যবসার সমস্যা ভিন্ন। তারা যে সমস্যার সম্মুখীন হয় তার কিছু বিষয় নীচে আলোচনা করা হল।[110] ব্যবসায়ীদের মনে প্রথম যে জিনিসটি আসে তা হল ব্যর্থতার ভয়। গ্রাম, মফস্বলে কিছু বহুল সমাদৃত দোকান থাকে যেখান থেকে অধিকাংশ মানুষ তাদের পণ্য কেনে। সেই তুলনায়, একজন ছোট মুদি ব্যবসায়ী বিভিন্ন দিক থেকে পিছিয়ে থাকে– খ্যাতি, অর্থ, ব্যবসায়িক অবস্থান ইত্যাদি। এইসব কারণে, ছোট ব্যবসায়ীরা ক্রমাগত লোকসানের সম্মুখীন হয়। এবং লোকসান বাড়লে ব্যবসা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। [111]

অর্থাৎ একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে পেশা, সেবা, ব্যবসা যাই হোক না কেন, বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কারণই হোক, সব ধরনের পেশাই সংকটের সম্মুখীন হয়। অর্থাৎ, ব্যক্তি তার কর্মজীবন থেকে তার আত্মবোধ হারিয়ে ফেলে। সে আসলে কেন এই কাজ করে তা তখন তার কাছে অস্পষ্ট হয়ে যায়। তবে বাহ্যিক কারণগুলি সাধারণত ব্যক্তির নিয়ন্ত্রনের বাইরে থাকে, যেমন সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা অর্থনৈতিক।

---

[109] Dr. Mohan A. K, "*Opinion of Youth on Issues and Challenges Related to Employment: A Study in Mysore City*" International Journal of Research – Granthaalayah, Vol. 4, 2016, pp- 1-7.

[110] The 6 Biggest Problems for Small Business Owners [+Infographic] Nov 8, 2017. https://statusbrew.com/insights/small-business-problems/

[111] Javier, Linares, *A Day in the Life of a Shopkeeper Running a Small Shop is a Tough Job*, May 31, 2018. / https://medium.com/f4life/a-day-in-the-life-of-a-shopkeeper-36ceac113a25

অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ কারণগুলি হল মানসিকতা, বিশ্বাস, ব্যক্তিগত প্রবণতা, হীনমন্যতা ইত্যাদি।[112]

একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, বিশ্বায়ন মানুষের পেশাগত পরিচিতিকে নতুন পরিস্থিতির মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে এই পরিস্থিতিকে অনুভব করা যায়। বিশ্বায়নের ধারণা মূলত অর্থনৈতিক। কেননা মূলত একটি অর্থনৈতিক ধারণা ও ব্যবস্থা হিসাবে বিশ্বায়নের আবির্ভাব ও বিকাশ ঘটেছে। এই ব্যবস্থায় পৃথিবীর সকল দেশের অর্থনীতি পরস্পর সঙ্গবদ্ধ বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের আন্তর্জাতিকীকরণ ঘটে। জাতীয় সরকার নিজেদের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে দুর্বল। উন্মুক্ত বাজার ব্যবস্থার পথে নিজেদের অর্থনীতির পুনঃবিন্যাসকে আটকাতে পারে না। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ পিটার ড্রুকার তাঁর ‘The New Relities’ গ্রন্থে বিশ্বায়নের কতকগুলি অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন।[113] যেমন –

১. বিশ্বায়নের সুবাদে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ সমগ্র পৃথিবীকে একটি মাত্র উৎপাদন ও পণ্য পরিষেবার বাজার হিসাবে গড়ে তোলার ব্যাপারে বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করেছে।

২. বিশ্বায়নের অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য হল বাজারের সর্বাধিক বিস্তার, মুনাফার সর্বাধিকরণ নয়।

৩. বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় বিনিয়োগই বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে, বাণিজ্য-বিনিয়োগ নয়।

৪. বিশ্বায়নের কারণে সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণের ক্ষমতা জাতীয় রাষ্ট্রের কাছ থেকে আঞ্চলিক জোট সমূহের কাছে হস্তান্তর হয়।

---

[112] *Triggers of a Professional Identity Crisis*, Jul 28, 2022. https://www.morethanmytitle.com/blog/2022/7/28/triggers-of-a-professional-identity-crisis

[113] Drucker, Peter Ferdinand, *The New Realities* , United Kingdom, Transaction Publishers, 2003.

৫. বিশ্বায়নের অর্থনীতিতে ‘পরিচালন ব্যবস্থা’ উৎপাদনের উপাদান হিসাবে প্রাধান্য পায়। জমি, শ্রম প্রভৃতি উৎপাদনের প্রচলিত উৎপাদন প্রাধান্য হারায়।

৬. প্রধানত অর্থের লেনদেনের মাধ্যমে বিশ্বায়নের অর্থনীতি বর্তমানে পরিচালিত হচ্ছে। অনুৎপাদক বিদেশী পুঁজি জাতি রাষ্ট্রের বাজারে প্রতিকূল প্রভাব-প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি করে।

৭. বিশ্বায়নের অর্থনীতিতে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে প্রায় স্বতঃস্ফুর্ত ঋণ, অর্থ ও বিনিয়োগের এক প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

অর্থনৈতিক মানদণ্ডে পৃথিবীর সকল দেশগুলিকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে দেখা হয়ে থাকে। ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াকে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড, পূর্ব ইউরোপ এবং রাশিয়াকে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড এবং এশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার অনুন্নত দেশগুলিকে থার্ড ওয়ার্ল্ড। প্রথম বিশ্বের দেশগুলি অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত। দ্বিতীয় বিশ্বের দেশগুলি অপেক্ষাকৃত অনুন্নত। আর তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অর্থনৈতিক বিকাশ ও জীবনযাত্রার মান অনেক নিচু বা একে উন্নয়শীল দেশও বলা হয়। উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির সঙ্গে শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক। উন্নত দেশগুলির বহুজাতিক সংস্থাগুলি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মূলত বড় বড় শহরগুলিতে কারখানা খোলে। সেখানে কর্মী হিসাবে যুক্ত হয় অনেক সংখ্যক স্থানীয় মানুষেরা। মাসান্তে নির্দিষ্ট বেতন পেলেও, তারা যে পরিমাণ পারিশ্রমিক প্রদান করে থাকে, সেই অনুপাতে পারিশ্রমিক পায় না। আবার তৃতীয় বিশ্বের কাঁচামালও সংস্থাগুলি অল্পমূল্যে করায়ত্ত করে থাকে।

ঠিক এই সূত্রেই সেই বহুজাতিক কোম্পানী (Multinational Company) বিক্রয়জাত উপাদান যে ব্যবস্থাপনায় দিতে পারে, ব্যক্তি মানুষ হিসাবে উৎপাদন করে সেভাবে কখনওই দেওয়া সম্ভব নয়। এই ব্যবস্থাপনা বলতে আমরা বুঝব– একই ছাদের নীচে ঝাঁ চকচকে ব্যবস্থার মল সংস্কৃতি, বিজ্ঞাপনের চাকচিক্যে ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ, অনলাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্রেতার দ্বারে উৎপাদিত বস্তু পৌঁছে দেওয়া। অন্যদিকে বহুজাতিক সংস্থাগুলি অত্যাধুনিক যন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে খুব সহজেই কোনও

উৎপাদন ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে এবং স্বল্প ব্যয়ে, স্বল্প সময়ে অনেক বেশি, অনেক বেশি টেকসইসম্পন্ন উপাদান উৎপাদন করতে পারে। কিন্তু একক বা পারিবারিক পেশার মানুষের সেই সামর্থ কল্পনাতীত। কাজেই তাদের সঙ্গে পেরে না উঠে তাদের ভিন্ন পেশাকে জীবিকা নির্বাহের জন্য বেছে নেওয়াটা বাধ্যতামূলক হয়ে ওঠে। কিংবা ধরা যাক প্রকৃতিজাত উপাদানে তৈরি সামগ্রী বিক্রয় করে যে মানুষ আগে জীবিকা নির্বাহ করত, তার প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে কৃত্রিম উপাদানে তৈরি মজবুত সামগ্রী। অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিভিন্ন সুবিধার কারণে এই কৃত্রিম সামগ্রী বাজারে বিকোয় বেশি। মার খায় সাধারণ উৎপাদক শ্রেণির মানুষ। শুধু তাই নয়, তৃতীয় বিশ্বের শিল্প-সংস্থাগুলিও এই প্রতিযোগিতায় পিছু হঠতে বাধ্য হয়। ফলে বেকারত্ব ও দারিদ্র বাড়তে থাকে। এই ধরনের বিশ্বায়নের ফলে ধনী দেশগুলি আরও ধনী হচ্ছে, দরিদ্র দেশগুলি আরও দরিদ্রতর হচ্ছে।

প্রশ্ন উঠবে, এমনটাই তো চিরকাল হয়ে এসেছে। কারণ বিজ্ঞানকে তো চিরকালই তার জায়গা ছেড়ে দিতে হয়েছে। হাজার বছর আগের ইতিহাসেও দেখা যাবে পর্যটন, বাণিজ্য, সংস্কৃতির প্রসার, জ্ঞানের প্রসার পৃথিবীর উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। এই পারস্পরিক সম্পর্ক সৃজনশীল ভূমিকা নিয়ে মানুষের জীবনকে আরও উন্নত করেছে। এক সময় উন্নত কারিগরির উদাহরণ ছিল কাগজ, মুদ্রণযন্ত্র, আড়ধনুক, বারুদ, লৌহশৃঙ্খলের ঝুলন্ত সেতু, ঘুড়ি, চৌম্বক কম্পাস, হাতওয়ালা এক চাকার ঠেলাগাড়ি, ঘূর্ণায়মান পাখা। এগুলি ব্যবহৃত হত কেবলমাত্র চীনে। পরবর্তীকালে ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশে এইগুলি ছড়িয়ে পড়ে। যেগুলি গ্রহণের ফলে পৃথিবী আজ উৎফুল্লই হয়েছে। একজোট হয়ে একে প্রতিরোধ করলে মনে হয় আমাদেরই লোকসান হত। আবার নবজাগরণ ও শিল্প বিপ্লবের মতো চমকপ্রদ ঘটনা ইউরোপ ও পরবর্তীকালে আমেরিকায় সংঘটিত হয়েছে। যা সারা পৃথিবীকেই সমৃদ্ধ করেছে বলা যায়। মাত্র কয়েক শো বছর আগেও সারা পৃথিবীতে দারিদ্র্যের করুণ দশা ছিল। কিন্তু আজ নিশ্চয়ই সেই চেহারা খানিকটা পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের পিছনে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও আধুনিক কারিগরির প্রভাবকে স্বীকার করতে হবে।

তবু বলা যায়, সেই ইতিহাস বিশ্বায়নের কুফলের মতো সর্বগ্রাসী নয়। ১৯৬০ সালে বিশ্বায়ন বলতে বোঝাতো ‘বিশ্ব-অন্বয়’ বা ‘ভুবন আবৃত’। মার্শাল ম্যাকলুহান প্রথম ভুবনগ্রাম-এর ধারণাটি (১৯৬৪) দেন। তাঁর মতে, ‘দূরকণ্ঠ’-এর মাধ্যমে সংস্কৃতির আদল ও মননশীলতা পাল্টে যায়– যা ক্রমে বিশ্বায়নের চেহারা নিতে থাকে। এই সংযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে আঞ্চলিক বাজারের সঙ্গে পুঁজিবাদী বাজারের অন্বয় ঘটে। ওয়েলরেসটিন বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে ‘বিশ্বপদ্ধতি তত্ত্ব’-এর বিশ্লেষণ করেছিলেন। এই বিশ্লেষণের মূল ভিত্তি ছিল ‘শক্তির খেলা’, যাকে ইংরেজিতে বলা যায় ‘পাওয়ার প্লে’। এই শক্তি এক বিশেষ কেন্দ্র থেকে বিস্তৃত হতে হতে আঞ্চলিক গণ্ডীকে গ্রাস করতে থাকে। যা কিনা ‘একক ভুবন’-এর ধারণা। বিশ্বায়ন বলতে স্পষ্টভাবে মূলত বোঝায়– সাংস্কৃতিক সংহতি, বিশ্ব-বাজার তৈরি করা, প্রযুক্তির বিশ্ব-সংযোগ এবং বিশ্ব-বিপণনের বিজ্ঞাপন। এই বিষয়গুলির সঙ্গে যদি তৃতীয় বিশ্বের পুঁজিবাদী দেশের অর্থনৈতিক আদান-প্রদানের কথা ভিন্নভাবে ভাবা যায়– তাহলে তাকে বলা যেতে পারে পুঁজিবাদী শক্তির খেলা বা শক্তির বিস্তার। এই দৃষ্টিতে বিশ্বায়ন তৃতীয় বিশ্বের কাছে অবশ্যই একটি বড় অভিশাপ।

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া বাজার রাজনীতির এমন এক কৌশলের গণ্ডি তৈরি করেছে– যাতে উন্নয়নের মানবিক চেহারা ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হচ্ছে। এই প্রভাব তৃতীয় বিশ্বের দেশেই বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কেননা বিশ্বায়নের চালচিত্রে রয়েছে পুঁজিপতিদের পুঁজি, প্রযুক্তি আর মালপত্র এবং অবশ্যই তৃতীয় বিশ্বের অদক্ষ শ্রম, বেকারত্ব, দারিদ্র এবং হতাশা। মনে রাখতে হবে ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে বিশ্বায়ন দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়। এর চালিকা শক্তি ছিল MNCs. স্থিতিশীল চাহিদা ও দেশের মধ্যে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় এই কোম্পানিগুলি উন্নয়নশীল দেশে তাদের উৎপাদন ক্ষেত্রগুলি স্থানান্তরিত করে নিয়ে যেখানে দ্রব্য সামগ্রির অভ্যন্তরীণ ও পরিষেবার প্রসার ঘটিয়ে চলেছে। যেখানে কাঁচামাল ও শ্রম সুলভ। এই কোম্পানিগুলির প্রভাবে পড়ে পৃথিবী যেন কারখানায় রূপান্তরিত হচ্ছে। এই উৎপাদনের বিশ্বায়নকে অনেকে নয়া-উপনিবেশ বলে

উল্লেখ করে থাকেন। যা কিনা উক্ত কোম্পানিগুলির রাষ্ট্র দ্বারা সমর্থিত।[114] তাই বিশ্ব এখানে কোন এক গ্রাম হয়ে উঠতে পারে না। কেননা বিশ্বায়ন এখানে এক নতুন মাত্রার নতুন বিনিময় ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু না। এই বিশ্বের চরমতম সত্য হল, প্রতি মিনিটে বাইশ জন শিশু অনাহারে মারা যায় আর একই সঙ্গে প্রতি এক মিনিটে এক মিলিয়ন ডলার অস্ত্রশস্ত্র কেনার জন্য ব্যয় হয়।

বিশ্বায়নের প্রভাব থেকে ভারতবর্ষও মুক্ত হতে পারে নি। এখন কিছু উদাহরণের সাহায্যে ভারতবর্ষে তার প্রভাব নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করবো। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প হিসাবে পরিচিত হস্তচালিত বস্ত্রশিল্পে বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব মারাত্মক। একসময় বৃহৎ শিল্পপতিদের দ্বারা পরিচালিত বস্ত্রশিল্পগুলির উপর সরকারের নিষেধাজ্ঞা ছিল যে কোনও মতেই রঙিন শাড়ি তৈরি করা যাবে না। কেননা এতে হস্তচালিত তাঁতশিল্প মার খাবে। কিন্তু ১৯৯০ সালে দেশে উদারীকরণের হাওয়া বইতে শুরু করলে এই পরিস্থিতির বদলে যেতে থাকে। সরকারি ভর্তুকি, সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়ে।[115] বস্ত্রশিল্পে সংরক্ষণ বলতে নির্দিষ্ট কয়েক প্রকার কাপড় শুধুমাত্র হস্তচালিত তাতে বোনা যাবে। অর্থাৎ সেই বস্ত্রগুলি মিলে বা পাওয়ার লুমে বয়ন করা যাবে না। উল্লেখ্য প্রথমে ২২ প্রকারের বস্ত্রে সংরক্ষণ ছিল। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তা কমিয়ে ১১ প্রকার করা হয়েছে। পরিবহণ, রেশম আমদানির ক্ষেত্রগুলিতেও সরকার হাত গুটিয়ে নেয়। উল্লেখ্য কেন্দ্রে এনডিএ সরকার বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ১৪২৯ টি পণ্যের পরিমাণের গতিবিধির নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে। তাই দেখা যাচ্ছে বিনাশুল্কে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ওই পণ্যগুলি ভারতের বাজার ছেয়ে ফেলেছে। ফলত মুক্তবাজার এর ধারণা বাস্তবায়িত যদি হয় তাহলে ছোট ছোট শিল্পগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হবার সমূহ সম্ভবনা থাকবে। কারণ বিশ্ববাজারের সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পগুলি তাল মিলিয়ে না ওঠার প্রবল সম্ভবনা তৈরী হবে। প্রকারান্তরে তার প্রভাব আমরা হাতে নাতে পাচ্ছি।

---

[114] Das, Debarati, *Globalization Its Impact on Humanity*, Bulletin of The Ramakrishna Mission In Statute of Culture, Sep, 2011; Vol. LXII, No- 95, P- 447.

[115] চক্রবর্তী, শুভাশিস, 'বাংলার তাঁত শিল্প নদীয়া জেলার একটি সমীক্ষা' ১৯৪৭-২০১৪, সেতু, মে ২০১৪, পৃষ্ঠা ১৩০।

যেমন- পশ্চিমবঙ্গ সরকার পণ্য উৎপাদনে সংরক্ষণ বজায় রাখলেও সুরাহা মিলছে না। কেননা সংরক্ষণ তুলে দেওয়া অন্য রাজ্য থেকে আসা পাওয়ার লুমে তৈরি সামগ্রী এই রাজ্যে ঢুকে পড়ছে। মার খাচ্ছে এই রাজ্যের হস্তচালিত তাঁত-শিল্পীরা।

বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম তুলো রপ্তানিকারক দেশ হিসাবে ভারতের স্থান, যা চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই। [116] তন্তু, তুলো, পাট, সিল্কের মতো প্রাকৃতিক ফাইবারস্ থেকে তুলো উৎপাদন এবং পলিয়েস্টার, আঠালো নাইলন ও এক্রাইলিন, ভালো সিন্থেটিক ভারতীয় টেক্সটাইল শিল্পকে বিশ্ববাজারে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। এর পিছনে ১৯৯০ সালের সরকারের অর্থনৈতিক নীতি, বাণিজ্য উদারীকরণের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্রয়োজক চালিত ভ্যালুচেন, বহুজাতিক সংস্থার নির্মাতাদের নেটওয়ার্কের সমন্বয়, পুঁজি ও প্রযুক্তির যৌথ সমন্বয় (যেমন অটো মোবাইল, বিমান, কম্পিউটার, সেমি কন্ডাক্টর) এবং ব্র্যান্ডেড নির্মাতারা বিভিন্ন বিকেন্দ্রীভূত উৎপাদনে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করছে। এক্সপোর্ট দেশ হিসাবে সাধারণত উন্নয়নশীল দেশে এই প্যাটার্ন বাণিজ্য নেতৃত্বাধীন এই শিল্পায়ন পণ্য শিল্পে পরিণত হয়েছে।

হস্তচালিত তাঁতশিল্পে বিভিন্ন সংকট দেখা দিয়েছে এবং জীবিকার ক্ষেত্রগুলি সংকুচিত হয়েছে। তাই অসংগঠিত তাঁতিরা মুম্বাই, পুনে, রাজস্থানে হোটেলের কাজে, শ্রমিকের কাজে জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হচ্ছে। মহিলা তাঁতিরা অন্য উপায় না পেয়ে তামাক শিল্প, সজ্জা শিল্পে নিজেদের নিয়োজিত করছে। উল্লেখ্য ১৯৯৪-৯৫ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে বিড়ি, সিগারেটের উপর এক্সাইজ কর কমিয়ে দেবার ফলে বিড়ি শিল্প বিপদের মুখে পড়েছে। বিড়ি শিল্পের জন্য যে কেন্দুপাতা ব্যবহার করা হয় তা সংগ্রহ করে মূলত আদিবাসীরা। ফলে তাদের রুটি-রুজির ক্ষেত্রেও প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিয়েছে।

---

[116] Grandhi, Vijaya. Switha, *Alec Crawford Price Volatility in the Cotton Yarn Industry*, Lessions from India, October, 2007.
https://www.iisd.org/search/?qu=vijaya+switha+Grandhi

পুঁজিবাদী বিশ্বায়নে শ্রমিক শ্রেণি গভীর সংকটে পড়তে পারে। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে নিরক্ষর শ্রমিকদের বাজারদর বরাবরই কাছাকাছি থাকে শূণ্যের। এই সংকটের অভিমুখ যেমন- বিশ্ব ফিনান্স পুঁজি (World Finance Capital) এবং আইএমএফ (International Monetary Fund), বিশ্বব্যাঙ্ক (World Bank) ও বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার (World Trade Organization) আগ্রাসনের ফলে প্রতিটি সার্বভৌম রাষ্ট্র তাদের অর্থনীতির দরজা খুলে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানকে প্রবেশ করতে দিতে বাধ্য হতে পারে। অর্থনীতির সংস্কার করে রাষ্ট্রের ভূমিকা ক্রমশ ছোট করে দিতে হতে পারে। জনহিতকর বিভিন্ন ভর্তুকি ব্যবস্থা বন্ধ করে দেবার সম্ভবনা তৈরী হতে পারে। দেশের বিভিন্ন প্রযুক্তির পরিকাঠামো নষ্ট করে দিতে বাধ্যতাবোধ তৈরী হতে পারে। **দ্বিতীয়ত**, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিরাট ফারাক সংগঠিত করার প্রবল সম্ভবনা তৈরী হতে পারে বিশ্বায়নের ফলে। ফলত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি ক্রমশ শিল্পোন্নত দেশগুলির মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ার সম্ভবনা থাকতে পারে। যার পরোক্ষ ফল জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, আন্তর্জাতিক মঞ্চ ক্রমশ দুর্বলতর হতে পারে। **তৃতীয়ত**, পুঁজির বিশ্বায়ন ও কেন্দ্রীভবন যত দ্রুতভাবে প্রসারিত হবে পুঁজিপতি দেশগুলি তত আগ্রাসী হয়ে উঠতে পারে। এতে শ্রমিকের সঙ্গে সম্পর্কিত কর্মী সংকোচন, ছাঁটাই, লে-অফ, লক আউটের মতো ঘটনা ঘটার সম্ভবনা তৈরী হতে পারে। দীর্ঘ দিনের আন্দোলনে প্রাপ্ত ন্যূনতম অধিকারগুলিও ধরে রাখা তাদের ফলে সম্ভব নাও হতে পারে। শ্রমিক আন্দোলনগুলি দুর্বলতর হতে থাকবে। **চতুর্থত**, পুঁজির বিশ্বায়নের পাশাপাশি সমাজতন্ত্রের শক্তি দুর্বল হয়ে প্রায় বিশ্ব প্রতিক্রিয়া শক্তি বিশ্বে একচেটিয়া অধিকার কায়েম করতে থাকার সম্ভবনা তৈরী হতে পারে।[117] উল্লেখ্য ১৯৯৯ সালের UNDP রিপোর্ট অনুযায়ী পৃথিবীর মোট পেটেন্টের ৯৫ শতাংশ মালিক ১০ টি শিল্পোন্নত দেশ। আর পৃথিবীতে গবেষণা বাবদ যত খরচ হয় তার ৮৪ শতাংশ অর্থই এইসব দেশগুলি

---

[117] মজুমদার, চিত্তব্রত, ‘বিশ্বায়ন, প্রযুক্তির বিকাশ এবং ভারতবর্ষ’, অমিয় কুমার বাগচী (সম্পাদনা), বিশ্বায়ন ভাবনা- দুর্ভাবনা, প্রথম খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫, পৃষ্ঠা-১৭৩।

খরচ করে। এর বেশিরভাগ অংশীদার আবার এইসব দেশের হাতে গোনা কয়েকটি সংস্থা।

তাই দেখাযায় চিরাচরিত শিল্প, যেমন বস্ত্রশিল্প, বেকারি শিল্প, তামাক শিল্প, প্রসাধন শিল্প, খেলনা শিল্প– সংকটে পড়ার সম্ভনা প্রবলভাবে দেখা দিতে পারে। যেমন- উদাহরণ হিসাবে বলা যায় **১৯৯১** সালের পর ৪ লক্ষ ক্ষুদ্র শিল্পকে রুগ্ন শিল্প বলা হয়েছে। কখনও তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে এই শিল্পগুলিতে বিশেষ করে মহিলাদের কর্মক্ষেত্র সংকুচিত হয়েছে। সমস্যা এখানেই শেষ নয়। স্বাস্থ্য পরিষেবায় পণ্যকরণ ঘটার ফলে সাধারণ মানুষ সেখানে চিকিৎসার সুযোগ না পাওয়ার সম্ভবনা তৈরী হতে পারে। তাই সমীর দাশগুপ্তের কথায়-

> "আমি এখনও দারিদ্র্যের তীব্র গন্ধ পাই তৃতীয় বিশ্বের অরণ্যে, পর্বতে, জনপদে, আমি তৃতীয় বিশ্বের মানুষের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে শুনতে পাই ঋণভারে জর্জরিত গুমরে গুমরে ওঠা কান্নার শব্দ, বৈষম্যের হাহাকার, বঞ্চনা এবং ক্ষুধার আর্তনাদ, যুদ্ধের অশুভ দামামা, জাতিদাঙ্গা, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মযুদ্ধের পৈশাচিক উল্লাস, সন্ত্রাসবাদের কালো ছায়া এবং অসহায় মানুষের ক্ষোভ।" [118]

বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে বলা কথাগুলি কাব্যিক মনে হলেও একজন সচেতন মানুষের যন্ত্রণার কথা এই ভাষা ছাড়া যেন ব্যক্ত করা যায় না। বাস্তবিকই বিশ্বায়ন এক বৃহৎ সংখ্যক মানুষের পেশাগত যে সংকট তৈরি করেছে– তার ফলাফল হিসাবে দারিদ্র, অপুষ্টি, অনাহার, চিকিৎসাহীনতা, নিরক্ষরতা সর্বোপরি সমাজে এক প্রবল অসহিষ্ণুতার জন্ম দিয়ে চলেছে সমাজে। ফলত প্রতিনিয়ত আত্মহত্যা, পেশিশক্তির আস্ফালন, খুনোখুনির মতো ঘটনার নিয়ত সাক্ষী থাকতে হচ্ছে আমাদের। জীবনানন্দ কথিত 'ভালো মানবসমাজ' আজ ধূলায় ধূসরিত। এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেই রাষ্ট্রই নাগরিক পরিষেবা কিংবা উৎপাদনের সমস্ত ক্ষেত্রে ঢালাও বেসরকারিকরণের পথে হাঁটছে। আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের

---

[118] দাশগুপ্ত, সমীর, 'বিশ্বায়ন ও তার পর', আনন্দ দাশগুপ্ত, সম্পাদনা, স্বাধীনতা স্বদেশ সমাজ সংস্কৃতি, গাঙচিল, বইমেলা ২০০৮, পৃষ্ঠা- ৯৩।

দেশে যা কিনা ‘মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা’ দেওয়ার সামিল। ‘ফেয়ার অ্যান্ড ফেয়ার– ফেয়ার ইজ এভরি হয়ার’। তাহলে মানুষের ভবিষ্যৎ কি?

বিশ্বায়নের ফলে আমরা কিছু আশার আলোও দেখতে পায়– সেইদিকে আমাদের দৃষ্টিপাত করতে হবে। ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে দেখা যাচ্ছে ২০০৭ সালে ভারত তুলো উৎপাদক দেশ হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে টেক্কা দিয়েছে। বিশ্বায়ন এবং মাল্টি-ফিব্রে-এগ্রিমেন্ট (এম এফ এ) অংশত এই তুলো চাষের বিস্তৃতির ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। ২০০৫ সালের জানুয়ারি মাসে এমএফএ সম্পাদনার পর ভারত বৈদেশিক বাজারের দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করেছে। ২০০৪ সালে ৬৬০০০০ বেল (গাঁট) থেকে ২০০৬ সালে ৪২৫০০০০ বেল রপ্তানি করেছে। এই বিপুল পরিমাণ রপ্তানির মাধ্যমে ভারত খুব দ্রুত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম সুতো রপ্তানিকারক দেশ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসাব অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ২৭ মিলিয়ন চাকরি এই মাল্টি-ফিব্রে-এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে রাখা হয়েছে। যার জন্য ৪০ বিলিয়ান মার্কিন ডলার রপ্তানির ক্ষেত্র হারাতে বাধ্য হচ্ছে।

অবাধ বাণিজ্যের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ভারতের নিম্ন বেতনে শ্রমিক লাভের সুযোগ সুবিধা এবং উচ্চ মানের আভ্যন্তরীণ তুলো উৎপাদন টেক্সটাইল ইন্ড্রাস্টিকে বিশ্ব বাণিজ্যে স্থান দিতে পারে। এবং সেই বিষয়ে সম্ভবনাও দেখা দিয়েছে। ১৫ মিলিয়ান ভারতীয়দের কাছে এটি শুভ সংবাদ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। উল্লেখ্য বর্ধিত তুলো রপ্তানি আবশ্যিকভাবে আভ্যন্তরীণ সুতো শিল্পের উন্নতিতে ভূমিকা নাও নিতে পারে। কিন্তু অনেক কৃষক মনে করেন তাদের কাঁচা তুলোর মূল্য বিদেশের বাজারে হয়তো বেশি অর্থ দেবে। ফলত তারা দেশিয় আভ্যন্তরীণ বুনন শিল্পের কারখানায় তাদের কাঁচামাল পাঠাতে তারা উৎসাহী নন। কিন্তু এতে ভারত তার রাজস্ব অনেকটাই হারাবে। কেননা, এর ফলে কাঁচা তুলোর সঙ্গে যদি মূল্যবর্ধক পদক্ষেপ যেমন সুতো বা ফিব্রে উৎপাদন না করে তাহলে শুধু তুলো রপ্তানি করে ভারত সেই পরিমাণ রাজস্ব অর্জন করতে পারবে না। এইসব ক্ষেত্রে সরকারকে কৃষক, বস্ত্রশিল্পীর স্বার্থরক্ষা করে সরকারের দিক থেকে পদক্ষেপ গ্রহণ করা আশু প্রয়োজন।

অর্থনীতির পরিভাষায় আশাবাদকে দেখানো হয় বুল বা ষাঁড় হিসাবে। এরা গুঁতিয়ে জিনিসকে উঁচুতে তোলে। অর্থাৎ এই সিম্বল দ্বারা বোঝানো হয় দাম বৃদ্ধি, মুনাফা বাড়া– যার দ্বারা আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানোকে বোঝানো হয়। আর ঠিক এর বিপরীত পরিস্থিতি অর্থাৎ অর্থনীতির নিরাশাকে দেখানো হয় বেয়ার বা ভল্লুক দ্বারা। যারা জাপটে ধরলে নীচে ফেলে দেয়। অর্থাৎ, দাম, মুনাফা কমে। আর্থ-সামাজিক অবস্থার অবনতি ঘটে। বিশ্বায়নের পৃথিবীতে সমগ্র বাজার যেন এই ষাঁড় এবং ভাল্লুকের নিয়ত দ্বন্দ্ব। এই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে দেশীয় শিল্প সম্পর্কে সরকারি এবং বেসরকারিভাবে প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা, বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। জড়বৎ হয়ে থাকলে বিশ্ব অর্থনীতির প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে হবে। তাতে বেকারত্ব বাড়বে। সামগ্রিকভাবে অবনয়ন ঘটবে দেশীয় আর্থ-সামাজিকতার।

বিশ্বায়নের বাজারে একটি চর্চিত শব্দ হল শুল্ক প্রাচীর। প্রতিবেশী রাষ্ট্রে যেমন বিভিন্ন শিল্প উপাদান রপ্তানি করা হয়, আমাদের অন্য দেশ থেকে শিল্প উপাদান আমদানিও করতে হয়। এ ক্ষেত্রে উভয় রাষ্ট্রই নিজেদের স্বার্থের দিক দেখার চেষ্টা করে। সেই স্বার্থ দেখেও নিজেদের শিল্প উপাদানের গুণগত মানকে উন্নত করতে হয়। না হলে জিনিস বিকবে না। অন্য দেশের সংস্থা সেই বাজার দখল করে ফেলবে। মার খাবে দেশের অর্থনীতি। কোন টেকনলজি গ্রহণ করতে পারলে বেশি উৎপাদন এবং মুনাফা হবে সেই দিকগুলির প্রতি নজর রাখতে হবে। এই জন্য প্রযুক্তি নিয়ে নিয়ত পরীক্ষা নিরীক্ষা, নিত্যনতুন টেকনলজির প্রয়োগ ঘটাতে হবে। এখানেও সমস্যা আছে। কেননা প্রযুক্তি চিরদিন কর্মসংস্থান সংকোচন করে। কিন্তু বাজার বাড়িয়ে সেই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। আইএলও-র রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বায়নের যুগে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে গেলে উৎপাদিকা শক্তি বাড়াতে হবে। এর কোনও বিকল্প পন্থা নেই বলেই মনে করা হচ্ছে।

কিন্তু কীভাবে এই উৎপাদিকা শক্তি বাড়ানো যেতে পারে? আমরা জানি ম্যানেজমেন্ট প্রথা সরকার অনুমোদিত সমিতিগুলিতে থাকলেও ব্যক্তি মালিকানা ক্ষেত্রগুলিতে প্রায়শই থাকে না। এই সমিতিগুলির দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন প্রয়োজন। বর্তমান

বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে প্রফেশনাল ম্যানেজমেন্ট ছাড়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকা খুব অসুবিধাজনক। শিল্প ক্ষেত্রের আদ্যিকালের ব্যবস্থা থেকে না বেরিয়ে আসলে এই সমস্যার সমাধান নেই। এই জন্য রাষ্ট্র এবং সেই সংস্থাকে আধুনিকতম ট্রেনিং ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে গেলে আরও বেশি কাজের ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। এই জন্য আমাদের কর্ম সংস্কৃতির পরিবর্তন প্রয়োজন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে, যেমন চীনে এখনও শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার পায় নি। সেখানে স্ট্রাইকও নিষিদ্ধ। শ্রমিকদের নিজেদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না রেখেও এক্ষেত্রে তাদের নিজেদের স্বার্থ বুঝে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে– তাদের উন্নতি নির্ভর করছে তাদের শিল্পের উন্নতির সঙ্গে। এটাকেই বলা হয় জাপানী এথিকস্। জাপানিরা জানে, শিল্পের উন্নতি মানেই শ্রমিকের উন্নতি এবং আরও চাকরি সৃষ্টি। তৃতীয়ত, ব্যাঙ্কিং প্রথাকে ঢেলে সাজাতে হবে। কেননা এই প্রথা মূলধনের যোগান দিয়ে কোনও শিল্পের উন্নতিতে যথেষ্ট পজিটিভ ভূমিকা নিতে পারে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ, চীন কিংবা পাশ্চাত্যেও দেখা যায় সেখানে ঋণ দান প্রথা সহজ সরল উদার। সেখানে আমাদের দেশে অনেক জটিল। এজন্য আমাদের দেশে বর্তমানে বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি করা দরকার। চতুর্থত, শিল্পের কাঁচামালের উপর নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা, সরকারি কর হ্রাস– এসব ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে হবে।

বিশ্বায়ন মানেই প্রতিযোগীতা। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ছাড়া আমাদের উপায় নেই। ভবিষ্যতে বরং বিশ্ববাজারে বিশ্বমানের সুবাদে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। প্রতিযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’, অর্থাৎ সবাই যেন প্রতিযোগিতায় সমভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। আর এই জন্য রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন। অযথা ট্যাক্স বসিয়ে প্রতিযোগিতাকে অসম করাটা আখেরে দেশের পক্ষেই অমঙ্গল। বিশ্বায়নের গোঁড়ার কথা– ট্যাক্স বেশি বাড়ালেই ট্যাক্সের সংগ্রহ বেশি হবে। কিন্তু কথাটা সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বরং দেশিয় শিল্পে ট্যাক্স কমিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড এ খেলা। দেশিয় শিল্পের রপ্তানি বাড়ানো,

আমদানিতে মুক্ত বাণিজ্য নীতি গ্রহণে সরকারকে ভূমিকা নিতে হবে। এই পথেই আমাদের দেশ সার্বিক উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে সক্ষম হবে।

বিশ্বায়ন আজ আর বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত কোনও শুভাকাঙ্ক্ষা নয়। তা মূলত বিশ্ব পুঁজিবাদের বিকাশের একটি স্তরে এক ধরনের প্রভুত্বের সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই বিশ্বায়নের ভিত্তি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা। ১৯৮০ ও ১৯৯০ এর দশকে সারা বিশ্বের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন দেখা যায়। উল্লেখ্য ১৯৯০ সালে সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান গর্বাচেভের ক্ষমতাচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটে। সুতরাং পশ্চিমী উদারনৈতিক ধ্যান ধারণার বিস্তার অনিবার্য হয়ে পড়ে। এরপর সারা পৃথিবী এই পশ্চিমকেই অনুসরণ করতে থাকে। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৮ এই দশ বছরের মধ্যে মতাদর্শ নির্বিশেষে দুনিয়ার প্রায় সব রাষ্ট্র নিজের প্রভাব হ্রাস করতে থাকে। ব্যক্তি মালিকানার রমরমা ঘটে। সুতরাং রাষ্ট্রের ভূমিকা ক্রমশ গ্রহণ করতে থাকে মালিক নির্ভর বিভিন্ন সংস্থা।[119] ফলত বিশ্বায়নের ফলে গোষ্ঠী, ব্যক্তি নির্বিশেষে সমাজের দুর্বল অংশ আরও দুর্বল হয়ে পড়তে থাকল।

তাই ভুবন-গ্রামের কর্তা নিঃসন্দেহে বিশ্বের পুঁজিপতি শ্রেণী। ইতিহাসের ধারায় এরাই একসময় ছিল সামন্তপ্রভু, বণিক সাম্রাজ্যবাদী এবং তারপর পুঁজিবাদী। এখন নব্য আধুনিকতাবাদী। তৃতীয় বিশ্বের প্রেক্ষিতে বিশ্বায়নকে কাল্পনিক প্রত্যয় বা সুখের আবৃত দারিদ্র্যের এক বিদেশী পণ্যদ্রব্য বলেই মনে হয়। এই বিভ্রান্তির নেপথ্যে রয়েছে পুঁজিবাদী দেশের রঙিন মোড়কে আবৃত পরিচিত অথচ স্বপ্নালু নয়া সংস্কৃতি বিজ্ঞাপনের অন্য রকম জৌলুস আকর্ষণ ও লোভের পণ্যদ্রব্য। বিরাট ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর খেলা, ম্যাডোনার গান, মাইকেল জ্যাকসনের নাচ, টাইটানিক বা জুরাসিক পার্ক-এর মতো ছবি বা কিংফিসার, কোকোকোলা বা পেপসির বিজ্ঞাপন– এই সবই বিশ্বায়নের হয়ে তৃতীয় বিশ্বকে বিশ্বায়নের গণ্ডীর মধ্যে টেনে নিতে চাইছে। বিশ্বায়ন এই পরিপ্রেক্ষিতে এক সম্মোহনী শক্তি, যার জাদুকর পুঁজিবাদী দেশ।

---

[119] চ্যাটার্জি, দেবী, ‘বিশ্বায়ন ও দলিত’, অমিয় কুমার বাগচী (সম্পাদনা), বিশ্বায়ন ভাবনা-দুর্ভাবনা, প্রথম খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৫, পৃষ্ঠা -১৩৪।

১৯৮৩ সালে ‘নিউ টাইমস’ পত্রিকায় লেখা হয় যে, বিশ্বে বিশ্বায়নের রূপালি হাতছানিতে মানুষ বিভ্রান্ত, রাজনীতি বিভ্রান্ত, অর্থনীতি বিভ্রান্ত। সেই বিশ্বেই আমরা দেখতে পাই প্রতি মিনিটে বাইশ জন শিশু মারা যায়, ৫০০ মিলিয়নের বেশি মানুষ অভুক্ত থাকে, ২ মিলিয়নের বেশি মানুষ চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, ৫০০ মিলিয়নের বেশি মানুষ বেকার, ৮০০ মিলিয়নের বেশি মানুষের বাৎসরিক গড় আয় ১৫০ ডলারের নীচে, ৯০০ মিলিয়নের বেশি মানুষ অশিক্ষিত, ২ মিলিয়নের বেশি মানুষ পানীয় জলের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ১৭৭০ সালে উন্নত ও অনুন্নত দেশের মাথাপিছু আয়ের গড় অনুপাত ১.২ : ১, যা ১৮৫০ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ২ : ১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে এই অনুপাত ছিল ১১ : ১ এবং ২০০০ সালে এই অনুপাত এসে দাঁড়িয়েছে ১৪ (+) : ১।

তৃতীয় বিশ্বের বেশ কিছু দেশে জনবিস্ফোরণ এবং দারিদ্রতা বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে অন্তরায়। জনসংখ্যা এবং জিএনপি (মোট জাতীয় উৎপাদন)-এর মধ্যেকার দূরত্ব, প্রযুক্তি, মানবিক আচার-আচরণের মধ্যেকার দূরত্ব জাতীয় গ্রাম ও বিশ্বগ্রামের মধ্যে কোনও অন্তর্বর্তীকালীন ধারাবাহিকতা সৃষ্টি করতে পারে নি। কেননা বিশ্বায়নের মতো বিষয় সব সময়ই যেসব বিষয়ের ওপর দাঁড়িয়ে গড়ে ওঠে তা হল– একক আইন সম্পৃক্ত রীতি, সমমনস্কতা, সমঅংশগ্রহণ, সমবণ্টন এবং সম সংহতির উপর। কিন্তু এই ধরনের আদর্শ বিশ্বগ্রাম গড়ে উঠতে পারে কিনা এই নিয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন। কেননা এর কয়েকটি অন্তরায় হল– ভৌগোলিক বৈষম্য, বাস্তুতান্ত্রিক অসংহতি, সাংস্কৃতিক বহুত্ব, জনসংখ্যার ভারসাম্যহীনতা, অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক বৈচিত্র্য।

তবু বিশ্বায়নকে অনিবার্য বলেই মেনে নিতে হবে। এই বৃত্তে দাঁড়িয়ে আমাদের সদর্থক পথ খুঁজে নিতে হবে। এর আলোর দিক হল- এতো একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া যা অতীতে বহু সুযোগসুবিধা দিয়েছে এবং আজও দিয়ে চলেছে। এই সম্ভাব্য বৃহত্তর সুফলগুলির ক্ষেত্রগুলিকে আমাদের আরও প্রসারিত করতে হবে। জাতীয় ব্যবস্থার সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সংস্কারসাধন, সব ধরনের ভুল ত্রুটি অতিক্রম করে বিশ্বায়নকে

আমাদের গ্রহণ করতে হবে। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সরকারি হস্তক্ষেপ, বাজার-প্রক্রিয়ার ফলাফলগুলির আরও রূপান্তর ঘটিয়ে জনহিতকর অভিমুখে হয়ে উঠতে পারে। মনে রাখতে হবে–

> “বাজার অর্থনীতি যে ফল প্রদান করে তার পরিপ্রেক্ষিতেও বাজারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে গুরুত্বহীন করে দেয় না। এই তত্ত্ব পরীক্ষালব্ধ অনুসন্ধানের মাধ্যমে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, বাজার ব্যবস্থার ফলাফল ব্যাপকভাবে শিক্ষা, রোগবিস্তার ও প্রতিরোধের বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা, ভূমিসংস্কার, ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প, উপযুক্ত আইনী সুরক্ষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সরকারি নীতির দ্বারা প্রভাবিত এবং এগুলির প্রতিটি ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ ও উদ্যোগের মাধ্যমে কাজ করতে হবে, যাতে তা স্থানীয় ও বিশ্বজনীন সম্পর্কের ফলাফলকে আমূল পরিবর্তন করতে পারে।” [120]

বিশ্বায়নের যুগে দাঁড়িয়ে বৈষম্য এবং দারিদ্র্যের বহুবিচিত্র স্তর এই পথেই ভাঙা সম্ভব বলে মনে হয়।

এই অধ্যায়ে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি পেশাগত পরিচিতির সংকটের পিছনে বিশ্বায়ন নামক তত্ত্বের ভূমিকা কতোটা তাৎপর্যপূর্ণ। এই আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমে আমি আলোচনা করার চেষ্টা করেছি বিশ্বায়ন সম্পর্কে। খুব সংক্ষিপ্ত আকারে বলা যায় বিশ্বায়ন হল, এমন একটি প্রক্রিয়া যা সমগ্র বিশ্বের মানুষকে এক সূত্রে গ্রথিত করে, যার নাম বিশ্ব সমাজ (Global Society)। এরপর বিভিন্ন তাত্ত্বিকগণ এই বিশ্বায়ন সম্পর্কে যে সংজ্ঞা ও তার বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছেন তা আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। যে বিশ্বায়ন সমাজের বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির সামগ্রিক উন্নতি ঘটাবে বলে মনে হয়েছিল, সেই বিশ্বায়ন কিভাবে সমাজের একটি শ্রেণীর মানুষের পেশার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পেশাগত পরিচিতির বিলুপ্তির পথকে মসৃণ করে তুলেছে তা আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

---

[120] সেন, অমর্ত্য, ‘বিশ্বায়ন : বিচার ও বিশ্লেষণ’, রতনতনু ঘোষ (সম্পাদিত), ‘বহুমাত্রিক বিশ্বায়ন’, কথাপ্রকাশ, তৃতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা-৩০।

এখন আমরা যদি বিশ্বায়ন সম্পর্কে আরও সম্যক ধারণা দেবার বা বোঝার চেষ্টা করি তাহলে রাষ্ট্রদর্শনে কিছু তত্ত্বের সঙ্গে পরিচয় হওয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। কাজেই পরবর্তী অধ্যায়ে আমি রাষ্ট্রতত্ত্ব বিষয়ক যে মতবাদগুলি আছে বিশেষ করে উদারনীতিতত্ত্বের সম্যক আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

চতুর্থ অধ্যায়

উদারনীতিবাদ ও তার প্রকারভেদঃ

৪.১ উদারনীতিবাদের উদ্ভব

রাষ্ট্রদর্শনের কোন তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আমরা কোনভাবেই গ্রীক রাষ্ট্রদর্শনের প্রভাব অস্বীকার করতে পারি না। ফলত আলোচনা প্রসঙ্গে প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের রাষ্ট্রতত্ত্ব বিষয়ক ভাবনা-চিন্তা আমাদের আলোচনার মধ্যে অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের ভাবনার মধ্যে উঠে এসেছিল মানুষ শুধুমাত্র সামাজিক জীব নয়, সেই সঙ্গে মানুষ হল রাজনৈতিক জীব (Man is not only rational animal, but also political.)। অর্থাৎ মানুষের মূল লক্ষ্য শুধু বেঁচে থাকা নয়, ভালোভাবে বেঁচে থাকাই হল জীবন। এই ভালোভাবে বেঁচে থাকার তাগিদে অ্যারিস্টটলের Polis বা নগর রাষ্ট্রের ভাবনা। এই নগর রাষ্ট্রের ভাবনার মধ্য দিয়েই মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজনীয় দ্রব্য ইত্যাদির যোগান একমাত্র এই রাষ্ট্রতত্ত্বের মধ্য দিয়েই হতে পারে। তাই তিনি বলেছিলেন, যে ব্যক্তি রাষ্ট্রে বসবাস করে না, সেই ব্যক্তি হয় পশু, না হয় দেবতা। কাজেই রাষ্ট্রের অধীনে বসবাসকারী সমস্ত ব্যক্তির কল্যাণ সাধনের জন্য রাষ্ট্রকে কিছু আদর্শ, পদ্ধতি এবং কিছু নীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। রাষ্ট্রের এই লক্ষ্য চরিতার্থ করার জন্য যে সমস্ত তত্ত্বের আশ্রয় নিতে হয়েছে, সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল 'উদারনীতিবাদ' বা 'উদারনৈতিকতত্ত্ব'।

রাষ্ট্রদর্শনে জনকল্যাণের জন্য আজ পর্যন্ত যে সমস্ত তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে জনপ্রিয়তার শীর্ষে যেমন উঠেছে উদারনৈতিক রাষ্ট্রতত্ত্ব, তেমনই সেই তত্ত্ব সমালোচনার ঊর্ধ্বেও উঠতে পারে নি। ইংরেজি শব্দ 'Liberalism' যার বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে আমরা ব্যবহার করি 'উদারনীতিবাদ'। যদি আমরা শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিকে লক্ষ্য রাখি তাহলে আমরা দেখব যে, এই 'Liberalism'

নামক ইংরেজি শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Liber' এর থেকে উৎপত্তি।[121] যার ইংরেজি অর্থ হল Liberty বা স্বাধীনতা। 'Liberal' শব্দটির ব্যবহার আমরা চতুর্দশ শতকে লক্ষ্য করি, যদিও তা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হত। কখনো এই 'Liber' শব্দটির অর্থ বলতে বোঝানো হতো মুক্ত মানুষের শ্রেণীকে আবার কখনো ভূমিদাসের মতো দায়বদ্ধ কৃষক বা ক্রীতদাসদের থেকে ভিন্ন এমন মানুষদেরও বোঝানো হত। আবার কখনো এই আলোচিত শব্দটির মধ্যে দিয়ে মুক্তচিন্তা বা মুক্ত মননকে বোঝানো হত। প্রসঙ্গত মুক্ত মনন বা মুক্ত চিন্তার কথা এলেই যে বিষয়টি স্বাভাবিক ভাবে উঠে আসে, তা হল স্বাধীনতা এবং নিজস্ব নির্বাচন ক্ষমতা। উৎপত্তিগত দিক থেকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখব ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে অর্থাৎ ১৮১২ সালে এই 'Liberalism' শব্দটির প্রথম প্রয়োগ ঘটে স্পেন নামক দেশে।[122] কিন্তু এই রাজনৈতিক ধারণাটি শুধুমাত্র স্পেনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ১৮৪০ সালের মধ্যেই তা ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে, তার স্বতন্ত্র্য রূপ নিয়ে। যদিও প্রাথমিক অবস্থায় উদারনীতিবাদ যে রূপে আবির্ভূত হয়েছিল তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে।

যদিও মার্কসবাদী ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দর্শনের দ্বারা উদারনীতিবাদ বারবার সমালোচিত ও নিন্দিত হয়েছে। কিন্তু তাহলেও ৩০০ বছরেরও বেশি সময়কাল ধরে এই রাষ্ট্র তত্ত্বটি বয়ে চলেছে এবং অধিকাংশ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক মতাদর্শ হিসাবে গৃহীত হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ও প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে কিছু পরিবর্তন তাকে নিয়ে আসতে হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মূল বিষয় একই রয়েছে বলে মনে হয়। সেই মূল বিষয়টি হল স্বাধীনতা। উদারনীতিবাদের (Liberalism) মূল কথাটি হল 'রাষ্ট্রের ক্ষমতা সীমিত করতে হবে এবং ব্যক্তির হাতে স্বাধীনতা দিতে হবে। রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের শাসক তার ইচ্ছামত যে কোন ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে

---

[121] Heywood, Andrew, *Political Ideologies: An Introduction*, 4th Edition, Palgrave Macmillan, New York,2007, p-23.

[122] Ibid, p-23.

না। ব্যক্তির আশা, আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য, তার জীবনের বিভিন্ন দিকের পূর্ণতা নিয়ে আসার জন্য স্বাধীনতা একান্ত অপরিহার্য। এই স্বাধীনতাই হল উদারনীতিবাদের মূল বিষয়।

উদারনৈতিক রাষ্ট্রচিন্তার প্রথম উন্মেষ ঘটেছিল প্রাচীন গ্রিসে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে পেলোপনেশিয়ান যুদ্ধের প্রাক মুহূর্তে এবং যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বিশেষ করে গ্রীসের অন্যতম নগররাষ্ট্র এথেন্সের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে। পেলোপনেশিয়ান যুদ্ধ চলাকালীন পেরিক্লেস তাঁর বিখ্যাত শোকপূর্ণ ভাষণে যে কথাগুলি বলেছিলেন, তার মধ্যে যে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেটি হল, উদার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী সমমাত্রিক নীতি। “liberal egalitarian and individualist principles.”[123] প্রাচীন গ্রিসে সোফিস্টদের মধ্যেই এই উদারনৈতিক ধারার প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল। সোফিস্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে অ্যালসিডামাস (Alcidamas) যিনি একজন অলঙ্কারশাস্ত্রের শিক্ষক ছিলেন। তিনি সগর্বে প্রকাশ করেছিলেন যে, ঈশ্বর সমস্ত মানুষকে তৈরী করেছেন সম্পূর্ণ মুক্ত মানুষ হিসাবে। আবার তিনি একইভাবে বলেছেন যে, প্রকৃতি কখনোই কোন ভাবে একজন মানুষকে দাস রূপে তৈরী করে নি।[124] সর্বোপরি সোফিস্টদের দাবি ছিল যে,

> “...It was by the Sophists that a doctrine of political equality was first developed against the esoteric and elitist conceptions of government until then current among the Greeks.”[125]

শুধু সোফিস্টরাই নয়, প্রোটাগোরাস পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম অংশগ্রহণকারী গণতন্ত্রের ধারণাও উপস্থিত করেছিলেন। G.B. Kerferd বলেন

---

[123] Gray, John, *Liberalism* 2nd Edition, World View Publication, Delhi, 1998, p-4.

[124] Ibid, p-4.

[125] Ibid, p-4.

> “Protagaras produced for the first time in human history a theoretical basis for participatory democracy the basis being Protagaras’s doctrine that all men have a share (though not the same share) in justice.”[126]

কিন্তু গ্রীক দেশের দুই দার্শনিক প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল উদারনৈতিক ধারণার বিষয়টিকে মোটেও প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেন নি, বরং তার বিরুদ্ধে তাঁদের রচনায় ভিন্ন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ

> “In the works of Plato and Aristotle, we find, not the further development of the liberal outlook of the Great Generation. But instead a reaction against it an emasculation of Greek liberalism.”[127]

গ্রীস যুগ পেরিয়ে রোমানযুগেও Liberal tradition এর গুরুত্বপূর্ণ পদধ্বনি লক্ষ্য করা যায়। রোমান অধিবাসীদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে যে নীতি গঠিত হয়েছিল তা ‘Laws of the Twelve Tables’ নামে পরিচিত। সোলোন (Solon) নামক একজন কূটনীতিজ্ঞ তিনি আইনের যে নকশা তৈরী করেছিলেন, সেখানেও ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়। রোমান আইনে পরিলক্ষিত হয় যে,

> “No privileges or statutes shall be enacted in favour of private persons, to the injury of others contrary to the law common to all citizens and which individuals, no matter of what rank, have a right to make use of.”[128]

---

[126] Kerferd, G. B, *The Sophistic Movement*, Cambridge University Press, Cambridge, 1981, p-144

[127] Gray, John, *Liberalism*, 2nd Edition, World View Publication, Delhi, 1998, pp-4-5.

[128] Ibid, p-6.

রোমান যুগের অন্যতম দার্শনিক Cicero কে F.A. Hayek আধুনিক উদারনীতিবাদের মূল পথিকৃৎ বলে বর্ণনা করেছেন।[129] Hayek মনে করেন, তাঁর কাছে সাধারন নীতির ধারণা (Leges Legume) নিয়ন্ত্রিত হয় আইন প্রণয়নের মধ্যে দিয়ে। যেখানে মূল ধারণা হল- আইনের কাছে সকল অধিবাসী নিজেদেরকে সমর্পন করবে বা অন্যভাবে বললে যে অর্থ প্রকাশিত হয় তাহল আইনকে সবাই মেনে চলবে মুক্ত মনে। মূল বক্তব্য হল যে, বিচারকের উচিৎ শুধুমাত্র আইন অনুসারে বিচার কার্যপরিচালনা করা। অর্থাৎ আইনের কথাগুলি বিচারকের মুখ দিয়ে ধ্বনিত হবে।[130]

রোমান যুগে বিভিন্ন স্টোয়িক দার্শনিকদের লেখাতেও উদারনীতিবাদের ধারণার সন্ধান পাওয়া যায়। রোমান যুগের পরবর্তী কালে মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্রের (Feudalism) উদ্ভব হয়েছিল এবং সেই সময়ে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের কোন ধারণা আসাও সম্ভব হয় নি। C. B. McPherson এর মতে,

> "In the Middle Ages one would not expect, nor does one find, any theory of democracy, or any demand for a democratic franchise: such popular unprising as flared up from time to time were not concerned about an electoral franchise, for at that time power did not generally lie in elected bodies. Where feudalism prevailed, power depended on rank, whether inherited or acquired by force of arms."[131]

মধ্যযুগে কেউ প্রত্যাশা করে নি বা কেউ লক্ষ্যও করে নি যে, গণতন্ত্রের জন্য কোন তত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছে বা গণতন্ত্রের জন্য কোন দাবি উত্থাপিত হয়েছে। শুধু কখনো

---

[129] Ibid, p-6.

[130] Hayek, F. A, *The Constitution of Liberty*, London, Routledge and Kegan Paul, 1960, p-166.

[131] McPherson, C. B, *The Life and Time of Liberal Democracy*, Oxford London New York, Oxford University Press, 1977, p-13.

কখনো কিছু জনগণের অভ্যুত্থান ঘটেছে। যেমন- ১৩৫৮ সালে প্যারিসের জেকূরী (Jacquerie) নামক কৃষক অভ্যুত্থান কিংস্বা ১৩৭৮ সালে ফ্লোরেন্সে Ciompi নামক যে বিদ্রোহের অভ্যূত্থান ঘটেছিল তার কথা উল্লেখ করা যায়, ফ্লোরেন্সে প্রজাতন্ত্রে এই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল মূলত কৃষক, শ্রমিক এবং কারিগরদের নিয়ে। ইংল্যান্ডেও ১৩৮১ সালে কৃষকদের কৃষক বিদ্রোহ লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু এই সমস্ত বিদ্রোহের ও অভ্যুত্থানের মূল বিষয় ছিল একটি বিশেষ গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলা নয়। বরং এই বিদ্রোহগুলি সমাজে একটি শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। যেমন- ১৩৮১ সালের কৃষক বিদ্রোহের একমাত্র নেতা জন বল এর উক্তিতে লক্ষ্য করা যায়, “ইংল্যান্ডে যতক্ষন পর্যন্ত না সমস্ত দ্রব্য সকলের মধ্যে সমানভাবে অধিকারে আসবে, যতক্ষন পর্যন্ত দাস (Serfs) এবং ভদ্রলোকদের (Gentlemen) মধ্যে পার্থক্য থাকবে ততক্ষন পর্যন্ত ইংল্যান্ডে ভালো কিছু হবে না। যখন আমরা সকলেই সমান হবো অথবা একটা সমতা ভিত্তিক সমাজ তৈরী হবে, যেখানে সমস্ত মানুষের সম্পত্তির উপর সমান অধিকার থাকবে না, ততক্ষন পর্যন্ত ইংল্যান্ডের ভালো হতে পারে না। কিন্তু এই সমস্ত বক্তব্যগুলি কোন সুশৃঙ্খলিত তত্ত্বগড়ে তুলতে পারে নি বা কোন গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার ইঙ্গিত বহন করে নি।”

আবার আমরা যদি ষোড়শ শতাব্দীর পশ্চিম ইউরোপের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো যে, সেখানেও উদারনীতিবাদের একটা রূপ প্রকাশিত হচ্ছে ভিন্নভাবে; বিশেষত ধর্মসংস্কার আন্দোলন (Reformation Movement) এর মধ্য দিয়ে, যেখানে জাতিগত ঐক্যের বিরোধীতা করে একটি সর্বজনস্বীকৃত, সর্বসাধারণের সম-অধিকারের দাবি তোলা হয়েছে।

পশ্চিম ইউরোপে সংস্কার আন্দোলনের (১৫১৭-৬৩) সময় থেকে একটি নতুন শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে, এরা মূলত ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমেই ধনসম্পত্তি অর্জন করেছিল। এই শ্রেণীই ক্রমশ রাজনৈতিক ক্ষমতা দাবি করতে থাকে। জমির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল অনেকটাই স্থবির। উদ্ভূত নতুন শ্রেণীর কাছে এই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মধ্যযুগে ইউরোপে সামাজিক শ্রেণী

কাঠামোর দিকে যদি লক্ষ্য করা যায়, তাহলে দেখা যাবে সেখানে মূলত তিনটি শ্রেণী ছিল, যাদের মধ্যে প্রধান- জমির মালিক অভিজাত শ্রেণী, যাজক শ্রেণী ও যোদ্ধা শ্রেণী। ষোড়শ শতাব্দীতে এই শ্রেণীগুলির প্রভাব ধীরে ধীরে খর্ব হতে থাকে এবং নতুনভাবে যে শ্রেণীগুলি জন্ম লাভ করে, সেগুলি হল পুঁজির মালিক, ব্যবসায়ী শ্রেণী এবং শিল্প উৎপাদনকারী শ্রেণী। ধীরে ধীরে মানুষের চিন্তার রাজ্যেও পরিবর্তন আসে যে, ঈশ্বর নয়, মানুষই শক্তির আধার। আবার ধীরে ধীরে বিজ্ঞান সম্মত চিন্তা-ভাবনা প্রসার লাভ করে, এইভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এক নতুন শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে যা বুর্জোয়া শ্রেণী নামে পরিচিত। এই বুর্জোয়া শ্রেণীরই রাজনৈতিক মতাদর্শে উদারনৈতিক চিন্তা-ভাবনা প্রতিফলিত হয়।

৪.২ সাবেকী উদারনীতিবাদ (Classical Liberalism):

উদারনৈতিক মতবাদের বিকাশ সুশৃঙ্খলিতভাবে লক্ষ্য করা যায়, সপ্তদশ শতাব্দীতে টমাস হবস্ এর (১৫৮৮-১৬৭৯) লেখায়। তিনিই প্রথম মানুষের মধ্যে উদারনৈতিক ধ্যান-ধারণা উপস্থাপিত করেন। এই কারণেই লিয়ো স্ট্রস (Leo Strauss) হবসকে (Hobbes) উদারনৈতিক চিন্তার জনক বলে অভিহিত করেছেন।[132]

শুধু হবস্ নয়, হবসের পূর্ববর্তী বহুতাত্ত্বিক ধর্মসংস্কার আন্দোলন ও নবজাগরণের থেকে যাদের উদ্ভব ঘটেছে। তাঁরা সকলেই উদারনীতিবাদী দর্শন গড়ে তোলার জন্য এক অনন্য ভূমিকা নিয়েছেন। যেমন- মেকিয়াভেলি (১৪৬৭-১৫২৭), মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬), কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩), জন ক্যালভিন (১৫০৯-১৫৬৪), ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৮) ইত্যাদি।

হবসকে Liberalism এর অন্যতম প্রধান এবং প্রথম প্রবক্তা বলে লিও স্ট্রস (Leo Strauss) যে ব্যাখ্যা করেছেন, তার মূলে রয়েছে আপোষহীন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Uncompromising Individualism) এর প্রতি আস্থা। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি

---

[132] Gray, John, *Liberalism*, 2nd Edition, World View Publication, Delhi, 1998, p-10.

প্রকৃতি রাজ্যে সমস্ত মানুষের সম-স্বাধীনতার ধারণায় বিশ্বাস করতেন এবং তিনি কখনোই রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে উত্তরাধিকার সূত্রে স্থাপন করতে চান নি। হবস্ই প্রথম প্লেটো, অ্যারিস্টটলের সমাজ দর্শন ও মধ্যযুগীয় খ্রিষ্টীয় মতবাদ থেকে যে সমাজদর্শনের উদ্ভব হয়েছিল তাকে বর্জন করেছিলেন।[133] তিনিই প্রথম রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে, রাজনৈতিক কলাকৌশলের মধ্য দিয়ে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতি রাজ্যের অশুভ (Evil) বিষয়কে দূর করতে চেয়েছেন। তাঁর কাছে মৌলিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের ধারণাটির উদ্ভব হয়েছিল মানুষের ধারণা থেকে। Michael Oakeshott হবস্ সম্পর্কে বলেছেন, অনেক ঘোষিত উদারনীতিবাদীদের চেয়ে তাঁর মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী নৈতিকতা ও উদারনীতিবাদের উদ্দীপনা (Spirit) অনেক স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ

> "He observes that Hobbes expresses the morality of individuality and has in him more of the spirit of liberalism than many avowed liberals."[134]

আবার C.B. MacPherson হবস্ কে আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের প্রখ্যাত ও প্রথম প্রবক্তা বলে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ

> "Hobbes as the first and most distinguished spokesman for modern individualism." [135]

হবস্ এর মতো Benedict de Spinoza (১৬৩২-৭৭) কেও উদারনীতিবাদের অন্যতম পথিকৃৎ বলে বর্ণনা করা যায়। জন গ্রে (John Gray) বলেছেন হবসের চেয়েও Spinoza উদারনীতিবাদী ঐতিহ্যের অনেক কাছাকাছি অবস্থান করে। হবস্ এবং স্পিনোজা দুজনেই অ্যারিস্টটলীয় ও খ্রিস্টীয় ঐতিহ্যকে বর্জন করেছেন। কিন্তু হবস

---

[133] Ibid, p-11.

[134] Michael, Oakeshott, *Hobbes on Civil Association,* Oxford, Basil Blackwell, 1975, p-63.

[135] Gray, John*, Liberalism*, 2nd Edition, World View Publication, Delhi, 1998, p-10.

ব্যক্তির স্বাধীনতা বলতে বুঝিয়েছেন, তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা পূরণের পথে বাধার অনুপস্থিতি। কিন্তু স্পিনোজার কাছে ব্যক্তির স্বাধীনতা হলো মূল্যবোধযুক্ত লক্ষ্য এবং এই কারনে ব্যক্তির নিজস্ব ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য তার প্রয়োজন স্বাধীনতা। স্পিনোজা ব্যক্তিস্বাধীনতাকে একটি প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ হিসাবে দেখেছেন। স্পিনোজা বলেছেন এই স্বাধীনতাকে অর্জন করতে হলে দরকার হল সুনিশ্চিত গণতন্ত্র, যেখানে থাকবে ব্যক্তির চিন্তার স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংঘ গঠনের স্বাধীনতা। অপরদিকে হবস্‌ও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে পেতে চেয়েছেন Authoritarian Government এর মধ্যে দিয়ে।[136] অর্থাৎ তিনি জনগণের সার্বভৌমের সীমাহীন অধিকারকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছেন।

উদারনীতিক রাষ্ট্রচিন্তা দুটি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রথম রূপ পায় সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে। পিউরিটান বিপ্লব (১৬৪৯-৫১) এবং ১৬৮৮ সালের গৌরবময় বিপ্লবের মাধ্যমে উদারনৈতিক রাষ্ট্রচিন্তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। C. B. MacPherson বলেছেন সেই সময়ে সামাজিক মনোভাব ছিল গণতান্ত্রিক চিন্তাধারায় পরিপূর্ণ। তাঁর ভাষায় “Rife With Democratic Ideas.”[137] ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে ইউরোপে যে ধনিক শ্রেণীর আবির্ভাব হয়, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দেন জন লক। জন লক ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লবকে সমর্থন জানান। গৌরবময় বিপ্লবে হুইগদের অভ্যুত্থানকে লক সমর্থন করেন। তাঁর ‘Second Treatise on Civil Government’ (১৬৯০) গ্রন্থে তিনি পার্লামেন্টের প্রাধান্যকে প্রতিষ্ঠা, সাংবিধানিক সরকারকে স্বীকৃতি দান, রাজতন্ত্রের অবাধ ক্ষমতা সীমিত করা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে উদারনীতিবাদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন।[138]

---

[136] Gray, John, *Liberalism*, 2nd Edition, World View Publication, Delhi, 1998, p-11.

[137] McPherson, C. B, *The Life and Time of Liberal Democracy*, Oxford London New York, Oxford University Press, 1977, p-14.

[138] Gray, John, *Liberalism*, 2nd Edition, World View Publication, Delhi, 1998, p-13.

শুধু তাই নয় স্বাভাবিক অধিকারের ভিত্তিকেও তিনি স্থাপন করেছেন। জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার এবং সম্পত্তির অধিকারকে প্রাকৃতিক অধিকার বলে বর্ণনা করে তিনি এই তিনটি অধিকারকে রক্ষা করা রাজার কর্তব্য বলে বর্ণনা করেছেন। এই তিনটি অধিকার রক্ষার স্বার্থেই জনগণ রাজার হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল। তাই এই অধিকার রক্ষায় যদি রাজা ব্যর্থ হন, তাহলে জনগণের অধিকার আছে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার। এইভাবে লক দেখিয়েছেন রাষ্ট্র জনগণের সম্মতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই জনসম্মতি প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের (Representative Democracy) মূল বক্তব্য।[139] অর্থাৎ

> "An essential presupposition of representative government as it developed after Locke had written, essential to such things as virtual representation, which he implies at all points, and the rule of parties, which he never contemplated. It sanctions the 'right of a group of leaders to take revolutionary action, and it is always behind an individual acting alone in a political situation, a judge, a king, or a Speaker."

এরই পাশাপাশি লক ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকেও সমর্থন জানিয়েছেন। লক বুঝেছিলেন রাজা, অভিজাত ভূস্বামী ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষার জন্য ভারসাম্য প্রয়োজন।

এইভাবে সামন্তশ্রেণীর স্বার্থ এবং রাজার স্বেচ্ছাচার ও ক্ষমতালিপ্সা উভয়কেই নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং তার পাশাপাশি আইনের অনুশাসনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপরিচালনার বিষয়টি সংসদীয় গণতন্ত্রের গোড়াপত্তন করে। যা উদারনৈতিক রাষ্ট্রদর্শনের ভিত্তি গড়ে তোলে। লকের পরবর্তীকালে ধ্রুপদী উদারনৈতিক (Classical Liberal Theory) রাষ্ট্রতত্ত্ব ফ্রান্সে প্রকাশিত হতে দেখা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ফরাসি দার্শনিক মন্তেস্কুর হাত ধরে। রাজার ক্ষমতাকে

---

[139] Laslett, Peter, *John Locke's Two Treatises Of Government: A* critical Edition With Introduction and Notes, Cambridge University Press, 1963, p-109.

সীমিত করে, রাজার যথেচ্ছ অত্যাচারিতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষে জোর দিয়ে 'ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণের নীতিকে' অর্থাৎ 'Theory of Separation of Power'কে তিনি রাষ্ট্রদর্শনে প্রতিষ্ঠা করেন।

জার্মানিতেও উদারনৈতিক রাষ্ট্রতত্ত্বের দার্শনিকরূপ লক্ষ্য করা যায় ইমানুয়েল কান্টের রচনায়। কান্টের মতে ব্যক্তি হল একটি নৈতিক সত্তা। স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার ব্যক্তির নৈতিক জীবন বিকাশের জন্যই প্রয়োজন। তাঁর মতে ব্যক্তি মানুষ স্বাধীন এবং বুদ্ধিমান, সেই কারণেই একমাত্র উদারনৈতিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে তিনি অপরিহার্য বলে মনে করেছেন।[140] আইনের অনুশাসনের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা সম্পন্ন রাষ্ট্রের মধ্যেই ব্যক্তি তার স্বাধীনতা লাভ করতে পারে বলে কান্ট বিশ্বাস করতেন। কান্টের পর জার্মানিতে ভিলহেলম ফণ হুমবোল্ডট (Wilhelm Von Humboldt) (১৭৬৭-১৮৩৫) রাষ্ট্রতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর ধারণা তুলে ধরেন 'Ideas for an Attempt to Determine the Limits of the Activity of the State' গ্রন্থটিতে। তিনি বলেছেন শিক্ষাব্যবস্থা ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে না। রাষ্ট্রের আইন, আইনের মাধ্যমে শুধু ব্যক্তির নিরাপত্তা প্রদান করবে। তিনি আরও বলেন স্বাধীনতা না থাকলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব নয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্কটিশ এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অ্যাডাম ফার্গুসন (Adam Ferguson) (১৭২৩-১৮১৬) এবং ডেভিড হিউম (১৭১১-৭৬)। ফার্গুসন তাঁর 'An Essay on the History of Civil Society' (১৭৬৭) গ্রন্থে স্বেচ্ছাচারী ও সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিপরীত ধর্মী ধারণা হিসাবে নাগরিক সমাজের (Civil Society) ধারণাকে উপস্থাপিত করেছেন। তিনি মনে করেন ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী উদারনীতিক রাষ্ট্রব্যবস্থা অনেক বেশি প্রগতিশীল। অপরদিকে হিউম সীমিত ক্ষমতা সম্পন্ন রাষ্ট্রের যে উদারনৈতিক ধারা রয়েছে তাকে জোরালো সমর্থন জানান।

---

[140] Bhargava, Rajeev, Acharya, Ashok (Edit.), *Political Theory An Introduction*, Pearson, 2008, p-239.

তিনি মনে করেন মানব সমাজের অগ্রগতি তিনটি স্তর পরিক্রমার[141] মধ্য দিয়েই ঘটে, এর শেষতম স্তর হল ব্যক্তির স্বাধীনউদ্যোগ। এই ব্যক্তিউদ্যোগের মধ্য দিয়েই ব্যক্তির সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে ওঠে।এছাড়াও তিনি ব্যক্তির প্রাকৃতিক স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব দেন। এইদিক থেকে দেখলে উদারনৈতিক মতবাদে হিউমের অবদানও কিছু কম নয়।

অ্যাডাম স্মিথ উদারনৈতিক রাষ্ট্রের ধ্যান-ধারণাকে সমর্থন করেছেন। তিনি তাঁর "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations" গ্রন্থে দেখিয়েছেন মনুষ্য সমাজ কতকগুলি নির্দিষ্ট পর্যায় অথবা ব্যবস্থা অতিক্রম করে বিকশিত হয়ে চলেছে এবং তার অন্তিম পর্যায়ে রয়েছে Commercial or Free Enterprise System, স্মিথ আরো দেখিয়েছেন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন হাত ধরাধরি করে চলে। এইভাবেই বাণিজ্যিক স্বাধীনতা তখনই নিশ্চিত হয়, যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে পৌঢ় এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। স্মিথ এর দৃষ্টিভঙ্গি ইংল্যান্ডের উদারনৈতিক চিন্তাধারায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, যতদিন না পর্যন্ত বেন্থামীয় দার্শনিক বিপ্লববাদ উপস্থিত হয়েছিল।[142]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে এসে দেখা যায় একমাত্র ইংল্যান্ডই গোটা বিশ্বের মধ্যে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মতবাদ হিসাবে উদারনীতিবাদ একইসঙ্গে জাতীয় দর্শন ও জাতীয় নীতি হিসেবে জনগণের সার্বিক সমর্থন পায়। ঠিক এই সময় জেরেমি বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২) "An Introduction to the Principles of Morals and Legislation" গ্রন্থে উপযোগবাদ তত্ত্বের প্রচার করেন। বেন্থাম এই হিতবাদী দর্শনে দেখিয়েছেন 'প্রকৃতি মানুষকে সুখ ও দুঃখ এই দুই সার্বভৌম নিয়ন্তার শাসনে রেখেছে, এই সুখ এবং দুঃখই ঠিক করে দেয় আমরা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো, আমরা কোন পথে চলবো। ব্যক্তির প্রধান লক্ষ্য হল, কি করে আনন্দ বাড়ানো যায় এবং কিভাবে

---

[141] Gray, John, *Liberalism*, 2nd Edition, World View Publication, Delhi, 1998, p-24.

[142] Ibid, p-25.

দুঃখ বা বেদনাকে পরিত্যাগ করা যায়। এই নিয়ম সর্বত্র অপরিবর্তনীয়। তিনি বলেছেন- উপযোগিতাকে ব্যাখ্যা করতে হবে আনন্দ বৃদ্ধি পাচ্ছে কিসে, তার উপর ভিত্তি করে। বেন্থাম মনে করেন এই সূত্র কেবল ব্যক্তির কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তা প্রযোজ্য সরকারেরও প্রতিকাজের ক্ষেত্রে”।[143] বেন্থাম সুখ ও দুঃখকে পরিমাপযোগ্য বলে মনে করেন, তা নির্ভর করে সাতটি অবস্থার উপর। সেগুলি হল- ১) তীব্রতা, ২) স্থায়ীত্ব, ৩) নিশ্চয়তা বা অনিশ্চয়তা, ৪) নৈকট্য বা দূরত্ব, ৫) উর্বরতা, ৬) অ-কৃত্রিমতা এবং ৭) ব্যাপ্তি।[144]অর্থাৎ

> “1. Its intensity, 2. Its duration, 3. Its certainty or uncertainty, 4. Its propinquity or remoteness, 5. Its fecundity, 6. Its purity and 7. Its extent.”

বেন্থাম মনে করেন সর্বাধিক ব্যক্তির সর্বাধিক সুখ উৎপাদনই হল সমাজের অন্তিম লক্ষ্য। বেন্থামের এই উপযোগবাদী দর্শনের অন্যতম সহযোগী ছিলেন জে মিল (১৭৭২-১৮৩৬)। বেন্থামের উপযোগবাদ সমাজ পুনর্গঠনে সরকারি হস্তক্ষেপ সমর্থন করেন। যার ফলে ইংল্যান্ডে ক্যাথলিক ইমানসিপেশন আইন (১৮২৯), সংস্কার আইন (১৮৩২) এবং পূর্বের শস্য আইন বাতিল করে মুক্ত বাণিজ্যের পক্ষে আইন ১৮৪৬ সালে প্রণীত হয়, যা ধ্রুপদী উদারনৈতিক রাষ্ট্রতত্ত্বের সূচনা বলা যেতে পারে। ‘The Anti-Corn Law League’ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ইংল্যান্ডে। সেই সময় ইংল্যান্ডে প্রচলিত শস্য আইনকে বাতিল করার উদ্দেশ্যেই এই লিগের মধ্যে Richard Cobden এবং John Bright এর নেতৃত্বে মুক্তবাণিজ্যের সমর্থনে জোরালো আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং তাতে যোগ দেয় ইংল্যান্ডের তৎকালীন সময়ের Liberal এবং Radical গোষ্ঠী। এরা জনগণের ওপর কর হ্রাস পাবে এবং রাষ্ট্রের উপর আর্থিক বোঝা হ্রাস পাবে বলে দাবি করেন,

---

[143] Vijayaraghavan, S and Jayaram, R, *Political Thought,* Sterling Publisher Private Limited, New Delhi-110029, 1981, p-144.

[144] Bentham, Jeremy, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Batoche Books Kitchener, 2000, p-32.

যদি সামরিক খাতে জনগণের কাছথেকে জোর করে শস্যকর সংগ্রহ করার বিষয়টিকে তুলে দেওয়া হয়। কোবডেন (Cobden) এবং ব্রাইট (Bright) এর এই বক্তব্যকে কার্যে রুপায়িত করেন ইংল্যান্ডের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী W.E. Gladstone.[145]

ধ্রুপদী বা সনাতনী বা সাবেকী উদারনীতিবাদের বৈশিষ্ট্যঃ

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি যে, সাবেকী উদারনীতিবাদের মূল বক্তব্য হল জনসাধারণের জীবনধারায় রাষ্ট্র যথাসম্ভব কম হস্তক্ষেপ করবে। বস্তুত সাবেকী উদারনীতিবাদ সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারী শাসন ও বিধি নিষেধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে জন লক এর হাত ধরে প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়াও জেরেমি বেন্থাম, জেমস মিল, জন স্টুয়ার্ট মিল, মন্তেস্কু ও স্পেন্সার প্রমুখ হলেন এই ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের মুখ্য প্রবর্তক। কাজেই সাবেকি উদারনীতিবাদের যে বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া যায় সেগুলি নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল-

পৌর স্বাধীনতা বা Civil Liberty- সাবেকী উদারনীতিবাদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এক চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের প্রতি বিশ্বাস। সাবেকী উদারনীতিবাদে ব্যক্তি এক আত্মবিকাশীল, যুক্তিবাদী, স্বার্থসচেতন এবং সেইসঙ্গে আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তি। এই ধরনের ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী থাকাটা অবশ্যম্ভাবী এইপ্রকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে C. B. MacPherson ‘Possessive Individualism’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। এই মতবাদ অনুসারে কোন ব্যক্তি বা শ্রেণী নিজের বা নিজেদের একক ইচ্ছা অনুসারে সরকারকে পরিচালনা করতে পারবে না। সরকারের মূল ভিত্তি হবে আইন। আর এই আইনের শাসনকে কোনভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। কারণ আইনের শাসনকে অস্বীকার করার অর্থই হল স্বেচ্ছাচার প্রতিষ্ঠা করা। তাই একমাত্র আইনের মাধ্যমেই স্বাধীনতা সংরক্ষিত হতে পারে।

---

[145] Gray, John, *Liberalism*, 2nd Edition, World View Publication, Delhi, 1998, p-27.

> "....the first condition of free government is government not by the arbitrary determination of the ruler, but by fixed rules of law, to which the ruler himself is subject. We draw the important inference that there is no essential antithesis between liberty and law. On the contrary, law is essential to liberty. Law, of course, restrains the individual; it is therefore opposed to his liberty at a given moment and in a given direction. But, equally, law restrains others from doing with him as they will." [146]

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা Personal Liberty- সাবেকী উদারনীতিবাদের প্রবক্তাগণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে এক চরম ও অনিয়ন্ত্রিত বলে গণ্য করেছেন। এই অধিকার ব্যক্তি তার জন্মসূত্রে অর্জন করে, তাই তা নিয়ন্ত্রণের অধিকার অপর কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের থাকতে পারে না। সুতরাং রাষ্ট্রের কাজ হবে এই স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক অধিকারগুলিকে রক্ষা করা। যেমন, লকের মতে এই প্রাকৃতিক অধিকার গুলি হল-জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার।

> "There are natural rights, though, which Locke usually referred to as life, liberty and property."[147]

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বা Economic Liberty- সাবিকী উদারনীতিবাদ অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই সময়কালে যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দাবি করা হয়, তাহল সামন্তশ্রেণীর বিভিন্ন রকম বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধে উদীয়মান মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বাধীনতার দাবি। সাবেকি উদারনীতিবাদে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবাধ অধিকারকেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলে অভিহিত করে। এক্ষেত্রে কোনরূপ নিয়ন্ত্রণের অর্থই হল অর্থনীতির স্বাভাবিক বিকাশকে বা ব্যক্তির

---

[146] Hobhouse, Leonard Trelawny, *Liberalism*, Batoche Books, 1998, p-12.

[147] Ball, Terence, *Ideals and Ideologies a Reader*, Pearson, New York, p-55.

উদ্যমকে বিঘ্নিত করা। তাই সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানাও সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন দেখা দেয়। সুতরং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপর কোনরূপ রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়।

> "Liberal sympathies have come not merely to accept but eagerly to advance the extension of public control in the industrial sphere, and of collective responsibility in the matter of the education"[148]

রাজস্ব বিষয়ক স্বাধীনতা বা Fiscal Liberty- সনাতন উদারনীতিবাদের অপর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল রাজস্ব বিষয়ক স্বাধীনতা। সাবেকী উদারনীতিবাদীগণ তৎকালীন মধ্যবিত্তশ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষা এবং সমৃদ্ধির জন্য রাজস্ব বিষয়ক স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। রাজস্বের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যেন তার নিজের ইচ্ছামত কর ধার্য করতে না পারে। কারণ রাষ্ট্র নিজের ইচ্ছামতো কর ধার্য করার অনিবার্য পরিণতি অবাধ বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কলাপের উন্নতি বা প্রগতির পথে বাধা। তাই এর জন্য প্রয়োজন ছিল স্বেচ্ছাচারী শাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করা। তাই মধ্যবিত্ত শ্রেণী দাবি তোলে প্রতিনিধিত্ব ছাড়া কর ধার্য করা যাবে না।

> "taxation must, in the nature of the case, be adjustable. It is a matter, properly considered, for the Executive rather than the Legislature. Hence the liberty of the subject in fiscal matters means the restraint of the Executive, not merely by established and written laws, but by a more direct and constant supervision. It means, in a word, responsible government, and that is why we have more often heard the cry, "No taxation without representation," than the cry, "No

---

[148] Hobhouse, Leonard Trelawny, *Liberalism*, Batoche Books, 1998, p-17.

> legislation without representation." Hence, from the seventeenth century onwards, fiscal liberty was seen to involve what is called political liberty." [149]

সামাজিক স্বাধীনতা বা Social Liberty- সাবেকী উদারনীতিবাদে সামাজিক স্বাধীনতার উপরও গুরুত্ব আরোপ করতে দেখা যায়। এর অর্থ হল সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। সামন্তযুগের সমাজ জীবনে যে কৃত্রিম সামাজিক স্তর বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়, তারই বিরুদ্ধে সাবেকী উদারনীতিবাদ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আর সামাজিক স্বাধীনতা বলতে বোঝায় সমাজজীবনে সকলের জন্য সমান অধিকার এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নিয়মনীতিকে প্রচলন করা। তাই সাবেকী উদারনৈতিক দার্শনিকগণ মনে করতেন যে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তিই সমানমর্যাদা সম্পন্ন। জন্মসূত্রে তারা সবাই সমান। তাই প্রতিটি ব্যক্তির জন্য সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং আত্মঅনুসন্ধান ও আত্মবিকাশের সমান সুযোগ-সুবিধা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।

> "Liberalism has had to deal with those restraints on the, individual which flow from the hierarchic organization of society, and reserve certain offices, certain forms of occupation, and perhaps the right or at least the opportunity of education generally, to people of a certain rank or class. In its more extreme form this is a caste system, and its restrictions are religious or legal as well as social."[150]

পারিবারিক স্বাধীনতা বা Domestic Liberty- সনাতন উদারনীতিবাদীগণ পারিবারিক জীবনে স্বাধীনতাকেও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজে পুরুষের সঙ্গে নারীর সমান অধিকার স্বীকার করা হয়। এছাড়া সম্পত্তি, এমনকি

---

[149] Ibid, p-12-13.

[150] Ibid, p-15.

বিবাহের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়েরই পছন্দের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ থাকা কাম্য বলে মনে করা হয়। এমনকি সনাতন উদারনীতিবাদীগণ মনে করতেন শিশুদের শিক্ষাদান, নারী মুক্তি, নিষ্ঠুরতা এবং শোষণ থেকে রক্ষা করাও এই নীতির অঙ্গ হিসাবে গণ্যকরা হয়ে থাকে।

> "The authoritarian state was reflected in the authoritarian family, in which the husband was within wide limits absolute lord of the person and property of wife and children. The movement of liberation consists (1) in rendering the wife a fully responsible individual, capable of holding property, suing and being sued, conducting business on her own account, and enjoying full personal protection against her husband; (2) in establishing marriage as far as the law is concerned on a purely contractual basis, and leaving the sacramental aspect of marriage to the ordinances of the religion professed by the parties; (3) in securing the physical, mental, and moral care of the children, partly by imposing definite responsibilities on the parents and punishing them for neglect, partly by elaborating a public system of education and of hygiene. The first two movements are sufficiently typical cases of the interdependence of liberty and equality."[151]

আন্তর্জাতিক স্বাধীনতা বা International Liberty- সনাতন উদারনীতিবাদ আন্তর্জাতিক স্বাধীনতার পক্ষেও সওয়াল করতে দেখা যায়। এছাড়াও যুদ্ধের বিরোধিতা করে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হওয়া, বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতার বন্ধন বিস্তার করা, জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার স্বীকার করা ইত্যাদি আন্তর্জাতিক স্বাধীনতার

---

[151] Ibid, p-18-19.

অন্তর্ভুক্ত। এইরূপ স্বাধীনতার তত্ত্ব প্রচার করার মূল উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধকালীন সময়ে পুঁজিপতিদের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী যাতে এক দেশ থেকে অন্য দেশে পাঠানো সম্ভব না হয়। যার ফলে পুঁজিবাদীদের বিকাশের পথ স্বাভাবিকভাবেই রুদ্ধ হয়ে যাবে। তাই পুঁজিবাদ তথা উদারনীতিবাদ তার বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও সহযোগিতার তত্ত্ব প্রচার করেছিল।

> "It is of the essence of Liberalism to oppose the use of force, the basis of all tyranny. (2) It is one of its practical necessities to withstand the tyranny of armaments. Not only may the military force be directly turned against liberty."[152]

প্রশাসনিক, ভৌগোলিক ও জাতিগত স্বাধীনতা বা Administrative, Geographical and Racial and National Liberty- উদারনীতিবাদীগণ প্রশাসনিক, ভৌগোলিক ও জাতিগত এবং জাতীয় স্বাধীনতাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, আঞ্চলিক ও প্রশাসনিক স্বতন্ত্রতাই হল এইসকল নীতির মূল উদ্দেশ্য। অবশ্য সাধারণভাবে জাতির নিয়ন্ত্রণের এবং স্বাতন্ত্রের দাবি স্বীকার করলেও পশ্চিমী উদারনীতিবাদের সমর্থকগণ সকল ক্ষেত্রে তাঁদের নিজ নিজ রাষ্ট্রের অধীন উপনিবেশগুলির স্বাধিকার সংগ্রাম সমর্থন করতে পারেন নি। প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদের বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অবস্থা তাঁরা কামনা করেন নি।

> "Where a weaker nation incorporated with a larger or stronger one can be governed by ordinary law applicable to both parties to the union, and fulfilling all the ordinary principles of liberty, the arrangement may be the best for both parties. But where this system fails, where the government is constantly forced to resort to exceptional legislation or perhaps to de-liberalize its own institutions, the

---

[152] Ibid, p-21.

> case becomes urgent. Under such conditions the most liberally-minded democracy is maintaining a system which must undermine its own principles.”[153]

৪.৩ আধুনিক উদারনীতিবাদ (Modern Liberalism):

উদারনৈতিক রাষ্ট্রদর্শনের জয়যাত্রার আরো অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় জেমস মিলের পুত্র জন স্টুয়ার্ট মিলের রচনায়। ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত ‘On Liberty’এবং ১৮৬১ সালে প্রকাশিত ‘Considerations on Representative Government.’ গ্রন্থদুটি জন স্টুয়ার্ট মিলের বিখ্যাত গ্রন্থ হলেও ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত ‘Utilitarianism’ জনমানসে বেশী প্রাধান্য পায়। এই গ্রন্থে তিনি দেখালেন ‘সুখের গুণগত এবং পরিমাণগত বিচারের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। তাই যথার্থ মানুষ এবং পরিশীলিত মানুষ কখনোই যেকোন সুখের পিছনে ধাবিত হবে না। ফলত মানুষ সুখ লাভের আগে যে উৎস থেকে সুখ উৎসারিত হচ্ছে, সেই উৎসটিকে মানুষ নৈতিক মানদণ্ডে বিচার করবে। আমরা জানি মিলের হিতবাদ নৈতিকতাকে বেশী প্রাধান্য দিয়েছে। তিনি তাঁর ‘On Liberty’ গ্রন্থে বলেছেন “সমস্ত নৈতিক প্রশ্নে আমি উপযোগিতাকে শেষ কথা বলে মনে করি, তবে এই উপযোগিতাকে আমি বৃহত্তর অর্থে গ্রহণ করছি, যার অর্থ হল প্রগতিশীল প্রাণী হিসাবে স্থায়ী স্বার্থরক্ষা।”[154]

মিল তাঁর ‘Principles of Political Economy’ (১৮৪৮) গ্রন্থে অর্থনৈতিক জীবনে উৎপাদন ও বণ্টনের মধ্যে পার্থক্য করেছেন এবং একইসঙ্গে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক নীতি ত্যাগ করার কথা বলেন। তিনি মনে করেন সমাজে উৎপাদিত সম্পদ কিভাবে বন্টিত হবে তা সমাজকেই গণতান্ত্রিক পথে স্থির করতে হবে। সে জন্য তিনি সামাজিক ব্যবস্থা অনুমোদন করেন। এখানেই তিনি Classical Liberalism থেকে অনেকটাই সরে এসেছেন। তাঁর এই মতবাদের সঙ্গে অনেকটা মিল দেখতে পাওয়া যায় ইংল্যান্ডের ফেভিয়ান সোসালিস্টদের তত্ত্বে। উদারনীতিক রাষ্ট্রতত্ত্বে মিলের

---

[153] Ibid, p-20.

[154] Ibid, p-29.

অন্য আরেকটি অবদান হল- সংখ্যাগুরুর স্বেচ্ছাচার সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া। এপ্রসঙ্গে মিল তাঁর ‘On Liberty’ গ্রন্থে বলেছেন-

> “Mankind are greater gains by suffering each other to live as seems good to themselves, then by compelling each to live as seems good to the rest.”[155]

এই উক্তির মধ্য দিয়ে একথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মিল সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্বের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন, যা বর্তমানকালের উদারনৈতিক গণতন্ত্রে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাই বলা যায় উদারনীতিবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে মিলের অবদান অন্য অনেককে অতিক্রম করে গেছে। হবহাউস মনে করেন, মিলের শিক্ষা পদ্ধতি আমাদেরকে উদারনীতিবাদের খুব কাছাকাছি পৌঁছে দেয়। কারণ তিনি মনে করেন, স্বাধীনতা মানে শুধুমাত্র আইন দ্বারা অনুমোদিত বিধি নয়, আবার তা শুধুমাত্র আইনের সীমাবদ্ধতাকেও প্রকাশ করে না। সেখানে অভ্যাস বা প্রথা, মতামত পরিস্থিতি ইত্যাদি সংক্রান্ত ক্ষমতার অপব্যবহার থাকতে পারে। স্বাধীনতা বলতে শুধুমাত্র নিয়ম-শৃঙ্খলাকে বিরোধিতা করা নয়। আবার বিরুদ্ধ মতের সহনশীলতার সাথে একাত্ম হওয়াকেও বোঝায় না।[156] আবার L.T. Hobhouse মিল সম্পর্কে বলেছেন, মিলই পুরাতন এবং নতুন উদারনীতিবাদের মধ্যে সেতু গড়ে তুলেছে। অর্থাৎ

> “L.T. Hobhouse, himself one of the leading theorists of the ‘the new Liberalism’ put the same point more tersely, but not inaccurately, when he said of Mill that ‘in his single person he spans the interval between the old and the new Liberalism.”[157]

---

[155] Mill, John Stuart, *On Liberty*, Batoche Books, Kitchener, 2001, p-16.

[156] Hobhouse, L. T, *Liberalism*, Batoche Books, 1998, p-50.

[157] Ibid, p-58.

তিনি তাঁর ‘Liberalism’ গ্রন্থে রাষ্ট্রের কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিক জন লক প্রদত্ত নীতিগুলি আরো বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা এবং সামাজিক সংগঠন থেকে প্রাপ্ত সম্পদগুলি জনগণের জন্য একটি রাষ্ট্র উন্মুক্ত করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী পালন করার ক্ষেত্রে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করেছিলেন। তাঁর মতে স্বাধীনতার অর্থ হল আত্মসংযমের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত আত্মশক্তি এবং তিনি চেয়েছিলেন সেই আত্মশক্তি প্রকাশের ক্ষেত্রে যেসমস্ত সীমাবদ্ধতা বর্তমান সেগুলিকে সঠিকভাবে পর্যালোচনা করে জনকল্যাণে প্রয়োগ করা হলো রাষ্ট্রের কর্তব্য। তিনি রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ টি এইচ গ্রীন এর সঙ্গে সহমত হয়ে বলেছেন যে, নিজের ভালোত্ব সর্বসাধারণের ভালোর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে তিনি কিছু মৌলিক সূত্রকে প্রাকৃতিক সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে গ্রহণ করেন।[158] তিনি মনে করেন একজন ব্যক্তির পূর্ণব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে, সেই ব্যক্তির একার পক্ষে তা কখনোই সম্ভব নয়। তা একমাত্র সম্ভব হতে পারে সেই গোষ্ঠীর সমস্ত সদস্যদের মধ্য দিয়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয় থাকাটা বাঞ্ছনীয়। সমন্বয়ের অর্থ এটা নয় যে, বিরোধিতার অভাব। সমন্বয় বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন প্রকৃত সমর্থন। সেই সঙ্গে তিনি মনে করেন উন্নতির সম্ভাবনা শুধুমাত্র অন্যান্য সদস্যদের সমর্থনের উপরে নির্ভর করে না, বরং তা নির্ভর করে অন্যদের উন্নতির মধ্য দিয়ে।

ব্যক্তির আত্মসত্তা মূলত একটি সামাজিক আত্মসত্তা। এতদিন পর্যন্ত যে নেতিবাচক স্বাধীনতার উপর উদারনীতিবাদীরা গুরুত্ব দিয়েছেন অর্থাৎ রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের অনুপস্থিতি হলেই ব্যক্তিস্বাধীনতা ভোগ করতে পারে, সেই ধারণাকে সরিয়ে দিয়ে টিএইচ গ্রীন এবং বোসাঙ্কেট ইতিবাচক স্বাধীনতার (Positive Freedom) উপর গুরুত্ব দেন। শুধু প্রতিরক্ষা নয়, ব্যক্তির সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন ব্যক্তির বিকাশের স্বার্থেই। গ্রিনের মতে রাজনৈতিক উদারনীতির ভিত্তি হল নৈতিক স্বাধীনতা। উদারনৈতিক রাষ্ট্র সাধারণের মঙ্গলকামী কাজ কর্মের জন্য জনগণের স্বার্থে স্বাধীনতা

---

[158] Ibid, p-55.

রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে, এই ছিল টি এইচ গ্রিনের মত। এছাড়াও তিনি রাষ্ট্রের অভিভাবকত্বেরও বিরোধিতা করেন, কারণ রাষ্ট্রের অভিভাবকত্ব এক্ষেত্রে ব্যক্তির দায়িত্ব বোধের গুরুত্ব নষ্ট করতে পারে।[159]

বিংশ শতাব্দীতে উদারনীতিবাদের মধ্যে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন আসে। ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ মূলত যুক্ত ছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর Industrial Capitalism এর সঙ্গে। ফলে তার সঙ্গে সমাজে জন্ম হয়েছে বিভিন্ন পেশায় কাজ হারানো শ্রমিকদের, এই শ্রমিকদের শোচনীয় দুঃখ-দুর্দশা, নিম্নবেতনকাঠামো এবং কলকারখানায় দুর্বিষহ পরিবেশ- এই সবই হল উদারনীতিবাদের ফল। এই কারণেই জে.এস. মিল বা টি.এইচ. গ্রীন এঁদের মধ্যে ব্যক্তির ইতিবাচক স্বাধীনতা এবং সামাজিক উদারনীতিবাদের আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা দারিদ্র, রোগ, অজ্ঞতা দূর করার জন্য ধীরে ধীরে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণা প্রবর্তন করার কথা বলেন। আবার শিল্পশ্রমিক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কৃষকেরাও সামাজিক সংস্কারের দাবি তোলে। এতদিন পর্যন্ত যে আত্মসহায়তা এবং স্বাধীন দায়িত্ববোধ উদারনীতিবাদের মধ্যে ছিল তা ক্রমশ জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকে পড়তে থাকে।[160]

জনগণের এই দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে হলে সরকারকেও এগিয়ে আসতে হবে। সরকারকে এমন এক পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যেখানে থাকবে ন্যূনতম বেতন কাঠামো এবং বার্ধক্যপীড়িত অবস্থায় সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার। সেক্ষেত্রে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের দায়িত্ব তুলে ধরেন। ১৯৪২ সালে ব্রিটেনে 'বেভারেজ রিপোর্টের' উপর ভিত্তি করে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণা বিস্তৃতি লাভ করে। যেখানে বলা হয় প্রয়োজনীয় চাহিদা (Want), রোগ বা ব্যাধি (Disease), অজ্ঞতা (Ignorance), দারিদ্রতার কারণ অত্যাধিক নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি (Squalor)

---

[159] Ibid, p-56.

[160] Heywood, Andrew, *Political Ideologies: An Introduction*,4th Edition, Palgrave Macmillan, New York, 2007, p-57.

কর্মহীনতা (Idleness)।[161] এই পাঁচ প্রকার শত্রুর বিরুদ্ধে রাষ্ট্র নাগরিকদের রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসবে। উপরোক্ত বিষয়গুলিকে মাথায় রেখে ১৯৩০র দশকে অর্থনৈতিক মন্দার পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজ অর্থনীতিবিদ জন মেনার্ড কেইনস এক বিপ্লবী অর্থনৈতিক তত্ত্ব দেন। যা কেইনসীয় অর্থনীতি নামে পরিচিত। এই তত্ত্বের মাধ্যমে তিনি পুঁজিবাদী সংকট থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য উদারনৈতিক রাষ্ট্রের একটা নতুন তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। এইভাবে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ এর মাধ্যমে জনকল্যাণকর কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ধারণা প্রসার লাভ করে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর অবস্থা পুনঃর্গঠণের কাজে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণা ক্রমাগত প্রসার লাভ করে।

আধুনিক উদারনীতিবাদের বৈশিষ্ট্যঃ

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ভেঙে সনাতন উদারনীতিবাদের জন্ম হয়েছিল। আর সনাতন উদারনীতিবাদের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল ব্যক্তি স্বাধীনতা অর্থাৎ জনগণের জীবনধারায় রাষ্ট্রের যথাসম্ভব কম হস্তক্ষেপ প্রদান। সনাতন উদারনীতিবাদের এইবৈশিষ্ট্যের কারণে পুঁজিবাদের জন্ম হয়। যার ফলে দেখা যায় মুদ্রাস্ফীতি। আর মুদ্রাস্ফীতির ফলে সমাজে দরিদ্ররা আরো দরিদ্র হতে শুরু করে। এছাড়াও ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পর থেকে বিশেষত বিংশ শতাব্দীতে সংগঠিত প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় থেকে সাবেকী উদারনীতিবাদ তথা চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। তারপর ধনতন্ত্রবাদের বিশ্বব্যাপী সংকট শুরু হলে সনাতন উদারনীতিবাদ যে জনকল্যাণ সাধনে ব্যর্থ, তা সমাজতন্ত্রবাদীরা খুব সহজেই জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে সক্ষম হন। এমতাবস্থায় কিছু সমাজ দার্শনিক যেমন, গ্রিন, ব্রডলি, বোসাঙ্কেট প্রমুখ সাবেকী উদারনীতিবাদের তত্ত্বের সঙ্গে মিশ্র অর্থব্যবস্থা চালু করে, সংশোধিত ও পরিবর্তিত করে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রতত্ত্ব প্রচার করেন। এই মতবাদই আধুনিক উদারনীতিবাদ নামে পরিচিত। এই মতবাদের মূল নীতিগুলি হলঃ

---

[161] Ibid, p-57.

১) উদারনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, ২) পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি, ৩) সাংবিধানিক পদ্ধতিতে সরকার পরিবর্তন, ৪) আইনের অনুশাসন ও ন্যায়বিচার, ৫) স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা, ৬) জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রনীতি, ৭) ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের স্বীকৃতি, ৪) সংখ্যালঘুর প্রতিনিধিত্ব এবং ৯) ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা ইত্যাদি।

রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠাঃ আধুনিক উদারনীতিবাদীগণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁরা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় বিশেষভাবে আগ্রহী। তাঁদের মতে জনগণকে সমস্ত রকমের রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস বলে মেনে নিলেই কেবল গণতন্ত্র সফল হতে পারে। কিন্তু আধুনিককালে রাষ্ট্রের এবং জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় কোন জনগণের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তাই তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাহায্যে জনসাধারণ পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রপরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হলেও গণতান্ত্রিক সরকার বিশেষ কোনো ব্যক্তি, শ্রেণীর স্বার্থে কাজ করবে না বলে রাষ্ট্রতাত্ত্বিকগণ মনে করেন।

রাজনৈতিক ও পৌর অধিকারের স্বীকৃতি- আধুনিক উদারনীতিবাদ সঠিক জনমত গঠনের জন্য নাগরিকদের রাজনৈতিক ও পৌর অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদানের পক্ষপাতী ছিলেন। এই সমস্ত অধিকারের মধ্যে ছিল স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার, সরকারি কার্যের সমালোচনা করার অধিকার, জীবনের অধিকার, সভা সমিতি করার অধিকার, ধর্মের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, সামাজিক সাম্যের অধিকার, নির্বাচন করার ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার প্রভৃতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

একদলীয় ব্যবস্থার বিরোধিতা- আধুনিক উদারনীতিবাদীগণ একদলীয় ব্যবস্থাকে গণতন্ত্রের হন্তারক বলে মনে করেন। তাঁদের মতে একাধিক রাজনৈতিক দল না থাকলে জনগণের বিভিন্ন রকম আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হতে পারে না। কারণ বহুদলীয় ব্যবস্থা নানা রকম রাজনৈতিকদল বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের সমকালীন সমস্যাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করায় নাগরিকদের রাজনৈতিক জ্ঞান যেমন বৃদ্ধি পায়,

তেমনই আবার বিরোধীদল ক্ষমতাসীন দলের সমালোচনা করে তাদের সংযত রেখে গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখে।

সাংবিধানিক উপায়ে সরকার পরিবর্তন- আধুনিক উদারনীতিবাদ সাংবিধানিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সরকারের পরিবর্তন সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন। জনগণের হাতে সরকার নির্বাচনের চরম ক্ষমতা থাকায়, যেকোন সময় তারা একটি সরকারের পরিবর্তে অন্য সরকারকে ক্ষমতাসীন করতে পারে। তাই উদারনীতিবাদের সমর্থকরা বৈপ্লবিক উপায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের যে কোন প্রচেষ্টাকে কঠোরভাবে সমালোচনাও করতে পারেন।

সার্বজনীন ভোটাধিকার- আধুনিক উদারনীতিবাদের অন্যতম প্রধান মৌলিক নীতিটি হল সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের প্রবর্তন। গণতন্ত্র যেহেতু জনগণের শাসন, তাই গণসার্বভৌমিকতা বাস্তবায়নের জন্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ ও ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের সমান ভাবে ভোটদানের অধিকার থাকা প্রয়োজন।

ন্যায় প্রতিষ্ঠা- ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আধুনিক উদারনীতিবাদ বিশেষভাবে আগ্রহী। 'আইনের অনুশাসন'কে উদারনীতিবাদীগণ গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের অপরিহার্য শর্ত বলে মনে করেন। আধুনিক উদারনীতিবাদীগণের মতে, আইনের দৃষ্টিতে সাম্য এবং আইন কর্তৃক সমান সংরক্ষণ ব্যতীত সমাজের মধ্যে কোনভাবেই ন্যায় প্রতিষ্ঠা হতে পারে না।

নিরপেক্ষ আদালত- আধুনিক উদারনীতিবাদীগণ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি নিরপেক্ষ আদালতের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করার পক্ষপাতী। এজাতীয় আদালত একদিকে যেমন সংবিধানের রক্ষাকর্তা ও ব্যাখ্যাকর্তা হিসেবে কাজ করবে। ঠিক তেমনই অন্যদিকে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সম্মূহ সংরক্ষণ করবে।

ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকার- আধুনিক উদারনীতিবাদিগণ ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের উপর বিভিন্ন বাধা নিষেধ আরোপ করার কথা বললেও, তাঁরা এরূপ অধিকারের বিলোপ সাধনের আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। বরং তাঁরা মনে করেন,

ব্যক্তির হাতে সম্পত্তির অধিকার না থাকলে নাগরিকরা কাজকর্মে উৎসাহ হারাবে, যার ফলে দেশের সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব হবে না।

সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা- আধুনিক উদারনীতিবাদীরা শাসন বিভাগের ইচ্ছামত ও অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ রোধ করার জন্য আইন বিভাগকে ব্যবহার করতে চাই। তবে এই আইন বিভাগ যাতে কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থরক্ষার হাতিয়ারে পরিণত না হতে পারে, সেই জন্য সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্বের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা- আধুনিক উদারনীতিবাদ জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের আদর্শ গ্রহণ করার ফলে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের সীমানা যথেষ্ট পরিব্যাপ্ত হয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্য নিরসনের জন্য গতিশীল কর-ব্যবস্থার প্রবর্তন, রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা গ্রহণ, শিল্প বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ, কিছু শিল্প বাণিজ্যের জাতীয়করণ প্রভৃতি উদারনীতিবাদের নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে এইসব নীতি অনুসরণ করার জন্য অনেক রাষ্ট্রদার্শনিক আধুনিক উদারনীতিবাদকে সমাজতন্ত্রের পৃষ্টপোষক বলে মনে করতে পারেন।

৪.৪ নয়া-উদারনীতিবাদ (Neo-Liberalism):

উদারনৈতিক রাষ্ট্রতত্ত্ব ১৯৫০-৬০ এর দশকে দুটি শক্তিশালী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল। কিছুতাত্ত্বিকগণ মনে করেন, প্রথম চ্যালেঞ্জটি হল জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক দার্শনিকতত্ত্বের অনুশীলনকে অসার ও মূল্যহীন বলে মনে করেন। তাঁদের মতে তথ্যভিত্তিক প্রমাণযোগ্য রাজনৈতিক আচরণ বিশ্লেষণের মাধ্যমেই উদারনৈতিক দর্শন এর প্রকৃত মূল্য বোঝা যাবে। দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জটি আসে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক শিবির থেকে। এঁরা মনে করেন উদারনৈতিক রাষ্ট্রতত্ত্ব বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত, তাই এই ধরনের তাত্ত্বিক আলোচনা কখনোই সমাজের আর্থ-সামাজিক অসাম্য ও শোষণের প্রকৃত ব্যাখ্যা দিতে অসমর্থ্য। তাই এর মাধ্যমে সমাজে এই ব্যাপক অসাম্য নিরসনও সম্ভব নয়।

এই উভয় চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়ে উদারনৈতিক রাষ্ট্রতত্ত্বে এক নতুন চিন্তাধারা নিয়ে উপস্থিত হন জন রলস্ ১৯৭১ সালে। ‘A Theory of Justice’ নামক

গ্রন্থে রলস্ এক নতুন বক্তব্য নিয়ে উপস্থিত হন। তিনি বেন্থামের উপযোগবাদের তত্ত্বকে অস্বীকার করেন। কারণ তা তাঁর কাছে যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় নি। বেন্থামের উপযোগবাদে সামাজিক মঙ্গল সাধনে ব্যক্তির ত্যাগ স্বীকার এবং সংখ্যালঘু অংশের স্বার্থের কথা বলা হয় নি। তিনি যে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য দীর্ঘ গবেষণা করেছিলেন, সেইপ্রশ্নটি হল কিভাবে একটি ন্যায়সঙ্গত সমাজ গড়ে তোলা যায়। রলস্ তাঁর ‘Maximine Principle’ এর মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছেন যে, যারা সমাজে সবচেয়ে কম সুবিধা পাচ্ছে, তাদের সবচেয়ে বেশি সুবিধা দিতে হবে। এইভাবে সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষরা ক্রমশ আর্থসামাজিক দিক থেকে অগ্রসর হবে, আর এইভাবেই প্রান্তবাসীদের অবস্থার উন্নয়ন হবে। রলস্ এর উদারনীতিবাদ ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ থেকে এগিয়ে গেছে এই কারণে যে, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে উদারনীতিবাদ ব্যক্তির গুণ ও দক্ষতার মানদণ্ডে সুযোগ-সুবিধাকে উন্মুক্ত করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু রলস্ চেয়েছেন একই ধরনের গুণ ও দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও যারা সমাজে পিছিয়ে আছে, তাদের সবার বিকাশের জন্য সমান সুযোগ সুবিধা উপস্থিত করা। ভারতীয় সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালিত নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে রলসীয় আদর্শের প্রতিফলন রয়েছে, যদিও রলসের এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই অর্থাৎ ১৯৫০ সালে যা ভারতীয় সংবিধানে গৃহীত হয়েছিল। আসলে রলস্ তাঁর উদারনীতির যে দুটি ধারা- একটি হল- স্বাধীনতা এবং অন্যটি হল- সমতা, এই উভয় ভাবধারার মধ্যে তিনি সামঞ্জস্য বিধান করার চেষ্টা করেন। রলস্ এর পরবর্তীকালে আরো দুই তাত্ত্বিকের আবির্ভাব ঘটে যাদেরকে নব্য উদারনীতিবাদী দার্শনিক হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁদের মধ্যে একজন হলেন রবার্ট নোজিক এবং অন্যজন হলেন ফ্রেডরিক হায়েক। নোজিক তাঁর ‘Anarchy, State, and Utopia’ গ্রন্থে রলস্ এর তত্ত্বের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করে নূন্যতম রাষ্ট্রের ধারণার পক্ষে জোরালো যুক্তি উপস্থাপনা করেছেন। তিনি মনে করেন প্রকৃত সমৃদ্ধি গড়ে তুলতে গেলে রাষ্ট্রকে যথাসম্ভব কম হস্তক্ষেপ করতে হবে। তাঁর সামাজিক ন্যায় বিচারের বক্তব্যের প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে স্বত্বাধিকার তত্ত্ব (Entitlement Theory)। নোজিক আরও মনে করেন প্রকৃতির রাজ্যে বসবাসকারী ব্যক্তিরা নিজেদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য স্বেচ্ছাকৃত উপায়ে

একাধিক জিনিসকে এজেন্সির হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে। এই এজেন্সিদের মধ্যে অন্যতম হলো রাষ্ট্র। আর এই এজেন্সিকে স্বেচ্ছাকৃত ও অহিংসের সঙ্গে দায়িত্ব দেওয়া হয় ব্যক্তির সম্পত্তি রক্ষা করার ও ব্যক্তির জীবনকে রক্ষা করার জন্য। রাষ্ট্রকে তিনি ততোটুকু ক্ষমতা দিতেই রাজি, যেটুকু ক্ষমতা রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্রে বসবাসকারী ব্যক্তির বিকাশ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজন। নোজিক মনে করেন প্রাকৃতিক রাজ্য সম্পর্কে লক যে তিন ধরনের অধিকারের কথা বলেছিলেন (জীবনের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার এবং বেঁচে থাকার অধিকার) তা রক্ষা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। ব্যক্তির এই প্রাকৃতিক অধিকারগুলি তার মৌলিক অধিকার আর এই মৌলিক অধিকারগুলি একেবারেই তার নিজস্ব সম্পত্তি। তিনি ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রের অভিভাবকত্ব কখনোই মেনে নেন নি। রলস্ যে 'Distributive Justice' র কথা বলেছেন, যা রাষ্ট্রের মাধ্যমে সম্পাদিত হবে। কিন্তু নোজিক তা মানতে রাজি নন। নোজিক বলেছেন রাষ্ট্র নয়, তা ব্যক্তির উপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত। রলস্ এর বিরুদ্ধে নোজিকের প্রধান সমালোচনা হল- রলস্ Creative Self বা সৃষ্টিশীল আত্মস্বতন্ত্রকে গুরুত্ব দেননি। এবিষয়ে নোজিক মনে করেন প্রথমটি ব্যক্তির নিজস্ব প্রতিভা ও সম্পদ, যা নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যবহার করার স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। রলস্ এই সৃষ্টিশীল ব্যক্তিসত্তাকে, হস্তক্ষেপকারী রাষ্ট্রের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন নি। তাই সামাজিক কল্যাণের যুক্তি দেখিয়ে Self Autonomy বা আত্মনিয়ন্ত্রণ নস্যাৎ করার বিষয়টিকে নোজিক মেনে নিতে পারেন নি। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, মিলের বক্তব্যের একটি সময় উপযোগী পরিবর্তিত ভাষ্য নোজিকের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

উদারনৈতিক রাষ্ট্রদর্শনের আরেকজন খ্যাতনামা ব্যক্তি হলেন ফ্রেডরিক হায়েক। তাঁর বিখ্যাত 'The Road to Serfdom' গ্রন্থে তিনি বলেছেন নাৎসিবাদের মূল নিহিত ছিল সমাজবাদী চিন্তা ও প্রয়োগপদ্ধতির মধ্যে। পশ্চিমী উদারনীতিবাদে এই সমাজবাদী নীতি গ্রহণের যে প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছিল, তারই বিরুদ্ধে হায়েক কলম ধরেন। এছাড়াও 'Law, Legislation and Liberty' গ্রন্থে ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের যে প্রধান বৈশিষ্ট্য বা উপাদান 'ব্যক্তিস্বাধীনতা'- তাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জোরালো ভাবে মত

দেন, ১৯৭০ র দশকের মাঝামাঝি সময়ে যখন কেইনসীয় অর্থনীতি সংকটের সম্মুখীন হয়। মুদ্রাস্ফীতির ফলে আর্থিক নীতির ব্যর্থতা যখন সকলের চোখে ধরা পড়ে তখন দ্রব্য সামগ্রীরমূল্য, পরিষেবাধার্য করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র এগিয়ে আসতে থাকে, তখন হায়েকের ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার তত্ত্ব বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ মার্গারেট থ্যাচার এবং রোনাল্ডো রেগান হায়েকের তত্ত্বকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার পর নয়া-উদারনীতিবাদ তাঁর হাত ধরে এক ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। শুধু হায়েক নয়, পাবলিক চয়েস স্কুল এবং বিশেষ করে জেমস বুকাননের রচনায় সাংবিধানিক সরকারের অবস্থার বিষয়ে এক ব্যাপক অনুসন্ধান লক্ষ্য করা যায়। যা পরবর্তীকালে রাষ্ট্রের কার্যকলাপ, আমলাদের কার্যকলাপ, পাবলিক গুডস বণ্টনে রাষ্ট্রের ব্যর্থতার বিষয়টি খুব সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেন। এইভাবে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের অগ্রগতির ধারা এগিয়ে চলেছে।[162]

উদারনৈতিক রাজনীতি বরাবরই একটি গতিশীল মতাদর্শ, যুগের প্রয়োজনে তা নিজেকে সময় উপযোগী করে নিজেকে পাল্টে নিয়েছে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের কার্যকলাপ থেকে শুরু করে অর্থনীতি এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা পরিবর্তনের সূচনা করেছে। এই উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বর্তমান উদারনৈতিক রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রদর্শনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরতে পারি। সেগুলি হল- নূন্যতম রাষ্ট্র, পুনর্জ্জীবিত সক্রিয় নাগরিক সমাজ, বাজার নীতিভিত্তিক গণতন্ত্র, পারস্পরিক স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্বাস, সহযোগিতা ও সম্বন্ধের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সামাজিক পুঁজি, ক্রেতার স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং সমাজে দরিদ্রতম মানুষের জীবনধারণের পরিষেবা সুনিশ্চিত করার প্রয়াস, মানবিক অধিকার গুলিকে রক্ষা করার জন্য প্রয়াস, প্রকৃতি ও পরিবেশকে সুরক্ষা দান করা, পুরুষ এবং নারীর মধ্যে লিঙ্গ বিভাজনকে সম্পূর্ণ অবসান ঘটানো ও বিকেন্দ্রীকরণ।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে নয়া-উদারনীতিবাদের মূল বৈশিষ্ট্য গুলি হল-

---

[162] Ibid, pp-40-41.

প্রথমতঃ- ন্যূনতম রাষ্ট্র (Minimal State) অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রধান কাজ হবে সমাজে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। সে কখনোই জনগণের বা সমাজের উন্নতির ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করবে না।

দ্বিতীয়তঃ- পুনরুজ্জীবিত, সক্রিয় নাগরিক সমাজ (Civil Society),

তৃতীয়তঃ- পারস্পারিক সহযোগিতা স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্বাস ও সমন্বয়ের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সামাজিক পুঁজি (Social Capital),

চতুর্থতঃ- বাজার অর্থনীতি ভিত্তিক গণতন্ত্র (Market Democracy)। নয়া-উদারনীতিক দার্শনিকদের মতে, এই ধরনের রাষ্ট্র বহুমাত্রিক রাজনৈতিক স্বার্থের সামাজিক ভিত্তির উপর গড়ে ওঠে। এই জাতীয় শাসন ব্যবস্থায় সব সময় বেসরকারি বিষয়ের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাছাড়া সাধারণ মানুষের সমস্ত অধিকার অর্থাৎ মানবিক অধিকার ও নাগরিক অধিকার রক্ষার জন্য সমস্ত রকমের চেষ্টা করা হয়। নয়া-উদারনৈতিক রাষ্ট্রতত্ত্বের মূল কথা হল- নিয়ন্ত্রণকারী কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রতত্ত্বের বিরোধী।

এই অধ্যায়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি, উদারনীতিবাদ এবং তার প্রকারভেদ সম্পর্কে। রাষ্ট্রদর্শনে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে আজ পর্যন্ত যে সমস্ত রাষ্ট্রতত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে, সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়তার শীর্ষে যেমন উঠেছে উদারনৈতিক রাষ্ট্রতত্ত্ব, তেমনই সেই তত্ত্ব সমালোচনার ঊর্ধ্বেও উঠতে পারে নি। এই উদারনীতিবাদের উদ্ভব ও এই শব্দটির অভিধানগত অর্থ এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রদার্শনিকগণের উদারনীতিবাদী তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁদের মতামত। উদারনীতিবাদের মূল বক্তব্য হল স্বাধীনতা, আর এই স্বাধীনতা প্রদানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা কেমন থাকবে, তার উপর ভিত্তি করে এই উদারনীতিবাদকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন- ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ, আধুনিক উদারনীতিবাদ এবং নয়া উদারনীতিবাদ। বিভিন্ন রাষ্ট্রদার্শনিক কিভাবে উক্ত উদারনীতিবাদী তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছেন এবং প্রত্যেক উদারনীতিবাদী তত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য কি? তা আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

এরপর বিভিন্ন উদারনীতিবাদী তত্ত্বের তাত্ত্বিকদের তত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে কিভাবে এই পেশাগত পরিচিতির সংকট তৈরি হতে পারে তা যৌক্তিকতার সঙ্গে দেখানোর চেষ্টা করবো পরবর্তী অধ্যায়ে।

পঞ্চম অধ্যায়

উদারনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পেশাগত পরিচিতির সংকটের তুলনামূলক আলোচনা।

৫.১ থমাস হবস্, জন লক, অ্যাডাম স্মিথ, টি.এইচ. গ্রীন, জেরেমী বেন্থাম, জেমস্ মিল ও জন স্টুয়ার্ট মিল এর আলোচনাঃ

থমাস হবস্ (Thomas Hobbes) মনে করেন, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে স্বার্থপর। তাঁর মতে মানুষের সমস্ত কাজই নিজস্ব স্বার্থ চিন্তা থেকে উৎসারিত। মানুষ কাজে আগ্রহী হয়, তার বুদ্ধি বা যুক্তির দ্বারা নয়, সে কাজে আগ্রহী হয় তার ক্ষুধা (Appetites) , আকাঙ্খা (Desires) এবং উগ্র বাসনা (Passions) থেকে। তাঁর মতে প্রকৃতির রাজ্যে কোন আইন এবং ন্যায় না থাকার জন্য প্রকৃতির রাজ্য হয়ে উঠেছিল চিরস্থায়ী সংগ্রামের ক্ষেত্র।[163] অবিরাম বিরোধ এবং সংঘর্ষই ছিল প্রকৃতির রাজ্যের বৈশিষ্ট্য। হবস্ এর নিজের ভাষায় প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের জীবন হয়ে উঠেছিল–নিঃসঙ্গ, দরিদ্র, কদর্য, পাশবিক এবং সংকীর্ণ; প্রত্যেক মানুষ একে অপরের শত্রু হয়ে উঠে ছিল।

> "Solitary, Poor, nasty, brutish and short; Every man is enemy to every man"[164]

মানুষ তার নিজের সুখ বা আনন্দের জন্য সে চেয়েছিল অন্যের উপর ক্ষমতা আরোপ করতে। এই অবস্থায় প্রত্যেক মানুষই অপর মানুষের আক্রমণের ভয়ে ভীত ছিল। এই সামগ্রিক নিরাপত্তাহীনতা থেকে, জোর যার মুলুকের রাজত্ব থেকে মুক্তি পাবার জন্য,

---

[163] Gauba, O.P, *An Introduction to Political Theory*, 4th Edition, Macmillan, 2006, p-182.

[164] Hobbes, Thomas, *Leviathan,* Oxford University Press, Ely House, London, 1651, p-96.

এই জঙ্গলের রাজত্ব থেকে মুক্তি পাবার জন্য, যেখানে কোন আইন ছিল না, কোন সরকার ছিল না- মানুষ তার আত্মরক্ষার জন্য এই প্রাকৃতিক রাজ্য পরিত্যাগ করে, সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদের হাতে।

কিন্তু হবস্ এর সঙ্গে লকের পার্থক্য হল, লক মনে করেন প্রকৃতির রাজ্য অবিরত যুদ্ধবিগ্রহে পূর্ণ ছিল না, বরং প্রকৃতির রাজ্য ছিল- শান্তিপূর্ণ, পারস্পরিক সহযোগী এবং সদ্দিচ্ছাপূর্ণ সংরক্ষণ বা “Peace, goodwill, mutual assistants and preservation”[165] এই বৈশিষ্ট্য দ্বারা আবৃত। প্রকৃতির রাজ্যে স্বাধীনতা ছিল কিন্তু স্বেচ্ছাচার ছিল না। লক মনে করেন, এই রাজ্যে রাষ্ট্রীয় আইন না থাকলেও ছিল প্রাকৃতিক আইন। মানুষের যেহেতু যুক্তিবাদী সত্তা ছিল, সেহেতু এই রাজ্যে মানবিকতা ছিল। কিন্তু তাহলেও এখানে কিছু কিছু অপূর্ণতা ছিল। যেমন- কোনটি প্রাকৃতিক আইন আর কোনটি প্রাকৃতিক আইন নয়, সেটা বোঝার কোন উপায় ছিল না। আবার কেউ আইন ভঙ্গ করলে, তাকে আটকানোরও কেউ ছিল না। এখানে আইন ভঙ্গ হচ্ছে কিনা, তা বিচার করারও কেউ ছিল না এবং আইন রূপায়নের জন্যও কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না। এই অপূর্ণতা দূর করার জন্যই মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে ঠিক করেছিল রাজাকে তাদের সমস্ত ক্ষমতা তুলে দেবে এবং রাজার সঙ্গে এই চুক্তি করবে যে, তারা যেপ্রাকৃতিক অধিকার ভোগ করত, সেই অধিকারগুলি রাজাকে প্রদান করতে হবে। যেমন- জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার এবং সম্পত্তির অধিকার। এই শর্তেই তারা রাজার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যেই তারা নিজেদের উপর রাজার শাসনকে মেনে নিয়েছিল।

সুতরাং হবস্ এর থেকে লক এর দৃষ্টিভঙ্গি অনেক দিক থেকেই পৃথক। হবস্ মনে করতেন প্রকৃতির রাজ্য ছিল জঙ্গলের রাজত্ব, কিন্তু লক মনে করেছিলেন এটি ছিল প্রাক-রাজনৈতিক, প্রাক-সামাজিক নয়। অর্থাৎ লক এর মতে প্রকৃতির রাজ্য ছিল

---

[165] Gauba, O. P, *An Introduction to Political Theory*, 4th Edition, Macmillan, 2006, p-182.

সামাজিক। হবস্ এর মতে প্রকৃতির রাজ্য ছিল বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। লক এর মতে প্রকৃতির রাজ্য ছিল শান্তিপূর্ণ।

হবস্ চরম রাষ্ট্রের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন। কিন্তু লক সীমাবদ্ধ রাষ্ট্রের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন।

হবস্ মনে করেন, জনগণকে দেখার জন্যই সার্বভৌমত্বের সৃষ্টি। কিন্তু লক মনে করেন শুধু নিরাপত্তা বা জীবনের অধিকার নয়, স্বাধীনতা এবং সম্পতির অধিকার যা প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ ভোগ করত, সেগুলি জনগণ যাতে পেতে পারে রাজা তারও ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করবে।

হবস্ জনগণের বিদ্রোহের অধিকার দেননি, নিঃশর্তে সমস্ত ক্ষমতা ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদের হাতে জনগণ তুলে দিয়েছিল। এই অর্পণের মধ্যে শুধু একটাই প্রার্থনা ছিল এবং তাহল- আত্মরক্ষার প্রার্থনা। কিন্তু লক এর চুক্তিতে রাজার সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছিল, তার শর্ত ছিল জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার এবং সম্পতির অধিকার, যা রাজা রক্ষা করবে। যদি রাজা জনগণকে সেই অধিকার না দিতে পারেন, তাহলে রাজাকে সরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা জনগণের হাতে থাকবে।

হবস্ রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য করেন নি। কিন্তু লক রাষ্ট্র এবং সরকারের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। লক মনে করেন চুক্তি হয়েছিল দুটি, একটি জনগণের নিজেদের মধ্যে যার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল রাষ্ট্র। আর একটি চুক্তি হয়েছিল জনগণের সাথে রাজার যার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল সরকার এর। লক আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগের কথা বলেছেন। কিন্তু হবস্ এই ক্ষমতা বিভাজনে বিশ্বাসী ছিলেন না। হবস্ মনে করতেন ক্ষমতা বিভাজনের জন্যই ইংল্যান্ডে রাজা লর্ড এবং কমনসদের (House of lord and commence) মধ্যে দ্বন্দ্ব থেকেই ইংল্যান্ডে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল 1949 সালে। ব্যক্তিকে সনাতন উদারনীতিবাদে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই গুরুত্ব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে লেসে-ফেয়ার (Laisse faire) নীতির মাধ্যমে। ‘Laisse Faire’ এই ফরাসি শব্দের অর্থ হল Live alone, ধ্রুপদী উদারনীতিবাদে (Classical Liberalism) ব্যক্তিকে একা থাকার, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ না

করার বিষয়টিকে সমর্থন করা হয়েছে। এখানে ব্যক্তির ব্যবসা বাণিজ্যের স্বাধীনতা, চুক্তির স্বাধীনতা, দরকষাকষি, উদ্যোগের স্বাধীনতাকে সমর্থন করা হয়েছে।[166] এখানে মনে করা হয়েছে ব্যক্তির মধ্যে যুক্তিবোধ আছে, সেই যুক্তিবোধের মাধ্যমেই সে এগিয়ে চলতে পারে, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। এই অবাধ স্বাচ্ছন্দের নীতিকে বলা হয়েছে প্রগতির শর্ত। ব্যক্তিগত সম্পত্তি হল ব্যক্তির পরিশ্রম, প্রচেষ্টা এবং উদ্যোগের ফসল। সুতরাং ব্যক্তিকে উদ্যোগের স্বাধীনতা দিতে হবে। ব্যক্তির সম্পত্তির স্বাধীনতাকে, উদ্যোগের স্বাধীনতাকে রাষ্ট্রীয় আইন ও শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে তাকে রক্ষা করতে হবে। এই পথে যারা হেঁটেছেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই Adams smith এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। অবাধ বা মুক্ত বাণিজ্যের ব্যক্তিস্বাধীনতাবাদ (Laissez Faire Individualism) তাঁর হাতেই অনেকটা গড়ে ওঠে। Adams Smith ফরাসি ফিজিওক্রাটদের (Physiocrats) দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, ফিজিওক্রাটরা মনে করতেন যতক্ষণ পর্যন্ত না, ব্যক্তি অন্যের স্বাধীনতা খর্বকরে ততক্ষন পর্যন্ত সরকার হস্তক্ষেপ করবে না। একমাত্র অপরাধী, পাগল এবং একচেটিয়া কারবারীদের উপর রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে।[167] সাধারণ আইন মান্যকারী জনগণের উপর রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে না। এর মাধ্যমেই Free Trade বা অবাধ বাণিজ্য এর ধারণা প্রসারিত হতে পারে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে Free Trade প্রয়োজন বলে গণ্য হয়; ন্যায় এবং অর্থনীতির স্বার্থে (Justice এবং economy)। Adams Smith ফিজিওক্রাটদের সব ধারণা গ্রহণ করেন নি। তাদের অনেক ভুল-ক্রটিকে বর্জন করেছেন। যেমন- ফিজিওক্রাটরা মনে করতেন Agriculture হল সম্পদ গঠনের একমাত্র উৎস, এই ধারণা পরিত্যাগ করে Adams Smith দেখিয়েছেন কৃষির পাশাপাশি Commerce এবং Industry হল সম্পদের উৎস। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল কোন জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কি ধরনের নীতি অবলম্বন করলে সবচেয়ে ভালো হতে পারে তা খুঁজে বার করা। Adams Smith মনে করেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটি লাভ জনক উদ্দেশ্য রয়েছে (Profit Motive),

---

[166] Ibid, p-189.

[167] Ibid, p-190.

এই Profit Motive হল তার সহজাত প্রবৃত্তি। এই Profit Motive Selfish Motive বলে মনে হলেও তা সাধারণের পক্ষে সহায়ক। কারণ এর মাধ্যমে জাতীয় স্বাচ্ছন্দ বৃদ্ধি পায় এবং সরকার ব্যবসায়ী ও শ্রমিক শ্রেণীর সকলের স্বার্থে সম্বন্বয় ঘটাতে পারে।[168] Adams Smith মনে করেন, তাঁর এই ব্যক্তিস্বার্থ গুরুত্ব পেলেও ব্যক্তিস্বার্থই কিন্তু শেষ কথা নয়। এই ব্যক্তিস্বার্থই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিয়ে আসবে সবার স্বার্থরক্ষার উপযোগী এক পরিবেশ। Adams Smith সরকার Commerce এবং Industryর উপরে সমস্ত ধরনের নিয়ন্ত্রণের অবসানের পক্ষপাতী। তিনি উন্মুক্ত প্রতিযোগীতায় বা মুক্তবাজারে সমস্ত উৎপাদকরা আগ্রহী হবে বলে মনে করেন। তিনি বাজারের প্রতিযোগীতার মধ্যে দিয়েই দ্রব্য, সেবা এবং শ্রমের মূল্য নির্ধারিত হোক এই ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন।

Adams Smith এর এই বক্তব্যকেই জেরেমি বেন্থাম তাঁর হিতবাদীতত্ত্বের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। বেন্থাম মনে করেন, সরকারের একমাত্র কাজ হল শাস্তি এবং পুরস্কারের ব্যাবস্থার মাধ্যমে কিভাবে জনগণের সুখ বৃদ্ধি করা যায় তা দেখা। এছাড়া সরকারের অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। সেই সরকারই শ্রেষ্ঠ সরকার যে সরকার সর্বোত্তম সুখের ব্যাবস্থা করতে পারে, বেন্থামও ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ পছন্দ করেন না। তিনি মনে করেন, ব্যক্তি তার নিজের স্বার্থের সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক, নিজেই তার নৈতিক মূল্যায়ণ করতে সক্ষম। রাষ্ট্র ব্যক্তির চরিত্র গঠন করতে পারে না। রাষ্ট্র শুধুমাত্র সেই সব ব্যক্তিকে বাধা প্রদান করবে যারা বা যাদের কাজকর্ম সাধারণ সুখের পথে বিঘ্নকারক। আইন মান্যকারী নাগরিকদের কাজে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে না। কারণ কোনটি ন্যায়, কোনটি অন্যায়, কোনটি নৈতিক, কোনটি অনৈতিক- সে ব্যাপারে ব্যক্তিই অগ্রগণ্য হতে পারে।[169]

Adam Smith এর সঙ্গে বেন্থামের সাদৃশ্য হল তাঁরা দুজনেই লেসে-ফেয়ার (Laisse Faire) নীতিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে সমর্থন করেছেন। তফাৎ হল Adam

---

[168] Ibid, p-191.

[169] Ibid, p-194.

Smith Natural Liberty কে সমর্থন করেছেন কিন্তু বেন্থাম Natural Liberty কে সমর্থন করেননি। তিনি আইন প্রণয়নের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। Adam Smith সরকারের কাজ প্রসঙ্গে বলেছেন-

i) বৈদেশিক আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা,

ii) সমাজের অন্য সদস্যদের অন্যায় ও অত্যাচার থেকে অন্যান্য সদস্যদের রক্ষা করা, এবং

iii) সামান্য কিছু জনস্বার্থমূলক কাজ করা ও প্রতিষ্ঠান তৈরি করা।

> "According to this system of 'natural liberty', the role of government is confined to three duties of great importance: (a) the defence of the nation against foreign aggression, (b) the protection of every member of society, as far as possible, from the injustice or oppression of every other member of it, i.e. establishing an exact administration of justice; and (c) the erection and maintenance of public works and running certain public institutions which could not be undertaken by an individual or a small number of individuals because the profit accruing from their maintenance would never repay the expenditure involved."[170]

কিন্তু বেন্থাম মনে করেন, জনগণের সুখ বৃদ্ধির জন্য সরকারকে কাজ করতে হবে। তিনি আরও মনে করেন রাষ্ট্র হল- প্রাথমিকভাবে একটি আইন প্রণয়ন করার সংস্থা মাত্র। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আইন এর মাধ্যমে জনগণের সর্বোত্তম সুখ প্রদান করা। Adams Smith যে 'Natural Liberty' এর কথা বলেছেন, সে বিষয়ে বেন্থাম কোন মতেই বিশ্বাসী ছিলেন না, কারণ তাঁর মতে Natural Liberty সীমাহীন বা অবাধ

---

[170] Ibid, p-192.

স্বাধীনতার কথা বলে। রাষ্ট্র তার আইনের মাধ্যমে এই অবাধ স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। স্বার্থপর ব্যক্তির খারাপ ইচ্ছাগুলিকে রাষ্ট্রই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তার আইনের মাধ্যমে। বেন্থাম মনে করেন, সকল ব্যক্তির সকল কাজে আইনের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। ব্যক্তির সেই সমস্ত কাজকর্মকে সরকার নিয়ন্ত্রণ করবে, যে কাজকর্ম সাধারণের সুখের পথে বাধা সৃষ্টি করে।

হবস্ প্রথম বলেছিলেন, আইন হল সার্বভৌমত্বের আদেশ। বেন্থামও একইভাবে মনে করেন প্রাকৃতিক আইন নয়, মানুষের তৈরি আইনই সর্বশ্রেষ্ঠ। মানুষের তৈরি আইনই নিরাপত্তা, স্বাচ্ছন্দ্য, এবং সুখ সমৃদ্ধিকে বৃদ্ধি করতে পারে।

বেন্থাম এর সহযোগী ছিলেন জেমস্ মিল। বেন্থাম এর উপযোগিতাবাদকে একটি বৈপ্লবিক সংস্কার আন্দোলনে এগিয়ে নিয়ে যান জেমস্ মিল। এই সংস্কার আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ভোটাধিকার এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের প্রতিনীধিত্ব বৃদ্ধি করা। জেমস্ মিলের নিজের সেইধরনের কোন তত্ত্ব ছিল না। তিনি অ্যাডাম স্মিথ এবং বেন্থাম এর তত্ত্বকেই জনপ্রিয় করে তোলেন। ইংল্যান্ডের তৎকালীন (সময়ের) দিনের যে সরকার ছিল, যে আইনি ব্যবস্থা ছিল এবং যে বাণিজ্যিক অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল তা সর্বোচ্চ সংখ্যক ব্যক্তির সর্বোচ্চ সুখের পথে বাধা সৃষ্টি করছে বলে তিনি মনে করেন। সেই কারণেই তিনি ইংল্যান্ডে Aristocratic Govt. এর পরিবর্তে Democratic Govt. এর সুপারিশ করেন। কারণ Aristocratic Govt.- ব্যক্তিস্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হয়, যা দুর্নীতিকে বৃদ্ধি করার সম্ভাবনা থাকে। সেই কারণেই তিনি সার্বজনীন ভোটাধিকার, গোপন ব্যালট এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের পক্ষে জোরদার প্রচার চালান।[171]

J.S. Mill কেই প্রথম Prominent Liberty Thinker[172] হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। যিনি Laisse Faire Individual কে সমর্থন করলেও তার দুর্বলতা গুলিকে নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার আলোকে সংস্কার করতে চেয়েছিলেন এবং

---

[171] Ibid, p-195.

[172] Ibid, p-199.

তা করতে গিয়েই তিনি Positive Liberalism এর অন্যতম প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। তিনি বেন্থাম এর উপযোগিতাবাদের সংস্কার করেন। তিনি মনে করেন যেকোন ধরনের সুখ অন্বেষণ সমাজের উন্নতি ঘটাতে পারে না। বেন্থাম এর মতে সুখের পরিমাণগত দিকটির উপর তিনি আদৌও গুরুত্ব দেন নি, তিনি সুখের গুণগত উৎকর্ষতার উপরই জোর দিয়েছেন।

স্বাধীনতার প্রশ্নে মিল মানুষের কাজকর্মকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। আত্মসম্পর্কিত কার্যাবলী (Self-Regarding Actions) এবং পরসম্পর্কীত কার্যাবলী (Other-Regarding Actions)। আত্মসম্পর্কীত কার্যাবলীতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ মিল চান নি। কিন্তু পরসম্পর্কিত কার্যাবলী যার মাধ্যমে সমাজের কাজকর্ম ব্যহত হয়। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ সমর্থন করেন। কিন্তু আত্মসম্পর্কিত কার্যাবলীতেও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপকে তিনি সমর্থন করেন তখনই যখন কোন ব্যক্তির আত্মসম্পর্কিত কাজ তার নিজের পক্ষেই ক্ষতিকর হয়ে ওঠে।[173] অর্থাৎ ব্যক্তি এই ক্ষতি সম্পর্কে সচেতন নয়। কিন্তু ব্যক্তি যখন এই ক্ষতি সম্পর্কে সচেতন নয়, তখন রাষ্ট্র এগিয়ে আসবে। যেমন- একজন অন্ধব্যক্তি যখন কোন ভাঙ্গা সেতুর উপর দিয়ে হাঁটে তখন রাষ্ট্র তাকে বাধা দিতে এগিয়ে আসবে ঐ ব্যক্তির স্বার্থেই।

এর আগে পর্যন্ত যে সমস্ত তাত্ত্বিকরা এসেছিলেন তাঁদের থেকে মিল একদমই স্বতন্ত্র কারণ তিনিই প্রথম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অবাধ স্বাচ্ছন্দ্যের নীতিকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করে, রাষ্ট্রের ইতিবাচক ভূমিকাকে সমর্থন করেছেন। সমাজের কল্যাণের স্বার্থে ব্যক্তির স্বাধীনতায় (Liberty) হস্তক্ষেপ মিল সমর্থন করেছেন।

Thomas Hill Green ও এই ইতিবাচক উদারনীতিবাদের সমর্থক। তিনি মনে করেন মানুষের নৈতিক চরিত্র থেকেই অধিকার উদ্ভূত হয়। তিনি আরও মনে করেন, প্রতিটি মানুষই হল একটি নৈতিক সত্তা। আর এই প্রতিটি নৈতিক সত্তারই আদর্শ হল সাধারণের কল্যাণের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। T.H Green মনে করেন জনকল্যাণের স্বার্থেই রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে, আর মানুষের নৈতিক চেতনার ফসল হল রাষ্ট্র। মানুষের এই

---

[173] Ibid, p-201.

নৈতিক চেতনা থেকেই স্বাধীনতা উদ্ভূত হয়েছে। এই স্বাধীনতার সঙ্গে অধিকার অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। রাষ্ট্রকে মান্যকরার মধ্যে দিয়েই ব্যক্তি তার স্বাধীনতা লাভ করতে পারে। কিন্তু T.H Green ভাববাদীদের মতো ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের অধীনস্থ করলেও তিনি মনে করেন, রাষ্ট্র জনকল্যাণের স্বার্থেই কাজ করবে। T.H Green অতীতের সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি লক্ষ্য করেছেন। আর এই ত্রুটি বিচ্যুতিরই ফসল হল বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, সর্বহারাদের দুর্দশা এবং তাদের নৈতিক স্বাধীনতার অবদমন। T.H Green তা সত্ত্বেও ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকারকে সমর্থন করেন। কারণ এই সম্পত্তির অধিকারের মধ্যেই সামাজিক কল্যাণ রূপায়িত হবার সম্ভবনা লুকিয়ে আছে। এই যুক্তিতেই তিনি পুঁজিভিত্তিক সম্পত্তিকে সমর্থন করেছেন। Barker, T.H Green এর ‘Property and Capital’ কে নিম্ন লিখিত ভাবে তুলে ধরেছেন ।

> “There is nothing in its essence which is anti-social. On the contrary, it is constantly being distributed through the community in wages to labourers and in profits to those who are engaged in exchange; nor is there anything in the fact that labourers are hired in masses by capitalists to prevent them from being, on a small scale, capitalists themselves. On the same ground of potential social value Green also defends inequality of property.” [174]

C.B. MacPherson বলেছেন Green সর্বহারাদের অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন এবং বলেছেন এই সর্বহারারা ব্যক্তিগত সম্পত্তির যৌক্তিকতার সঙ্গে মেলে না। কারণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি যদি সকলেরই যথেষ্ট পরিমাণে থাকতো তাহলে সর্বহারাদের জন্মই হতনা। কিন্তু পুঁজিবাদের প্রকৃতি সম্পর্কে Green এর সেই অন্তর্দৃষ্টি সেইভাবে ছিল না। Green মনে করেছেন- প্রলেতারিয়েতদের সৃষ্টি হয়েছে পুঁজিবাদী উদ্যোগের প্রকৃতি

---

[174] Ibid, p-205.

থেকে নয়, বরং তা উদ্ভূত হয়েছে সামন্ততান্ত্রিক ব্যাবস্থায় জোর করে ভূ-স্বামীদের জমির দখল নেওয়ার মাধ্যমে অর্থাৎ অবাধ ভূস্বামীদের লুণ্ঠনের মাধ্যমে সর্বহারাদের সৃষ্টি করেছে। সামন্ততান্ত্রিক ব্যাবস্থার ঘাড়ে দায় চাপিয়ে পুঁজিবাদের দায়িত্বকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন, সর্বহারাদের উদ্ভবের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে।[175]

Social Liberalism এর যে ধারণা J.S. Mill দিয়েছিলেন। তার প্রায় 50 বছর পরে 1920 র দর্শনকে কেইনস পুঁজিবাদীকে রক্ষার তাগিদে রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে বলেন। কেইনস বুঝেছিলেন লেলিনবাদ পুঁজিবাদ ধ্বংষ করছে, ফ্যাসিবাদ গণতন্ত্রকে ধ্বংস করছে, এর থেকে পুঁজিবাদকে বাঁচাতে গেলে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। Expenditure এবং Demand কে Control করার জন্য সরকারকে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণকরার জন্য রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে। অর্থনীতি যদি দ্রুত বৃদ্ধি পায় তাহলে জনগণের চাহিদা বাড়বে, কাজ বাড়বে, সরকার ‘কর’ সংগ্রহ করতে পারবে, যে সমস্ত কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, যে সমস্ত দ্রব্য বাজারে মন্দার কারণে অবিক্রিত হয়ে পড়ে রয়েছে, সেদিকে সরকারকে নজর দিতে হবে। সরকারকে পুঁজিবাদীদের ঋণদেওয়ার শর্তকে সহজ করতে হবে, পূর্ণনিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে- এই সমস্ত উপায় অবলম্বনের মাধ্যমেই মুক্তবাজার, সভ্য এবং মানবিক সমাজ গড়ে উঠবে।[176]

৫.২ জন রলস্

নবজাগরণ ও ধর্ম সংস্কারের আন্দোলনের সময় থেকেই ইউরোপের ইতিহাসে জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটতে দেখা যায়। এই সমস্ত জাতীয় চেতনা জাতীয় রাষ্ট্রের উন্মেষ এবং রাষ্ট্রের পরিবর্তে বাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রভৃতি রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। যার ফলে শাসক প্রশাসনিক আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখার দায়িত্ব ছাড়াও জনজীবনের সাধারণ জনগণের দৈনন্দিন জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, অর্থাৎ ধর্ম, সংস্কৃতির

---

[175] Ibid, p-206.

[176] Ramaswamy, Sushila, *Political Theory Ideas & Concepts,* Macmillan, 2003, p-439.

শিক্ষা পণ্য উৎপাদন ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ের উপর সক্রিয় হয়ে ওঠে। নাগরিক জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে চোখে পড়ে। রাষ্ট্রই তখন সমাজের মূল নিয়ন্ত্রক বা অভিভাবক হয়ে ওঠে। আর এই অভিভাবক রাষ্ট্র ব্যক্তি স্বাধীনতার অন্তরায় হয়ে ওঠে। এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। যেমন, ষোড়শ শতকের শেষভাগে হল্যান্ড, সপ্তদশ শতকে ইংল্যান্ড সহ অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্স ও সর্বগ্রাসীর রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে পর্যায়ক্রমে বিপ্লবাত্মক ঘটনাগুলি ঘটতে দেখা যায়। অবশেষে ঊনিশ শতকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রতত্ত্বের জগতে আমরা এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের বিভিন্ন রূপ দেখতে পায়।

ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে উদারনৈতিক রাষ্ট্র তত্ত্বের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের সমালোচনা হতে শুরু করে। এই সমালোচকদের মধ্যে মার্কস ও অ্যাঙ্গেলস অন্যতম। শ্রেণী দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস ও সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন ধারা বা পর্যায় বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে মার্কস ও অ্যাঙ্গেলস এক শক্তিশালী বিকল্প রাষ্ট্রতত্ত্ব নির্মাণ করলেন, যেখানে উদারনৈতিক রাষ্ট্রতত্ত্বের মূল ভিত্তি গুলি অযৌক্তিক ও প্রতিক্রিয়াশীল বলে প্রমাণিত হল। বিংশ শতাব্দীতে সোভিয়েত বিপ্লব ও চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয় শুধু মার্কসবাদী দর্শনকে তাত্ত্বিক দিক থেকেই নয়, ব্যবহারিক দৃষ্টিকোন থেকেও তা গুরুত্বপূর্ণ করে তুললো ফলে মার্কসবাদীদের চিন্তা ভাবনা ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে উদারনীতিবাদীদের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে ক্রমশ প্রবল সংঘাতের সৃষ্টি হল। এমতাবস্থায় মার্কসবাদীদের তত্ত্বের মোকাবেলা করার জন্য উদারনীতিবাদীরা তাদের চিন্তা-ভাবনা ও তত্ত্বের পরিবর্তন ঘটাতে শুরু করলো। উদারনীতিবাদীদের মধ্যে কোন কোন উদারনীতিবাদীগণ ধ্রুপদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে উপেক্ষা করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করল। প্রথমে কেইনসীয়বাদ এবং অবশেষে আরও পরিবর্তিত রূপ হল গণতান্ত্রিক সমাজবাদ। আপাতদৃষ্টিতে এই গণতান্ত্রিক সমাজবাদ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রদর্শনের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃত হলেও তা প্রকৃতপক্ষে মার্কসবাদীদের বিরোধিতার এক নতুন রূপের উদারনৈতিক দর্শনের বিশেষ রূপ।

বিভিন্ন প্রকার উদারনৈতিক রাষ্ট্রতত্ত্বের বিরুদ্ধে মার্কসবাদী তাত্ত্বিকদের ক্রমবর্ধমান প্রতিবাদ প্রতিরোধ করার জন্য বিংশ শতকের বিভিন্ন রাষ্ট্র দার্শনিক তাঁদের চিন্তা-ভাবনার কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে রাষ্ট্রতত্ত্বের অবতারণা করেছেন। বিংশ শতাব্দীর নয়া-উদারনীতিবাদী চিন্তা-ভাবনার জগতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হলেন মার্কিং চিন্তাবিদ জন রলস্ । তিনি ন্যায়বিচার সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে প্রকাশ করেন যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কল্যাণকর রাষ্ট্রের ভূমিকার অধীনে ব্যক্তি সুরক্ষিত ও স্বাধীন। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'A Theory of Justice' (১৯৭১ সালে) এবং 'Practical Liberalism' (১৯৯৩ সালে) গ্রন্থদ্বয়ে ন্যায়বিচার সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনা বিশদভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি তাঁর ন্যায়বিচার তত্ত্বের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে দিয়ে আধুনিক রাজনৈতিক নয়া-উদারনৈতিক দর্শনের এক নতুন প্রানসঞ্চার করে তাকে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

জন রলস্ রাষ্ট্রদর্শনকে উপযোগবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত করে এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নৈতিকতার ভিত্তি স্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। আমরা সকলেই জানি বেন্থামীয় উপযোগবাদের মূল বক্তব্য ছিল যে, রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হল সমাজের বেশিরভাগ অর্থাৎ সংখ্যাধিক্য মানুষের জন্য সর্বাধিক সুখের ব্যবস্থা করা । জন রলস এই বক্তব্যের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন- **প্রথমতঃ-** সংখ্যাগরিষ্ঠের মঙ্গল চাওয়া যদি এই দর্শনের মূল লক্ষ্য হয়, তাহলে সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থ কে দেখবে ? আবার **দ্বিতীয়তঃ-** আপত্তিটি হল সর্বাধিক প্রার্থীর সুখ আনাই যদি প্রত্যেক ব্যক্তির মূল লক্ষ্য হয় তাহলে সমাজ জীবনে ব্যক্তির ত্যাগ স্বীকার নৈতিকতার ক্ষেত্রে কোন মূল্য থাকে না। অথচ আত্মত্যাগ হল এক মহৎ নৈতিক মূল্যবোধ। এজাতীয় নৈতিক মূল্যবোধ ব্যতিরেকী কি আদর্শ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব?

রলস্ আর্থ ও সামাজিক সম্পদ বণ্টন এর ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি এক বিকল্প ধারণা গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তিনি কান্টীয় দর্শনে আস্থা রেখে ব্যক্তির নৈতিক সত্তার প্রতি শ্রদ্ধা বা মর্যাদা দেখান এবং অন্যান্য সমস্ত দাবির উপর ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা মেনে নেন। এইভাবে সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষের স্বার্থ

রক্ষার কথা মাথায় রেখে তিনি এমনভাবে সম্পদের ন্যায্য বণ্টনের নিয়ম নির্ধারণ করেন, যাতে করে সমাজে প্রত্যেকে ন্যায়বিচার পায়। আর এই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি দুটি প্রধান তত্ত্বের অর্থাৎ উপযোগবাদ এবং সজ্ঞাবাদের সমালোচনা করেন। যা আমার লেখার শুরুতেই আলোচিত হয়েছে।

রলস্ চুক্তিবাদী লক, রুশো এবং কান্ট এর দর্শন অনুসরণ করে চুক্তিবাদী তত্ত্ব ব্যবহার করলেন।[177] তবে তিনি কিভাবে এই তথ্য প্রয়োগ করেছেন সে বিষয়ে যাবার আগে, তিনি কিভাবে উপযোগবাদ ও মার্কসীয় অর্থাৎ মার্কসবাদ এর যুক্তিগুলি খণ্ডন করেছেন তা আলোচনা করা প্রয়োজন। রলস্ খুব সুকৌশলে উপযোগবাদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সুখের ব্যবস্থার জন্য ব্যক্তি অধিকারের প্রশ্নটি নির্বুদ্ধিতার প্রশ্ন বলে এড়িয়ে যান।

অপরপক্ষে মার্কসবাদীদের শ্রেণী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে ব্যক্তি অধিকারকে পুঁজিবাদের স্বার্থসিদ্ধি বলে উপহাস করেছেন। রলস এই দুই চ্যালেঞ্জের প্রতিরোধ করার জন্য তিনি চুক্তি মতবাদে লক ও রুশোর চিন্তাভাবনাকে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন

রলস্ এর চিন্তা ভাবনায় চুক্তিতত্ত্বের ক্ষেত্রে আমাদের অন্তত দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

প্রথমত:- সামাজিক শৃঙ্খলার প্রশ্নটি সাধারণ মানুষের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ যে প্রাকৃতিক রাজ্য বা সমাজ থেকে চুক্তি সম্প্রদান করে পেরিয়ে এল তা কিন্তু এই সামাজিক শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই। এই যুক্তিকেই রলস মনে করেন এটা একটা ন্যায়বাদীদের প্রকাশ।

দ্বিতীয়তঃ- মানুষ যখন প্রাকৃতিক সমাজরূপী কাল্পনিক অবস্থা থেকে চুক্তির মাধ্যমে এক এক শৃঙ্খলবদ্ধ সমাজ গঠনে ব্রতী হয়, তখন সেই কাঙ্ক্ষিত ব্যবস্থাটা

---

[177] Bhargava, Rajeev, Acharya, Ashok (Edit.), *Political Theory An Introduction*, Pearson, 2008, p-240.

কেমন হবে তাও ব্যক্তি পছন্দ করে নেয়। ব্যক্তির এই বাছাই করার সামর্থ্যই প্রমাণ করে যে প্রত্যেক ব্যক্তি যুক্তিবোধ সম্পন্ন অর্থাৎ কোন বিষয়টি তার ক্ষেত্রে মঙ্গলজনক ও সঠিক এই বিষয়টি বেছে নেওয়ার ক্ষমতা তার আছে।

রলস্ তাঁর নয়া-উদারনীতিবাদী তত্ত্বকে বেন্থামের উপযোগবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত করে বণ্টনমূলক ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। রলস্ উপযোগবাদকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন এই কারণে যে, উপযোগবাদে সামাজিক মঙ্গল সাধনে ব্যক্তির ত্যাগ স্বীকার ও সংখ্যালঘু ব্যক্তির মঙ্গলের কথা ভাবা হয় নি। রলস্ যখন তাঁর এই তত্ত্ব নির্মাণ করেন 1960 এর দশকের শেষের দিকে, তখন একটি চ্যালেঞ্জ তাঁর সামনে উপস্থিত হয়েছিল, সেটি হল জনগণ মনে করতে থাকে একমাত্র মার্কসবাদ ভিত্তিক সমাজতন্ত্রের মাধ্যমেই সমাজে ন্যায্য বণ্টন সম্ভব। রলস্ তাঁর ন্যায়নীতির তত্ত্বে দেখালেন উদারনীতিবাদের সঙ্গে ন্যায়নীতির সহাবস্থান সম্ভব তো বটেই এবং সেই সঙ্গে তার একান্ত ভাবে প্রয়োজনীয়তা আছে ন্যায়নীতি সম্মত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য।[178]

রলস্ এর ন্যায়নীতি উদারনীতি তত্ত্বে পুঁজিবাদীদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের মিলন ঘটিয়েছে যা উদারনীতিবাদী রাষ্ট্রচিন্তায় গুরত্বপূর্ণ অবদান। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'A Theory of Justice' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 2 লক্ষ কপি বিক্রি হয় এবং কয়েক বছরের মধ্যে এই গ্রন্থটিকে কেন্দ্র করে প্রায় 5 হাজার প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় আটলান্টিক সাগরের দুই তীরের দেশগুলিতে। বস্তুত রলস্ উদারনৈতিক রাষ্ট্রচিন্তার পুনর্জন্ম ঘটিয়েছেন। রলস্ এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কিভাবে একটি ন্যায়নীতিসম্মত সমাজ গড়ে তোলা যায় তা অনুসন্ধান করা এবং তা অনুসন্ধান করতে গিয়ে রলস্ সামাজিক চুক্তির পদ্ধতিটিকে ব্যবহার করেছেন। কারণ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল উদারনৈতিক রাজনীতির যে রূপরেখা লক তৈরি করেছিলেন, যেখানে আরোবেশি সমতাকে কিভাবে নিয়ে আসা যায়, মাকসবাদের চেয়েও বেশি স্বাধীনতার কথা বলবে এমন একটি তত্ত্ব তৈরি করা যায়। আর তা করতে গিয়ে রলস্ লকের প্রকৃতি রাজ্যের ধারণার মতোই প্রারম্ভিক অবস্থার কথা বলেছেন

---

[178] Ibid, p-303.

(Original Position)। এই প্রারম্ভিক অবস্থানে মানুষ এক ধরনের অজ্ঞতার আড়ালের মধ্যে বাস করত বলে তিনি মনে করেছেন। এই প্রারম্ভিক অবস্থানে মানুষের জ্ঞানছিল অসম্পূর্ণ এবং বিচারবুদ্ধি ছিল সীমিত। এই অবস্থা সম্পর্কে কোন মানুষেরই তার নিজস্ব শ্রেণী বা সামাজিক মর্যাদার অবস্থান সমন্ধে ধারণা ছিল না। ফলত সমাজে এক ধরনের অজ্ঞতা প্রসূত পূর্ণসাম্য বিরাজ করত। এই রকম একটা অজ্ঞতার অবস্থাতে মানুষ সামাজিক চুক্তিতে সম্মত হয়ে ন্যায়নীতির মূল বিষয় সমন্ধে এক ঐক্যমতে পৌঁছেছিলেন।

> “………. The idea is to stipulate the features of this situation so that we can recognize that whatever principles would be chosen there would be just. Because we want the principles to be fair to all citizens, we want to force the parties in the choice situation to select only those principles that they believe could be justified to everyone. We do this by imagining them behind a ‘veil of ignorance’ that denies them knowledge of any identifying or specific information about themselves or their society. The idea is that since they do not know which social position or set of values they will turn out to hold when the veil of ignorance is lifted, they are forced to consider how the choice of principles would affect everyone. Rawls calls this purely hypothetical choice situation ‘The original position’ ”[179]

রলস্ এই সামাজিক চুক্তির মতোই প্রারম্ভিক অবস্থাকে ব্যবহার করেছেন একটি সুশাসিত, সুনিয়ন্ত্রিত ন্যায়নীতি ভিত্তিক সমাজকে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় যুক্তি

---

[179] Jon Mandle, *Rawls A Theory of Justice: An Introduction,* New York, Cambridge University Press, 2009, p- 13.

সাজিয়ে নিয়েছেন এবং উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মূল্যবোধের সঙ্গে সম্পদ পুনর্বণ্টন সংক্রান্ত আদর্শকে মেলাতে চেয়েছেন।

রলস্ দেখিয়েছেন, প্রারম্ভিক অবস্থানে অজ্ঞতার ঘেরাটোপের মধ্যে মানুষ কতগুলি- সামাজিক, প্রাথমিক জিনিস (Social Primary Goods) লাভ করার জন্য চুক্তি করেছিল। রলস্ মনে করেন ব্যক্তি হল স্বাধীন, নৈতিক যুক্তিগ্রাহী এবং আত্মস্বতন্ত্র। ব্যক্তির এই ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই রলস্ বলতে চেয়েছেন, যেহেতু তারা অজ্ঞতার ঘেরাটোপে ছিল অর্থাৎ চুক্তিকারিরা চুক্তির সমাজ ব্যবস্থায় এবং কতটা ক্ষমতা ভোগ করবেন তা জানতো না বলেই প্রয়োজনীয় সামাজিক প্রাথমিক জিনিসগুলিকে যতদূর সম্ভব ন্যায্যভাবে বণ্ঠন করার নীতি তারা গ্রহণ করেছিল। এই ন্যায্যতাকে রলস তাঁর ন্যায়নীতি তত্ত্বে বলতে চেয়েছেন সমাজে সব রকমের সামাজিক প্রাথমিক জিনিস- স্বাধীনতা, সুযোগ, আয়, সম্পদ এবং আত্মমর্যাদা দানকারী বিষয়গুলি সমভাবে বণ্ঠিত হওয়া উচিৎ। এই বিষয়গুলি অসমভাবে বণ্ঠন করা যেতে পারে, যদি তার দ্বারা সমাজে সবচেয়ে অসুবিধায় আছে এমন শ্রেণীর মানুষের উপকার হয়। এই কাজ করতে গিয়ে রলস্ তাঁর ন্যায়নীতির দুটি মূলনীতির এবং দুটি অগ্রাধিকারের বিধির কথা বলেছেন। রলস্ এর ন্যায়নীতির প্রথম নীতিটি হল i) সকলের জন্য মৌল স্বাধীনতা (Equial) সুনিশ্চিত করা।

> “Each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others.”[180]

দ্বিতীয়টি হল- ii) সকলের সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে ন্যায়সম্মত সমতা।

> “Social and Economic inequalities are to be arranged so that they are both 1) reasonable expected to be to everyone’s

---

[180] Rawls, Jhon, *A Theory of Justice*, London, Oxford University Press, 1972, p-60.

> advantage, and 2) attachedto position and office open to all."[181]

এই দুই নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দুটি অগ্রাধিকারের নীতি- (a) স্বাধীনতার গুরুত্ব সুযোগের সমতা থেকে বেশি।

(b) দ্বিতীয় অগ্রাধিকারের বিধিতে বলা হয়েছে, সুযোগের ন্যায়সম্মত সমতা বণ্টন ব্যবস্থার দক্ষতার (Efficency) চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে। অর্থাৎ বণ্টন ব্যবস্থাতে দক্ষ প্রশাসনের মাধ্যমে ন্যায়সম্মত করতে গিয়ে কখনোই যেন সবার জন্য সুযোগের ন্যায়সঙ্গত সমতা লঙ্ঘন করা না হয়। রলস্ এর প্রথম নীতিটিতে বলা হয়েছে- ব্যক্তির স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করতে না পারলে ন্যায়নীতির কোন অর্থই হয় না। রলস্ এর ন্যায়নীতির দ্বিতীয় নীতিতে ন্যায়সম্মত সমতা বোঝাতে গিয়ে তিনি Maximin Principle কথাটি ব্যবহার করেছেন। এর অর্থ হল যারা সবচেয়ে কম সুবিধা পাচ্ছে, তারা সবচেয়ে বেশি সুবিধা পাবে। এই নীতির ফলে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সুযোগ সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে যে অসমতা রয়েছে তা কিছুটা হলেও দূর করা সম্ভব হবে। তাঁর মতে সামাজিক ন্যায়নীতির অর্থই হল সমাজে সুযোগ সুবিধা ভোগের একটি নিম্নতম মান থাকা উচিৎ। এই সমাজে সমাজের প্রান্তবাসীদের উন্নয়ন ঘটাতে চেয়েছিলেন রলস্। রলস্ এর এই দ্বিতীয় নীতির মধ্যে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের আদর্শ প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। রলস্ এই দ্বিতীয় নীতিতে বলেছেন- যাদের একই ধরনের গুন ও দক্ষতা আছে তাদের সবার জন্য জীবন বিকাশের সুযোগ সমান করে দিতে হবে এবং সেক্ষেত্রে তিনি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপকেও মেনে নিতে রাজি কিন্তু ব্যক্তিস্বাধীনতাকে কোন ভাবে ক্ষুন্ন করার পক্ষপাতি নন।[182]

---

[181] Ibid, p-60.

[182] Gauba, O. P, *An Introduction to Political Theory*, 4th Edition, Macmillan, 2006, pp-383-384.

৫.৩ রবার্ট নোজিক

১৯৭০ এর দশকে উদারনৈতিক রাষ্ট্রদর্শনের এক ভিন্ন রূপ পরিলক্ষিত হয়। সীমিত রাষ্ট্রের ধারণার পরিবর্তে রাষ্ট্র কর্তৃত্বকে হঠাৎ ক্ষমতা সম্পন্ন করে তোলার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। যার ফল হল বিংশ শতাব্দীর জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের বহিঃপ্রকাশ আর জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রতত্ত্বের মূল কথা হল- আমাদের জীবনে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তি অধিকার, স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক থাকবে। কিন্তু রাষ্ট্র কর্তৃত্বের সদর্থক নিয়ন্ত্রণও থাকবে এবং ব্যক্তির জীবনে কল্যাণ ও উন্নতির জন্য রাষ্ট্রের ভূমিকাও মেনে নিতে হবে। তবে এই তত্ত্বে সাবেকি উদারনীতিবাদের মতো স্বাতন্ত্রবাদের অবাধ ব্যক্তি অধিকার মেনে নেওয়া হয়নি। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের গুরুত্ব পেতে থাকে যুদ্ধে বিধ্বস্ত রাষ্ট্রগুলির পুনর্গঠন এর সময়। এরপর ১৯৩০ সালে জনকল্যাণ রাষ্ট্র আরো সরল এবং জনপ্রিয় ধনতান্ত্রিক সভ্যতায় দেশব্যাপী যখন অর্থনৈতিক মন্দার কারণে রাষ্ট্র কর্তৃত্বের শক্তসমর্থনের নেতৃত্ব ব্যতীত বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন সম্ভব ছিল না।

তবে যাই হোক ১৯৭০ এর পর থেকে উদারনৈতিক রাষ্ট্রদর্শনের তত্ত্বে আবার এক পরিবর্তনের ঢেউ উঠতে শুরু করে। আধুনিক বিশ্বায়নের আবর্তে নিয়ন্ত্রণকারী রাষ্ট্রের পরিবর্তে পুনরায় সেই সাবেকী অর্থাৎ ধ্রুপদী উদারনৈতিক রাষ্ট্র তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা পেতে শুরু করে। ১৯৭০ সালে ধ্রুপদী উদারনৈতিক মতবাদের পুনর্বর্তনের এই পদ্ধতির শুরু হয়েছিল এবং তা একবিংশ শতকের শুরুতে গাড় হয়ে ওঠে। সাবেকি বা ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের পুনরাবর্তনের পক্ষে যে সমস্ত রাষ্ট্র দার্শনিকগণ সয়াল করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অন্যতম দার্শনিক হলেন রবার্ট নোজিক। রবার্ট নোজিক হলেন ন্যূনতম ক্ষমতা সম্পন্ন রাষ্ট্রের ধারণার প্রবর্তক। রাষ্ট্রকে স্বল্প ক্ষমতা দানের মধ্যে দিয়ে বাঁচিয়ে রেখে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করতে চেয়েছেন। রবাট নোজিক রাষ্ট্রের এই স্বল্প সীমাবদ্ধ ক্ষমতা অবশ্যই ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করার কাজেই ব্যবহার করবেন বলে মনে করেছেন। এই কারণে তাঁর নয়া-উদারনীতিবাদী চিন্তাধারা অনুযায়ী রাষ্ট্র হল নির্দিষ্ট গন্ডী ও ক্ষমতা সম্পন্ন রাষ্ট্র।

জন রলস্ এর ন্যায়বিচার সংক্রান্ত তত্ত্বের বিরোধিতা করেই নোজিকের তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। নোজিক কোন ভাবেই রলস্ এর মতো রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপকে মানতে চাননি। সামাজিক উপযোগের যুক্তি দেখিয়ে বা রলস্ এর মতো ন্যায্যতার যুক্তি দেখিয়ে ব্যক্তির জীবনযাপন প্রক্রিয়ায় ও সম্পত্তির ভোগ দখলে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপকে কোন ভাবেই সমর্থন করেন নি। নোজিক শুধু ততটুকুই রাষ্ট্রকে ক্ষমতা দিতে রাজি যেটুকু ক্ষমতা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক হবে।

নোজিক মূলত ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করার লক্ষ্যেই রাষ্ট্রের এই ন্যূনতম কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার কথা বলেছেন। এই ন্যূনতম কর্তৃত্ব ও সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে দিয়েই রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার পেছনে আসল উদ্দেশ্য ছিল যে, ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করা। তিনি নৈরাজ্যবাদীদের মত রাষ্ট্রের ধ্বংস চান না। আবার আদর্শবাদীদের মতো রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হোক সেটাও চাননি। বরং তিনি চেয়েছেন ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তার মুক্ত বাণিজ্যের অধিকার। ব্যক্তির বাণিজ্য সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদিকে সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্রের হাতে ন্যূনতম ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছেন। নোজিক তাঁর ‘Anarchy state and Utopia’ গ্রন্থে ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষাকারী সীমাবদ্ধ ন্যূনতম ক্ষমতা সম্পন্ন রাষ্ট্রের ইতিবাচক ভূমিকার কথা তুলে ধরেছেন। নোজিক মূলত ন্যূনতম রাষ্ট্রের ধারণা তত্ত্বটি প্রচার করেন মুক্ত-বাণিজ্য, ব্যক্তির সম্পূর্ণ সম্পত্তির অধিকার এবং ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে।

নোজিকের মতে প্রকৃতিক রাজ্যে বসবাসকারী মানুষ প্রথমে চুক্তি করেন ব্যক্তির জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার্থে। যে চুক্তির মাধ্যমে মানুষ নিজেদের স্ব-ইচ্ছায় সম্পত্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্র ব্যক্তির জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব পায়। তার মতে মানুষ নিজেরা স্বেচ্ছায় এই দায়িত্ব রাষ্ট্রকে দেয়। সুতরাং এটা ছিল ন্যায়সম্মত দায়িত্ব অর্পণ। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কাজ হবে ব্যক্তির জীবন ও তার সম্পত্তি রক্ষা করা এছাড়া কিছুই নয়। এই সূত্রের ভিত্তিতে নোজিক রলস্ এর তীব্র সমালোচনার মুখে দাঁড় করিয়েছিলেন। তিনি ব্যক্তির জীবনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপকে মেনে নেননি, এমন কি রাষ্ট্র ন্যায়ভিত্তিক সম্পদ

বণ্টনেরও অধিকারী নয় বলে মনে করেন। নোজিক নূন্যতম রাষ্ট্রের ধারণা মুক্তবাজার অর্থনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নোজিক প্রশ্ন তুলেছেন রাষ্ট্রের আদৌও থাকা উচিত কিনা? তিনি চান তাঁর নূন্যতম রাষ্ট্রে নাগরিকরা নিজেদের কিছু অধিকার ত্যাগ করে একটি পারস্পরিক রক্ষা সমিতি গড়বেন। তাদের ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার জন্য এবং পারস্পরিক অধিকার রক্ষার জন্য। তিনি নূন্যতম রাষ্ট্র এবং সৃষ্টিশীল ব্যক্তি পছন্দ করেন। তাঁর মতে ন্যূনতম ক্ষমতা সম্পন্ন রাষ্ট্রের একমাত্র দায়িত্ব হল ন্যায়সম্মতভাবে স্বত্বাধিকারী অধিকার গুলিকে রক্ষণাবেক্ষণ করা। রাষ্ট্র যদি সমাজের সম্পদ সমবণ্টনের অজুহাতে ব্যক্তির জীবনে হস্তক্ষেপ করে তাহলে ব্যক্তির স্বাধিকার ক্ষুন্ন হবে।

তাই নোজিক কান্টকে অনুসরণ করে বলেন যে, 'মানুষ সৃষ্টিশীল বুদ্ধিবাদী স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির ধারক'। মানুষ তার স্বভাব বশেই নীতিবোধ সম্পন্ন। সুতরাং রাষ্ট্র- যুক্তিসম্মতভাবে কখনোই এই সৃষ্টিশীল ও নৈতিক দিক থেকে উন্নত মানুষের উপর অভিভাবকত্ব দেখাতে পারে না।

নোজিক ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকারের ক্ষেত্রে যে বক্তব্য তুলে ধরেছেন তা কিন্তু কোন ভাবেই নৈরাজ্যবাদকে প্রশ্রয় দেয়নি বলেই তিনি দাবি করেন। কারণ ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন রাখতে গিয়ে রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সীমিত করার অর্থ- রাষ্ট্রের বিলুপ্তি করা নয়। বরং তিনি ন্যূনতম ক্ষমতার পরিসরে- রাষ্ট্রকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছেন। রাষ্ট্রের ন্যূনতম ক্ষমতা দেওয়ার মূল লক্ষ্য হল, যে রাষ্ট্র তার ন্যূনতম ক্ষমতার পরিসরের মধ্যে থেকেই নাগরিকদের স্বাধীনতা, অধিকার ও সম্পত্তির সুরক্ষিত করবে। অর্থাৎ রাষ্ট্র তার জনগণের ভীতি প্রদর্শন, অর্থ তচ্ছরূপ, চৌর্যবৃত্তি এবং আরোপিত চুক্তির ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল অভিভাবকের মতো সযত্নে ও কঠোরভাবে রক্ষা করবে।

রবার্ট নোজিকের লেখায় যে তত্ত্বটি খুবই মূর্ত হয়ে উঠেছে, সেটি হল ব্যক্তির স্বত্বাধিকার তত্ত্ব বা (Entitlement Theory)। তাঁর মতে প্রত্যেকটি মানুষের স্বাতন্ত্র জীবন আছে। অতএব আমাদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। এই যুক্তি থেকে তিনি একটি নৈতিক যুক্তি উপস্থাপনা করে বলেছেন যে, অপরের স্বার্থে নিজের স্বতন্ত্র

সত্তাকে সমর্পণ করা উচিত নয়। কারণ একজনের জীবন অপরের সুখ সমৃদ্ধির সম্পদ বৃদ্ধি উৎস হিসেবে গণ্য করা কখনোই নীতিসম্মত নয়। তবে কোন ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় তার নিজের স্বার্থ অপরের জন্য ত্যাগ করতে চান সেটা অবশ্যই গৌরবের বিষয়। কিন্তু কারোর উপর জোরপূর্বক আত্মসামর্থ্য বিসর্জন যুক্তিসম্মত নয়। এখন কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে যে, কেউ যদি সমষ্টি কল্যাণের প্রয়োজনে ব্যক্তি স্বার্থের বিসর্জন চায় সেক্ষেত্রে সেটা হবে ব্যক্তি সত্তার পৃথকত্ব বা স্বতন্ত্রের ধারণার বিরোধী। এই যুক্তিকে আঁকড়ে ধরে নোজিকের প্রথম সিদ্ধান্ত হল যে, প্রতিটি ব্যক্তির নিজের এই স্বাধীনতা আছে যে, সে তার জীবনকে কিভাবে পরিচালনা করবে এবং নিজের অধিকারকে কিভাবে ব্যবহার করবে। এ প্রসঙ্গে জন স্টুয়ার্ট মিল বলেন যে ব্যক্তি তার নিজের শরীর আত্মা মনের বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে সার্বভৌমের অধিকারী। সেক্ষেত্রে মিলের সঙ্গে নোজিকের একটা বিরাট সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। নোজিক ব্যক্তি স্বাধীনতার একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন, সেই সুবাদেই তিনি একজন ব্যক্তির স্বার্থে অপর ব্যক্তির আত্মত্যাগ করাকে অনুচিৎ বা ঘোরতর অন্যায় বলেছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে কোন একজন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির ব্যবহারের বস্তু হতে পারে না। প্রত্যেক মানুষের একটা নিজস্ব জায়গা বা Space তথা আত্মস্বাতন্ত্র আছে। আর এই আত্মস্বাতন্ত্র সত্তাকেই তিনি Separateness of Person বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এই ভাবেই নোজিক ব্যক্তির আত্মসত্তা বা Self Ownership তত্ত্ব উপস্থাপনা করেছেন। এই তত্ত্বের আসল বিষয় হল নিজের জীবন, স্বাধীনতা এবং তার জীবনসঙ্গী নির্বাচন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বাধীন অধিকার থাকবে।

নোজিক ব্যক্তির আত্মস্বত্ত্বার ধারণার বিষয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যক্তির আত্মপরিচয় গড়ে তুলে ব্যক্তিকে আত্মসত্তার চেতনায় সচেতন করে তোলে। তাই ব্যক্তির নিজস্ব সম্পত্তির উপর কোনো রকমেই আঘাত অভিপ্রেত নয়। তিনি একমাত্র শান্তি ও আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে

ব্যক্তির উপর আঘাতকে মান্যতা দিয়েছেন। তাহলে এখানে আমরা জন লকের সাথে নোজিকের সাদৃশ্য লক্ষ্য পরিলক্ষিত হয়।

নোজিকের মতে ন্যূনতম রাষ্ট্রের একমাত্র কাজ হবে ব্যক্তির স্বাধীনতা, সম্পত্তি, এবং আত্মসত্তাকে নিরাপদে রাখা। আর যে রাষ্ট্র উক্ত কাজ করতে সক্ষম, সে রাষ্ট্রই জন সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে মান্যতা লাভ করবে। আর যে রাষ্ট্র উক্ত কাজ করতে ব্যর্থ হবে, সে রাষ্ট্রের কোন কাজই জনগণের কাছে বৈধ বলে বিবেচিত হবে না। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকারের একটি সুরক্ষিত ক্ষেত্র বা Protective Sphere থাকে, সেখানে রাষ্ট্রের অবৈধ অনুপ্রবেশ একদমই নিষিদ্ধ। নোজিকের মতে এমন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্তব্য হল ব্যক্তির অধিকারের ক্ষেত্রকে সুরক্ষিত এবং সম্পূর্ণ নিরাপদে রাখা ও সমস্ত বাইরের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করা, যাতে রাষ্ট্র ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য তথা ব্যক্তির আত্মসত্তার মর্যাদাকে বজায় রাখতে পারে।

নয়া-উদারনীতিবাদী দার্শনিক রবার্ট নোজিক ব্যক্তি স্বাধীনতার সুরক্ষিত ক্ষেত্রটিকে পুরোপুরি ভাবে নিরাপদে রাখার জন্য ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারটিকে সম্পূর্ণভাবে নিরাপদে রাখার কথা বলেন। তিনি মনে করতেন ব্যক্তির জীবন ও স্বাধীনতার অধিকারের মতো ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকারটিও সুরক্ষিত রাখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ সম্পত্তির অধিকারটিও ব্যক্তির সুরক্ষিত ক্ষেত্রের একটি অংশ। তিনি যে দুটি প্রাথমিক পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পত্তির মালিকানার বিষয়টিকে উপস্থাপনা করেন, তা হল -

১) প্রথাগত ভাবে সম্পত্তি ব্যক্তি কর্তৃক অর্জন করা যেতে পারে,

২) আর যে সমস্ত বিশেষ ক্ষেত্রগুলিতে সম্পত্তির মালিক থাকে না, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রয়োজন অনুসারে মালিকবিহীন সম্পত্তি গ্রহণ করতে পারে।

নোজিক সম্পত্তি অর্জন এবং ভোগ দখলের ক্ষেত্রে দুটি নীতির কথা বলেন, তা হল সম্পত্তির হস্তান্তরের ন্যায্যতা বা Justice Transfer of Property এবং রাষ্ট্র দ্বারা সম্পত্তি অধিগ্রহণের ন্যায্যতা বা Justice in Acquisition of Property বা উক্ত

নীতি দুটির মাধ্যমে সম্পত্তি ভোগ দখলের অধিকার বা মালিকানার বৈধতাকে বিচার করেছেন।

রবার্ট নোজিক মনে করতেন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর যেমন তার অধিকার আছে, তেমনি সেই অধিকারকে নিরাপদে রাখার জন্য জনকল্যাণ রাষ্ট্র সমাজে বিভিন্ন প্রকার প্রতিষ্ঠানেরও প্রতিষ্ঠা করে। যেমন- আইন, আদালত, থানা, পুলিশ ইত্যাদি। এই সমস্ত প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যক্তির অধিকারকে সুরক্ষিত রাখা হয়। যদি কোন কারণে কোন অধিকার খর্ব হয় তাহলে ব্যক্তির অধিকারকে ফিরে পেতে ব্যক্তি প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান, থানা, আদালত, প্রভৃতির দ্বারস্থ হন। এই কারণেই নোজিক ব্যক্তির অধিকারকে সুরক্ষিত বা নিরাপদে রাখার জন্য রাষ্ট্রের হাতে ন্যূনতম ক্ষমতা প্রদানের পক্ষপাতি।

এইভাবে নোজিক আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন রাষ্ট্র শুধুমাত্র ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতাকে নিরাপদে রাখার সংস্থা মাত্র। তাঁর মতে রাষ্ট্র ব্যক্তির অধিকার রক্ষাকারী নৈশ প্রহরী বা (Night Watchman) ছাড়া কিছুই নয়, তাই নৈশ প্রহরী রাষ্ট্রের অবশ্যই প্রয়োজন আছে ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য।

৫.৪ ফ্রেডরিক হায়েক

৮০র দশকে বিশ্বায়নের অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সাংস্কৃতির যুগ ব্যাপ্ত হয়ে ওঠে। এই সময়ে আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপে বিশ্বায়নের দাপটে কেইনসীয় অর্থনীতি এবং কল্যণব্রতী রাষ্ট্রের তত্ত্ব আস্তে আস্তে জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে। তার আসল কারণ ছিল উৎপাদনের শ্লথতা, দ্রব্যসামগ্রীর ও পরিষেবার সাময়িক মূল্যে সমন্বয়ের অভাব, অর্থনৈতিক জীবনে বিশৃঙ্খলা সহ বিভিন্ন স্থানে শ্রমিক আন্দোলনে মাত্রাতিরিক্ত জঙ্গি মনোভাব। এই পরিস্থিতিতে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের পশ্চিমী দেশগুলিতে উদারনৈতিক রাষ্ট্রতন্ত্রের নতুন এক পরিশ্রুত রূপ দেখা যায়, যা ৮০র দশকে নয়া-উদারনীতিবাদ নামে পরিচিতি লাভ করে । অর্থাৎ ধ্রুপদী রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির সংশোধিত আধুনিক নামই হল- 'নয়া-উদারনীতিবাদ'। আর নয়া উদারনীতিবাদের মূল লক্ষ্য হল নিয়ন্ত্রণকামী রাষ্ট্র ক্ষমতার পরিবর্তে আবার পূর্বের ঊনিশ শতকীয় রাষ্ট্র ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনা।

রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক তাত্ত্বিক চর্চারক্ষেত্রে ফ্রেডরিক হায়েক হলেন একজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। হায়েক রলসের উদারনীতিবাদী তত্ত্বকে নতুনভাবে প্রকাশ করেছে। সেই হিসাবে তাকে নয়া-উদারনীতিবাদী বলা যায়। তিনি ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের পরিসর থেকে বেরিয়ে এসে নয়া-উদারনীতিবাদের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক দর্শনতত্ত্বকে বিশ্লেষণ করেছেন। নয়া-উদারনীতি রাষ্ট্রতত্ত্বের প্রধান দুটি স্তম্ভ হল- ব্যক্তি ও বাজার। এর মূল লক্ষ্য হল রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কাজের পরিধিকে সীমিত করা। আর এই মতবাদে বিশ্বাসী দার্শনিকদের যুক্তি হল- রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত বাজার অর্থনীতির মধ্য দিয়ে উৎপাদন ও বণ্টনের কাজে দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, অর্থনীতি উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে এবং সাধারণভাবে জনগণের সুখ স্বাচ্ছন্দের পরিসর বৃদ্ধি পাবে। নয়া-উদারনীতিবাদীদের মতে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ব্যক্তিস্বাধীনতা বিনষ্ট হয়। সে কারণে অর্থনৈতিক প্রগতির বা উন্নতির স্বার্থে বেসরকারি ব্যক্তি উদ্যোগ বিশেষভাবে প্রয়োজন। এঁরা রাষ্ট্র ও সমাজের পরিবর্তে ব্যক্তি এবং পরিবারকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। রাষ্ট্র যদি বিরাট দায়িত্ব নিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক চালক হয়ে বসে, তাহলে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের কোন ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকবে না। ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতা বিনষ্ট হবে। তাই এই মতাবলম্বী তাত্ত্বিকগণ মনে করেন, ব্যক্তির নিজস্ব দায়বদ্ধতা বাড়লে এবং তার সঙ্গে ব্যক্তি স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করলে তাদের স্বাধীন উদ্যোগ বৃদ্ধি পাবে এবং একই সঙ্গে তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতাও সুরক্ষিত থাকবে।

হায়েক মনে করতেন, উদারনৈতিক গণতন্ত্রে রাষ্ট্র আস্তে আস্তে বা ক্রমশ মানুষের স্বাধীনতা হরণ করতে এগিয়ে আসবে এবং সাধারণ মানুষের দাসত্বের পথ প্রসারিত হবে। তাঁর এই সমস্ত চিন্তাভাবনা পরিস্ফুট হয়েছে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Road Of Serfdom' বা 'দাসত্বের পথ' এই গ্রন্থটিতে । এই গ্রন্থেই তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে পুঁজিবাদী উদার গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের পথ ধরে সাধারণ জনগণের জীবনে দাসত্ব নেমে আসে। তিনি এই বিষয়টি বাস্তবসম্মত ভাবেই বিশ্লেষণ করেছেন ।

১৯৩০ শতক থেকেই কেইনসীয় অর্থনৈতিক মডেলের বিরোধিতা করতে থাকেন হায়েক । তিনি ১৯৪৪ সালে 'The Road Of Serfdom' গ্রন্থে পরিষ্কারভাবে তুলেধরেন, সমাজতন্ত্রবাদ ও নাৎসিবাদের বৈশিষ্ট্য মূলত একই । প্রকৃতপক্ষে নাৎসিবাদে যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রাধান্য তার মূলে ছিল সমাজবাদী চিন্তাভাবনাই। তাই হায়েক বলেছেন, পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন উদারনীতিবাদী রাষ্ট্র কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের ভূমিকা পরিগ্রহ করেছে। অর্থাৎ আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রগুলিতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণ করেছে। যেমন, শিশুদের দুধ থেকে আরম্ভ করে মৃত মানুষের সৎকার পর্যন্ত গোটা জীবনটাই সরকারি নিয়ন্ত্রণ এবং অনুদানের মধ্যে দিয়ে চলেছে। তাই বলা যায়, Welfare State আর Totalitarian রাষ্ট্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই- একই মুদ্রার দুটি তলমাত্র। সুতরাং তাঁর মতে জনগণের সভ্যতা এবং তাদের ঐতিহ্যকে বাঁচাতে হলে এই দেশ গুলির উচিত ধ্রূপদী উদারনীতিবাদের মূল নীতিগুলিতে ফিরে যাওয়া। অর্থাৎ আইনের অনুশাসনের মধ্যে থেকে সীমিতরাষ্ট্রের চিন্তাভাবনায় ফিরে যাওয়া ।

হায়েক পুঁজিবাদী উদার গণতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ফলে সাধারণ জনগণের দাসত্বের পথ তৈরি হওয়ার বিষয়টিকে প্রাথমিক ভাবে অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং এটি করতে গিয়ে পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র যেভাবে বাজার অর্থনীতিকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে থাকে, তার চরম বিরোধিতা করেছেন। তাঁর এই চিন্তা-ভাবনা ইংল্যান্ডের মুক্ত বাণিজ্যনীতির সমর্থকগণের অর্থাৎ কেইনসীয় কল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণাবিরোধী মানুষের কাছে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল।

তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, হায়েক কেবলমাত্র মুক্ত বাণিজ্য নীতিরই সমর্থক ছিলেন না, তার সঙ্গে তিনি ব্যক্তি স্বাধীনতারও একান্ত সমর্থক ছিলেন । ১৯৪০ এর দশকের শেষের দিকে হায়েকের দেখানো পথ অনেক উদারনৈতিক সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্যতা না পেলেও ১৯৫০-৬০ এর দশকে পশ্চিম জার্মানি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কিছুটা শিথিল করে উৎপাদনের ক্ষেত্রে তারা চমৎকার বৃদ্ধি

ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল । জার্মানির এই পথ ধরেই জাপানও বিপুল পরিমাণে অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটিয়ে ফেলে ।

হায়েক তাঁর 'The Constitution Of Liberty'(১৯৬০) এবং 'Law Legislation and Liberty'(১৯৭৮) গ্রন্থেদ্বয়ে ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের প্রধান অন্যতম উদাহরণ ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষে জোর সওয়াল করেন। ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের দর্শনের যে মূল রাষ্ট্র বিরোধী ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের অথবা সীমিত সাংবিধানিক রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যক্তির সর্বভৌম অবস্থান নিয়ে যে যুক্তি গুলি ছিল, তাকেই অনুসরণ করে তিনি কথাবার্তা বলেন। কেইনসীয় মডেল তত্ত্বে যে রাষ্ট্র পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির কথা বলা হয়, হায়েক তার বিরোধিতা করে বলেন, এই রাষ্ট্রীয় কর্মসূচীতে দাঁড় করাতে গিয়ে যে পরিমাণে অর্থ ব্যয় করতে হয়, তা একেবারেই অনুৎপাদনশীল। আর এই অর্থ আসে সাধারণ জনগণের করের টাকা থেকে, যার কুফল আমরা সবাই দেখতে পাই। যেমন-কর বৃদ্ধি পেলে সাধারণ জনগণের সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস পায় যার ফলে উৎপাদনে বিনিয়োগযোগ্য মূলধনও হ্রাস পায়। আর সম্পদের উৎপাদন ঘাটতি হল নীট ফল। দ্বিতীয়তঃ- অপরপক্ষে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মাধ্যমে পরিচালিত শিল্পসংস্থা অথবা নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত বেসরকারি উৎপাদন সংস্থাগুলিতে ব্যক্তিগত আগ্রহ নষ্ট হয়। হায়েক ব্যক্তিস্বাধীনতার বিষয়ে তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Constitution Of Liberty' তে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এই ব্যাখ্যায় সীমিত রাষ্ট্রের ধারনাকে সমর্থন করেন এবং অন্যদিকে প্রাচীন মূল্যবোধ, ঐতিহ্য, পারস্পারিক জীবন এবং প্রকৃতির প্রতি দায়বদ্ধতাকেও স্বীকার করেন। তাই হায়েকের আলোচনায় নয়া-উদারনীতিবাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট ভাবে পাওয়া যায়। তাঁর আলোচনায় অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ সীমিত করা এবং অপর দিকে সনাতন মূল্যবোধ ও পারস্পরিক ঐতিহ্যের প্রতি দায়বদ্ধ থাকা, এই দুটি বিষয় আপাত দৃষ্টিতে স্ববিরোধী, তবে উদারনীতিবাদ ও রক্ষণশীলবাদ এই দুই পরস্পরবিরোধী তত্ত্বের সংমিশ্রন আমরা লক্ষ্য করতে পারি হায়েকের নয়া-উদারনীতিতত্ত্বে।

হায়েক কেইনসীয় অর্থনীতির বিরোধিতা করে এবং রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে অর্থনীতির ক্ষেত্রে সংকুচিত করার কথা বলেন। হায়েক মনে করেন যে, আমাদের বর্তমান কালের অর্থনৈতিক, সামাজিক জীবনের অনেক কাজকে ব্যক্তিগত পছন্দের মাধ্যমে নয়, সমষ্টিগত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে হয়ে থাকে। হায়েক এটি মোটেই সমর্থন করেন নি। তিনি তাঁর 'The Constitution of Liberty' গ্রন্থে স্বাধীনতা বলতে বুঝিয়েছেন-

> "The state in which a man is not subject to coercion by the arbitrary will of anather."[183]

হায়েক মনে করেন, যেকোন সমাজকে পরিমাপ করতে হবে স্বাধীনতার ভিত্তিতে। তিনি মনে করেন, ব্যক্তির প্রকৃত পরার্থাবাদিতা মুক্তসমাজেই সম্ভব, তা কোন বলপ্রয়োগকারী সমাজের মধ্যে সম্ভব নই। তাই তিনি জনকল্যাণকর রাষ্ট্রকে বিরোধিতা করেছেন। কারণ তা ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে হ্রাস করে। আর এই ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধই স্বাধীনতা লাভের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি Public এবং Private এই দুই জগতের মধ্যে আইনের ক্ষেত্রে পার্থক্য করেছেন। Public Law এর অর্থ হল কোন বিশেষ সংগঠনের কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে তৈরি আইন। কিন্তু Private Law এর অর্থ বিধি সমূহের অনুপস্থিত নয়। বরং Private Law এর মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রীয় কোন সংস্থার দ্বারা নির্ধারিত কোন উদ্দেশ্যে গতিমুখ চালিত না করা। Public Law নির্দিষ্ট আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করে সরকারি কর্মচারীদের এবং কোন বিশেষ সামগ্রিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহৃত। কিন্তু হায়েক এর মতে Private Law হল Protected Domain উদারনৈতিক সামাজিক বিন্যাসের অপরিহার্য, যার মধ্যে সম্পত্তিও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। তিনি তাঁর 'The Constitution of Liberty' তে দেখিয়েছেন আইন, স্বাধীনতা এবং সম্পত্তি একে অপরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে বাঁধা রয়েছে। তাঁর মতে উদারনৈতিক সামাজিক বিন্যাস বলপ্রয়োগকে এবং ইচ্ছাকৃত রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপকে যথাসম্ভব কমিয়ে

---

[183] Hayek, F. A, *The Constitution of Liberty,* The University of Chicago Press, 2011, p-58.

আনবে। আর নাগরিকদের বস্তুগত সুবিধা সংরক্ষিত করবে বাজারের বাইরে নিরাপত্তার জাল বিছিয়ে। রাষ্ট্রের নির্দেশ নয়, রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগ নয়, ব্যক্তিকে কোন সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্দেশ প্রদান নয়, ব্যক্তিকে দিতে হবে তার কাজ কর্মের অবাধ স্বাধীনতা।[184] J.D. মিলার বলেছেন, হায়েক এর ভাবনায়-

> "liberal political order, composed entirely of such rules, imposed no limits at all on negative liberty in the proper sense of the term."[185]

উদারনৈতিক রাজনৈতিক বিন্যাস সেই সমগ্র বিধি দ্বারা গঠিত যা নেতিবাচক স্বাধীনতার উপর আদৌও কোন সীমাবদ্ধতা আরোপ করেনা। হায়েক স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিসতন্ত্রবাদ, আইন এবং স্বাধীনতার মধ্যে সংযোগ লক্ষ্য করেছেন এবং সেই সংযোগের স্বার্থে তিনি শুধু সমষ্টিবাদকেই বর্জন করেন নি। অবাধ স্বাচ্ছন্দ্যের নীতিকেও বর্জন করেছেন। কারণ তিনি মনে করেন সত্যিকারের স্বাধীন সমাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই সমস্ত আইনের বিকাশ ঘটাবে যা স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন। সংক্ষেপে বলা যায়, হায়েক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তিকেই স্বাধীনতা বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি উদারনীতিবাদকে এমন একটি নীতি বলে ভাবতে চান যা সরকারের বলপ্রয়োগমূলক ক্ষমতাকে সবচেয়ে বেশিভাবে হ্রাস করে। রাষ্ট্র ইতিবাচক ভাবে প্রতিযোগিতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। কোন রকম বলপ্রয়োগমূলক পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে নয়। তাঁর বাজারের কৌশল প্রক্রিয়া সমস্ত প্রয়োজন মেটাতে পারে না। সেই কারণেই রাষ্ট্র প্রত্যেক ব্যক্তি বা পরিবারের নূন্যতম আয়ের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করবে। বাজারের হাতে বণ্টন মূলক ন্যায়ের ব্যবস্থা ছেড়ে দিয়ে নয়। সাম্য এবং স্বাধীনতার প্রশ্নে তিনি বলেছেন যেহেতু ব্যক্তিদের মধ্যে দক্ষতা এবং সামর্থের পার্থক্য রয়েছে, সেহেতু এই

---

[184] Ramaswamy, Sushila, *Political Theory Ideas & Concepts,* Macmillan, 2003, p-262.

[185] Ibid, p-262.

স্বাভাবিক অসাম্যের প্রবণতাকে কোন বলপ্রয়োগমূলক কাজের মাধ্যমে প্রতিহত করা উচিৎ নয়। তিনি তাঁর ‘The Constitution of Liberty’ গ্রন্থে বলেছেন-

> “From the fact that people are very different it follows that, if we treat them equally, the result must be inequality in their actual position, and that the only way to place them in an equal position would be to treat them differently. Equality before the law and material equality are therefore not only different but are in conflict with each other; and we can achieve either the one or the other, but not both at the same time. The equality before the law which freedom requires leads to material inequality. Our argument will be that, though where the state must use coercion for other reasons, it should treat all people alike, the desire of making people more alike in their condition cannot be accepted in a free society as a justification for further and discriminatory coercion.”[186]

যেহেতু জনগণ প্রত্যেকেই বিভিন্ন, সেহেতু যদি তাদের আমরা সমভাবে নিয়ে আসতে চেষ্টা করি তাহলে তার ফলশ্রুতি হবে তাদের প্রকৃত অবস্থানের ক্ষেত্রে অসাম্যকে ডেকে আনা। সুতরাং তাদের সমঅবস্থানে নিয়ে যেতে গেলে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ রাষ্ট্রকে করতে হবে। আইনের চোখে সমতা, যা স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন তা আসলে বস্তুগত অসাম্যের পথেই এগিয়ে যায়। জনগণের অবস্থার মধ্যে সাম্য নিয়ে আসার আকাঙ্খা কোন স্বাধীনসমাজে স্বীকৃত হতে পারে না। কারণ তা বিভেদমূলক বলপ্রয়োগকে আরো বৃদ্ধি করে। সাম্যের বিরুদ্ধে হায়েক এর যুক্তি দুটি অনুমানের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমটি হল- তিনি মনে করেন স্বাধীনতা ব্যক্তির কার্যকলাপের মধ্যে অন্যব্যক্তি

---

[186] Hayek, F. A, *The Constitution of Liberty,* The University of Chicago Press, 2011, p-150.

সমূহ বা রাষ্ট্রের দ্বারা 'বলপ্রয়োগের অনুপস্থিতির' উপর ভিত্তিশীল। দ্বিতীয়টিঃ তিনি মনে করেন ব্যক্তি সমূহের মধ্যে প্রতিভা এবং দক্ষতার যে পার্থক্য রয়েছে এবং আইনের চোখে সমতা প্রতিষ্ঠা যদি একই সঙ্গে চলতে থাকে তাহলে তো অবশ্যই অসাম্যকে ডেকে আনবে ব্যবহারিক জগতে। সেই কারণে তিনি ব্যক্তি সমূহের যেকোন ধরনের বস্তুগত সাম্য বিধানের চেষ্টাকে এড়িয়ে যেতে চান। কারণ তা অপরিহার্য বলপ্রয়োগকে ডেকে আনবে, যা ব্যক্তিকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করবে। তাঁর কাছে স্বাধীনতাই শেষ কথা। তাঁর মতে স্বাধীনতার 'কেক' সকলের মধ্যে সমভাবে বন্টিত হবে, এই নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রগতির পথে প্রত্যেক ব্যক্তির কিছু দক্ষতা বা প্রতিভাকে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই অনেক অজানা সম্ভবনা রেয় গেছে।[187] তাহলে এখন দেখা যাক নয়া-উদারনীতিবাদের মূল বৈশিষ্ট্য গুলি কি কি-

প্রথমতঃ- ন্যূনতম রাষ্ট্র (Minimal State) অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রধান কাজ হবে সমাজে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা । সে কখনোই জনগণের বা সমাজের উন্নতির ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করবে না ।

দ্বিতীয়তঃ- পুনরুজ্জীবিত, সক্রিয় নাগরিক সমাজ (Civil Society),

তৃতীয়তঃ- পারস্পরিক সহযোগিতা স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্বাস ও সমন্বয়ের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সামাজিক পুঁজি (Social Capital),

চতুর্থতঃ- বাজার অর্থনীতি ভিত্তিক গণতন্ত্র (Market Democracy) নয়া-উদারনীতিক দার্শনিকদের মতে, এই ধরনের রাষ্ট্র বহুমাত্রিক রাজনৈতিক স্বার্থের সামাজিক ভিত্তির উপর গড়ে ওঠে। এই জাতীয় শাসন ব্যবস্থায় সব সময় বেসরকারি বিষয়ের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাছাড়া সাধারণ মানুষের সমস্ত অধিকার অর্থাৎ মানবিক অধিকার ও নাগরিক অধিকার রক্ষার জন্য সমস্ত রকমের চেষ্টা করা হয়।

---

[187] Ibid, p-150.

নয়া-উদারনৈতিক রাষ্ট্র তত্ত্বের মূল কথা হল- নিয়ন্ত্রণকারী কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র তত্ত্বের বিরোধী।

এখন দেখা যাক পেশাগত পরিচিতি সংকট সাবেকি উদারনীতিবাদী তত্ত্বে কিভাবে আসে? আমরা যদি সাবেকি উদারনীতিবাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা একটি বিশেষ ভিত্তি এবং এই বৈশিষ্ট্যটি যদি থাকে তাহলে তা থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হবে পুঁজিবাদ। কারণ পুঁজিবাদের রাজনৈতিক দর্শন হল ব্যক্তি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। আর পুঁজিবাদ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হবে অর্থনৈতিক বৈষম্য, যা সমাজে পেশাগত পরিচিতির সংকটটি তৈরি করবে।

ঠিক একইভাবে যদি আমরা আধুনিক উদারনীতিবাদের বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে লক্ষ্য করি তাহলে সেখানেও দেখতে পাবো ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ। তাহলে এক্ষেত্রেও ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকার কারণে এখানেও পুঁজিবাদের জন্ম হবে এবং যা থেকে সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যের সৃষ্টি হবে। যার ফলে আবার সমাজে পেশাগত পরিচিতির সংকটটি তৈরি করবে।

এবার আমরা যদি নয়া-উদারনীতিবাদের দিকে দৃষ্টি দিই তাহলে আমরা দেখতে পাবো নয়া-উদারনীতিবাদী তত্ত্ব যে বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে সেগুলির মধ্যে অন্যতম হলো উন্মুক্ত বাজার, ন্যূনতম রাষ্ট্র এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তি স্বাধীনতা। এক্ষেত্রে উন্মুক্ত বাজার থাকার কারণে পেশাগত পরিচিতির সংকট দেখা দেবে আবার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা থাকার কারণেও পুঁজিবাদের জন্ম হবে এবং তা থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হবে পেশাগত পরিচিতির সংকট।

পরিশেষে একথা বলা যেতে পারে যে, উদারনীতিবাদী তত্ত্বের যে প্রকারগুলি বিশ্লেষণ করা হল তার মধ্যেই পেশাগত পরিচিতির সমস্যাটি সুপ্তাবস্থায় বিরাজমান বলে প্রতীতি হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল এই সমস্যাটি কি থেকেই যাবে? নাকি তা মোকাবেলা করার কোন পথ পাওয়া যেতে পারে? আমরা জানি কোন বিষয়ে সমস্যা যদি থাকে তাহলে তার সমাধানের রাস্তাও নিশ্চয়ই থাকবে, যদি আমরা সমস্যাটিকে সমাধান করতে চাই। যদিও উক্ত সমস্যা সমাধানের এখনো পর্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে কোন সদর্থক

পরিকল্পনা করতে সমর্থ হয়নি ঠিকই, তবুও কতকগুলি পরিকল্পনা আপাত দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সদর্থক ভূমিকা একান্ত জরুরী বলে আমার মনে হয় অর্থাৎ কৃষিজাত পণ্যের বিজ্ঞানসম্মত উৎপাদন, যথার্থ বিপণন পদ্ধতি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে রাষ্ট্রের সদর্থক পদক্ষেপ।

এই অধ্যায়ে বিভিন্ন উদারনীতিবাদী তাত্ত্বিকদের মূল তত্ত্বকে তুলনামূলকভাবে বিচার বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে কিভাবে পেশাগত পরিচিতির সংকটটি তৈরি হতে পারে অর্থাৎ এই উদারনীতিবাদ নামক তত্ত্বের মধ্যেই যে এই পেশাগত পরিচিতির সংকট নামক সমস্যাটি সুপ্তাবস্থায় বিরাজ করছে তা দেখানোর চেষ্টা করেছি। আবার বিভিন্ন উদারনীতিবাদের বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, এই বৈশিষ্ট্যগুলি থাকার কারণে কিভাবে উদারনীতিবাদ থেকে নিঃসৃত হতে পারে পুঁজিবাদ।আর পুঁজিবাদ থেকে দেখা দেবে সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য, যার ফলে সমাজে একটি শ্রেণীর মানুষের পেশাগত পরিচিতির সংকট তৈরি হবে।

এখন মূল্যায়ন পর্বে দেখানোর চেষ্টা করবো এই পেশাগত পরিচিতির সংকটের কোন সম্ভাব্য সমাধান দেওয়া যায় কিনা?

মূল্যায়নঃ

বর্তমান বিশ্বে বিশ্বায়নের করাল থাবা থেকে আমরা কেউ মুক্ত নই। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদারীকরণের ফলে মানুষ অর্থের পিছনে ছুটতে ছুটতে আজ ক্লান্ত ও অবসন্ন। আমরা অনেকেই এখন আর পাশের বাড়ির মানুষটির খবর সেইভাবে নিই না। অর্থাৎ পারস্পরিক সামাজিক বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলেছি। সামাজিক বন্ধন, পারিবারিক বন্ধন ইত্যাদি আজ অতীত হতে চলেছে। আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ মানুষজন আজ বহুদূরে সরে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিরিখে মানুষ ক্রমশ আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক রক্ষা করা থেকে বিরত থাকছে। সামাজিক জীব হিসেবে তার যে দায়বদ্ধতা সেটা মানুষ আজ ভুলতে বসেছে। বিশ্বায়ন বিশ্ববাজারের গুরুত্বকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করেছে, বহুজাতিক (Multinational) কোম্পানি গুলির ভূমিকা আজ সুবিস্তৃত। আর্থিক গতিশীলতা ও সচলতাকে (Mobility) সামনে রেখে তথাকথিত উন্নতির ধারা বয়ে চলেছে। প্রযুক্তি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি সাধন হয়েছে- তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। এরই পাশাপাশি সৃষ্টি করেছে এক ভোগসর্বস্ব মানসিকতার। ভোগসর্বস্ববাদী জীবনে আত্মসুখী হয়ে ওঠার প্রবণতা মানুষের জীবনকে অনেক বেশি অস্থির করে তুলেছে। হার্বাট মারকিউস (Herbert Marcuse) তাঁর ‘One-Dimensional Man’ গ্রন্থে এই ভোগসর্বস্ববাদের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বর্তমান সভ্যতা বিজ্ঞান, শিল্পকলা, দর্শন, প্রতিদিনের চিন্তা-ভাবনা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও তৈরি করেছে এক-মাত্রিক ছাঁচের সমতুল্য এক ব্যবস্থাপনা। ফলত প্রকৃত সত্য এবং আপাত সত্যের ব্যবধান মুছে যাওয়ার অবস্থায় পরিণত হয়েছে- একথা বলা যেতে পারে। সেই কারণেই স্বাধীনতা, সৌন্দর্য, যুক্তিবোধ এবং বাঁচার যে আনন্দ- তার মধ্যে যে প্রকৃত সত্য আছে তাকে আমরা দূরে সরিয়ে দিয়ে, আপাত সত্যকে গ্রহণ করেছি। কতিপয় প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি মনে করেন এই প্রকৃত সত্য নিহিত আছে আদর্শনিষ্ঠ দার্শনিকতার মধ্যে। আজ আমাদের বেশিরভাগ চাহিদাই নিয়ন্ত্রিত হয় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। প্রকৃত প্রয়োজন প্রায়শই মানুষ

আর নির্ণয় করতে সক্ষম হয় না। মানুষ বাইরের চাপ এবং ক্ষেত্র বিশেষে তার অপপ্রয়োগের কাছে নিজের প্রকৃত প্রয়োজনের বিষয়টিকে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে মারকিউস (Marcuse) তাই বলেছেন-

> “Most of the prevailing needs to relax, to have fun, to behave and consume in accordance with the advertisements, to love and hate what others love and hate, belong to this category of false needs.”[188]

হার্বাট মারকিউস তাঁর ‘One-Dimensional Man’ গ্রন্থে বলেছেন- এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে গেলে আমাদের Reality থেকে Truth কে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। যুক্তিবাদিতার পথে হেঁটে আমাদের খুঁজে বার করতে হবে আমরা কোন পথের সন্ধানে ছুটবো।

সমগ্র বিশ্ব আজ পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং ভোসর্বস্ব সমাজজীবন বিষবাষ্পে আক্রান্ত। আগামী পৃথিবী যেভাবে এই ধ্বংসের অভিমুখে প্রবহমান তাতে আমাদের স্বাভাবিকভাবেই চিন্তা আসে- এই পৃথিবী টিকবে ক’দিন? কাজেই পুঁজিবাদ ব্যবস্থা যত অগ্রসর হবে, এই পৃথিবী ততই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যেতে বাধ্য থাকবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গোটা বিশ্ব জুড়েই আজ স্বজন পোষণ, তোষণ ইত্যাদির মাধ্যমে আখেরে নিজেরটা কিভাবে গুছিয়ে নেওয়া যায় তা নিয়ে চিন্তায় মগ্ন। যেখানে নীতি, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ইত্যাদির সদর্থক ব্যবহার মানুষ হয়তো কোন একদিন ভুলেই যাবে।

একশ্রেণীর মানুষের কাছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে চলা বা ভোগসর্বস্ব জীবনের মধ্যে নিজেকে অতিবাহিত করা সম্ভব হলেও, এই পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষের কাছেই আগামীদিনে সেই সুবিধা কতটা থাকবে তা নিয়ে আমরা যথেষ্টই সন্দিহান। ফলতঃ বেশিরভাগ মানুষ অস্থিরতা, বিষন্নতা, একাকিত্বতা ইত্যাদি মানসিক অসুস্থতার মধ্যে ডুবে যেতে বাধ্য থাকবে। কিন্তু আমরা কেউ চাই না শস্য-

---

[188] Marcuse, H, *One-Dimensional Man*, Boston, 1964, P-5.

শ্যামলায় পরিপূর্ণ বসুন্ধরা সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হয়ে যাক। কাজেই আমাদের নতুনভাবে ভাবনা-চিন্তা করার সময় এসেছে এই প্রাক-প্রকল্পগুলিকে মিথ্যা প্রমাণ করার। তার জন্য প্রথমেই যে দাবি তোলা দরকার তা হল- পুঁজিবাদ নিপাত যাক। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপনাকে যদি চিরতরে মুছে ফেলতে হয় তাহলে আমাদের জীবনচর্চা ও চর্যার মধ্যে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা আবশ্যিক। প্রথমেই যেটা খুব বেশি প্রয়োজন তা হল আমাদের জীবনযাত্রার মান নৈতিকতার শীর্ষে রাখা গুরুত্বপূর্ণ। ভোগবাদী ব্যবস্থাপনা এবং লোভসর্বস্ব মানসিকতার সংবরণ করা আসু প্রয়োজন। যৌক্তিক সম্ভাবনার দিক থেকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে একথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা যায় যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীন উন্নতির পিছনে আমরা হয়তো কোন না কোনভাবে কিছুটা হলেও দায়ি। কারণ আমরাই মূলত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বাজার তৈরি করি। এক্ষেত্রে আমরা যদি চাহিদা সংবরণ করি তাহলে যেমন বাজারদর কমে, একইভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে কিছুটা হলেও কব্জা করা যেতে পারে। কারণ আমরা জানি চাহিদার সঙ্গে জোগানের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। আমরা যদি চাহিদাকে নগণ্য অবস্থায় নিয়ে যেতে পারি তাহলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কর্ণধার হিসাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা তথা বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানিগুলি জোগান বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবে।

আবার বর্তমান সমাজের পেশাগত পরিচিতির সংকটের বিষয়টি নিয়ে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের বক্তব্য গুরুত্ব দিয়ে ভাবার প্রয়োজন আছে। তিনি তাঁর ‘Identity and Violence: The Illusion of Destiny’ গ্রন্থে বলেছেন- এক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে, জোর দিতে হবে দেশীয় ব্যবস্থার উন্নয়নের উপর, চালু করতে হবে শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগের উন্নতি, স্বাস্থ্যরক্ষা সহ নিরাপত্তা সহায়ক প্রকল্পের সমন্বয়ের উপর।

এ প্রসঙ্গে অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, বিশ্বজুড়ে বিশ্বায়নের অন্তর-জালের মধ্যে যে দারিদ্রতা ছড়িয়ে পড়েছে এবং যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে তা দূর করতে গেলে রাজনৈতিক যে সমাধানটি রয়েছে, তা হল সম্প্রদায়গত অংশ গ্রহণের বাস্তবায়ন, যা স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের (Institution of Local Government) মাধ্যমে বাস্তবায়িত

করার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি স্থানীয় স্থায়ত্বশাসনের অন্তর্ভূক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে কার্যকরী করতে গেলে প্রয়োজন শিক্ষার বিস্তার। ভারতের মতো দেশে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে কার্যকরী করতে গেলে আরও কি কি বিষয়ের প্রয়োজন, সে বিষয়ে আরও উন্নত ধরণের গবেষণার প্রয়োজন আছে। জাত-পাত, ধর্ম এবং বিভিন্ন কুসংস্কার আজও পঞ্চায়েত নামক প্রতিষ্ঠানগুলি স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে উঠছে। পাশাপাশি আরো অনেক বিষয় জড়িত আছে যেমন- দুর্নীতি ও অন্যান্য বিষয়। দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন নিয়ে আসতে গেলে দরকার হল- সরকার এবং জনগণ উভয়েরই সৎইচ্ছা। অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty.’ গ্রন্থে দেখিয়েছেন- সমস্যা অনেক আছে ঠিকই, কিন্তু বিশ্বায়নের যুগে যে সমস্ত সমস্যা নিয়ত পীড়িত করছে তার থেকে উদ্ধারের জন্য বিভিন্ন ধরণের পথও খোলা আছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশগুলির প্রথম এবং প্রধান সমস্যা হল দারিদ্রতা। দারিদ্রতার জন্য কতো প্রতিভা সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হওয়ার পথে বিভিন্নভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। কতো প্রতিভা শুধুমাত্র দারিদ্র ও অজ্ঞতার কারণে হারিয়ে যায়। অনেক সময় এই দারিদ্রতা মোকাবিলা করার জন্য পর্যাপ্ত পন্থা আমাদের কাছে অজানা থাকে, তাই আমরা আপোসের পথ গ্রহণ করি। এই দারিদ্র দূর করার জন্য চটজলদি কোন পন্থা হয়তো নেই, কিন্তু দারিদ্রতার জীবন কিভাবে উন্নত করা যায় তার জন্য ড. বন্দ্যোপাধ্যায় যে পাঁচটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়ার কথা বলেছেন তা নিম্নে আলোচনা করা হল[189] -

প্রথমত- দরিদ্র মানুষজন অনেক সময় জানে না কিভাবে সুস্বাস্থ্য রক্ষা করতে হয়। তাই তারা এমন কিছু বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে যার কোন যৌক্তিক ভিত্তি নেই। শুধুমাত্র অজ্ঞতার কারণে শিশুর টিকাকরণের প্রয়োজনীয়তা বা প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব, চাষযোগ্য জমিতে রাসায়নিক সার বা কীটনাশক প্রয়োগের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে

---

[189] Banerjee, Abhijit. V, Duflo, Esther, *Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty*, Public Affairs, New York, 2011, PP-484-494.

সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অনেক সময় অপারগ হয়। অনেক ক্ষেত্রে এমনও হয় যে তারা জানে না যে, তারা জানে না। কাজেই তিনি যেটা বলতে চেয়েছেন তা হল যথার্থ শিক্ষার প্রসার একান্ত প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত- দরিদ্র মানুষের জীবন দারিদ্রতার মধ্যে দিয়েই অতিবাহিত হবে এটাই স্বাভাবিক এবং এটাকে তারা ভবিতব্য বলে স্বীকার করে নেয়। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব, আয়োডিনযুক্ত লবণ গ্রহণ, সঞ্চয়ের যথার্থ পদক্ষেপ ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণ দরিদ্র মানুষজন খুব একটা সচেতন বা ওয়াকিবহাল নয়। কারণ অনেকের জীবন অতিবাহিত হয় দিনমজুরীর মধ্যে দিয়ে। কাজেই এক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে যথার্থ পদক্ষেপ নেওয়া একান্ত জরুরি।

তৃতীয়ত- বাজার ব্যবস্থা ও ঋণপ্রদানের কৌশল সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা ও সঠিক ব্যবহার প্রয়োজন। যেমন- স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা সবার কাছে একই রকম নয়। কারণ দরিদ্র মানুষজন এর যথার্থ স্বাস্থ্য-বীমার অভাব, সেইসঙ্গে উক্ত বিষয়ে সচেতনতার অভাব। আবার বাজার থেকে ঋণ পেলেও তা পরিশোধ করার জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদান অনেক সময়েই সাধারণ জনগণের কাছে দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বা সরকারকে প্রয়োজনীয় শর্ত আরোপের মাধ্যমে উদীয়মান বাজার ব্যবস্থাকে সচল রাখা একান্ত জরুরী, প্রয়োজনে সরকার বীমা-ক্ষেত্রে ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

চতুর্থত- উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শুধুমাত্র দারিদ্রতার কারণ সেই দেশগুলি পিছিয়ে আছে এমনটা কিন্তু নয়। কারণ রাষ্ট্র বা সরকার চেষ্টা করে অর্থনীতিকে সাবলম্বী করতে। কিন্তু কিছু নীতির অপপ্রয়োগ বা ভুল প্রয়োগের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার যথার্থ প্রয়োগ হয় না। সেইসঙ্গে অজ্ঞতা, আদর্শ এবং জড়তা অনেকাংশে দায়ী। কাজেই রাষ্ট্রনীতির যথার্থ প্রয়োগের ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়গুলির উপর যথাযথ নজর দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

পঞ্চমত- পরিশেষে তিনি যেটা বলার চেষ্টা করেছেন সেটি হল আমরা কি করতে পারি বা কি করতে পারি না সে সম্পর্কে আমরা নিজেরাই জানি না। অর্থাৎ

আমাদের মধ্যে সক্ষমতার অভাব আছে তা কিন্তু নয়, তবে আমাদের মধ্যে সেই আত্ম-সক্ষমতা বা আত্ম-বিশ্লেষণের বড় অভাব আছে। ফলে আমরা কিছু প্রত্যাশা করার ক্ষেত্রেও পিছুপা হয়ে যাই। আর এই আত্মবিশ্লেষণ, আত্ম-সক্ষমতা বিকাশের জন্য প্রয়োজন হল উৎসাহ প্রদান, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষকরা উৎসাহ প্রদানের পরিবর্তে নিরুৎসাহিত করেন, ফলে যার মধ্যে হয়তো কিছুটা সক্ষমতা ছিল, তা বিকাশের পথে বাধা প্রাপ্ত হয়। কাজেই এই দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা খুব প্রয়োজন।

এখন আমাদের আলোচনা আবার পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দিকে একটু নজর ঘোরানো যাক্। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপনা যেন আমাদের ভবিতব্য, এখান থেকে যেন আমাদের বেরোনোর কোন পথ নেই বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। কিন্তু আমরা যেহেতু দর্শনের ছাত্র, তাই আমাদের কল্পনার জগতে বিরাজ করতে বিশেষ কোনো বাধা নেই। দার্শনিক প্লেটো থেকে শুরু করে বর্তমানকালের চিন্তাবিদ প্রত্যেককেই কল্পনার জগতে বিরাজ করতে দেখা যায়, যদিও তা আদৌ বাস্তবায়িত হবে কিনা সেটা নিয়ে তাঁরা মোটেই চিন্তিত ছিলেন না, তাই আমরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মোকাবিলা করার জন্য চিন্তার জগতে আনাগোনা করতে পারি যা যৌক্তিক ভাবে অসম্ভব্যতাকে সূচিত করে না।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আমরা বাজার তৈরি করতে সহায়তা করি এটি নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। এখন আমরা যদি সেই বাজার তৈরীতে সহায়তা প্রদান না করি তাহলে হয়তো আগামীদিনে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কিছুটা হলেও কব্জা করা যেতে পারে বলে মনে হয়। যেমন- বিষয়টা একটা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাক্, আমরা প্রয়োজনে বা অনেক সময় অপ্রয়োজনে গাড়ি ব্যবহার করি, আবার অনেক সময় সামাজিক প্রতিপত্তি (Social Status) দেখানোর জন্যও একাধিক গাড়ি ক্রয় করি। এখন আমরা যদি তার পরিবর্তে সাইকেল বা ব্যাটারী-চালিত দ্বি-চক্র যান ব্যবহার করি তাহলে কিছুটা লাভবান হতে পারি। যেমন- পরিবেশবান্ধব একটা ব্যবস্থাপনা তৈরি করা গেল আবার অপরদিকে বহুজাতিক সংস্থা যারা গাড়ি প্রস্তুত করে, তাদের বাজার তৈরীর পথে কিছুটা হলেও বাধা তৈরি করা গেল।

আবার কারিগরি, প্রযুক্তি, এমনকি চাষাবাদ করার ক্ষেত্রেও দেশীয় প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো যেতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেশের উন্নত মস্তিষ্ক বহুজাতিক সংস্থাগুলির কাছে অর্থের বিনিময়ে বিক্রি হয়ে যায়। এখন এই সমস্ত উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষগুলি যদি দেশীয় প্রযুক্তি তৈরি করে নিজের দেশের উন্নতি ঘটাতে সহায়তা প্রদান করে তাহলে দেশীয় প্রযুক্তি যেমন উন্নত হতে পারে, তেমনি আবার বহুজাতিক সংস্থাগুলির প্রতিও খানিকটা চাপ তৈরি করতে সমর্থ হওয়া যাবে।

যদিও সবটাই অলীক কল্পনা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তা একেবারেই যৌক্তিকভাবে অসম্ভব নয় বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে। আমার মনে হয় এক্ষেত্রে খুব জরুরী হল আমরা কি চাই? আমরা ভোগ-সর্বস্ব সমাজজীবন চাই, না কি নৈতিকতাসমৃদ্ধ সর্ব-সাধারণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ প্রদান করতে চাই? না কি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রতি আমরা সবটাই সমর্পণ করতে চাই, সমস্তটাই নির্ভর করছে আমাদের মন- মানসিকতার উপর। যার উপর নির্ভর করেই গঠিত হবে আমাদের পরবর্তী সমাজ জীবন।

গ্ৰন্থপঞ্জী

(BIBLIOGRAPHY)

- Banerjee, Abhijit. V, Duflo, Ether, *Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty*, Public Affairs, New York, 2011.
- Baylis, John, Smith, Steve and Owens, Patricia, *The Globalization Of World Politics,* Oxford University Press, UK, 2014.
- Bentham, Jeremy, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Batoche Books Kitchener, 2000.
- Bhargava, Rajeev, Acharya, Ashok (Edit.), *Political Theory An Introduction*, Pearson, 2008.
- Bhattacharyya, D. C, *Political Theory*, Vijoya Publishing House, Kolkata, 2006.
- Dasgupta, Samir, and Kiely, Ray(Ed.), *Globalization and After*, Sage Publication, New Delhi, 2008.
- Ebenstein, William, *Modern Political Thought The Great Issues, 2nd Edition,* Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi, 1960.
- Erikson, Erik. H, *Childhood and Society,* Paladin Grafton Books, London, 1987.
- Erikson, Erik H, *Identity- Youth and Crisis*, W.W. Norton & Company, New York, London, 1994.
- Barker, Ernest (Trans), *Aristotle politics*, Oxford University Press, 1995.

- Hayek, F. A, *The Constitution of Liberty*, London, Routledge and Kegan Paul, 1960.
- Foster, G. M, *Traditional Culture: And the Impact of Technological Change*, New York, Harper and Brother Pub.,1962.
- Giddings F.H, *The Elements of Sociology*, London, Macmillan & Co. Ltd., 1906.
- Gisbert, P, *Fundamentals of Sociology*, Kolkata, Orient Longman Pvt. Ltd., 2006.
- Gray, John, *Liberalism* 2nd Edition, World View Publication, Delhi, 1998,
- Heywood, Andrew, *Key Concepts In Politics*, Palgrave Macmillan, 2011.
- Heywood, Andrew, *Political Ideologies: An Introduction*,4th Edition, Palgrave Macmillan, New York, 2007.
- Heywood, Andrew, *Politics,* 4th edition, Palgrave foundations, 2013.
- Hobhouse, Leonard Trelawny, *Liberalism*, Batoche Books, 1998.
- Hogg, Michael A, and Abrams, Dominic, *Social Identifications,* Routledge, London and New York, 1998.
- https://www.yourarticlelibrary.com/business/types-of-occupation-a-profession-b-employment-and-c-business/23363
- Hume, David, *An Enquiry Concerning Human Understanding,* Progress Publishers, Calcutta, 1999.
- Jena, Pradeep kumar, *"Indian Handicrafts in Globalization Times: An analysis of Global-local Dynamics"* Interdisciplinary Description of Complex System Systems-scientific journal, Vol. 8,

No-2, Centre for The Study of Social Systems, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, 2010.

- Kegan, R, *The Evolving Self: Problems and Process in Human Development*, Cambridge, Harvard University Press, 1982.
- Kerferd, G. B, *The Sophistic Movement*, Cambridge University Press, Cambridge, 1981.
- Kolakowski, Leszek, *Main Currents of Marxism,* Oxford University Press, Oxford. 2005.
- Kymlicka, Will, *Contemporary Political Philosophy: An Introduction,* Oxford, 2002.
- Lawler, Steph, *Identity Sociological Perspectives 2nd edition*, Polity, Cambridge, 2008.
- Lawler, Steph, *Identity*, Cambridge, Polity Press, 2014.
- Locke, John, *Two Treatises of Government*, United Kingdom, C. and J.Rivington, 1824.
- MacIver, R. M, and Page C. H, *Society*, Macmillan India Ltd., 1988.
- MacPherson, C. B, *The Life and Times of Liberal Democracy*, Oxford University Press, London, 1977.
- Marcuse, H, *One-Dimensional Man*, Boston, 1964.
- Mill, John Stuart, *On Liberty*, Batoche Books, Kitchener, 2001.
- Mill, John Stuart, *Utilitarianism*, Batoche Books, Kitchener, 2001.
- Mises, Ludwing Von, (Ed. Bettina Bien Greaves), *Liberalism: The Classical Tradition,* Liberty Fund, Indianapolis, 2005.
- Mohanty, A, and Jena, L, *Work-Life Balance Challenges for Indian Employees: Socio-Cultural Implications and Strategies*, Journal of Human Resource and Sustainability Studies, **4**, 2016.

- Monrouxe, L. V, *Identity, identification and medical education: Why should we care*? Med Education, 2010.
- Next Insurance Staff, Risks and Challenges of Being Self-Employed– How to Reinforce Your Small Business, Jul 26, 2018.
- Nozick, Robert, *Anarchy, State, and Utopia,* Blackwell, USA, 1999.
- *Oxford English Dictionary*, 2nd ed. Oxford, UK: Clarendon Press; 1989
- Pearson, Christine and Judith Clair, *Reframing Crisis Management, The Academy of Management Review*, vol. 23, 1998.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, United Kingdom, Harvard University Press, 2005.
- Rawls, John, *Political Liberalism*, Columbia University Press, New York, 1996.
- Reynolds, George, *Ethics in Information Technology*, United States, Cengage Learning, 2018.
- Richard, Shoemaker. S, *Personal Identity*, Basil Blackwell, Oxford, 1984.
- Royal College of Physicians of London, *Doctors in Society: Medical Professionalism in a Changing World*, London, UK: Royal College of Physicians of London; 2005.
- Russell, Bertrand, *History of Western Philosophy*, United States, Taylor & Francis, 2004.
- Sen, Amartya, *Identity and Violence: The Illusion of Destiny*, Penguin Books, 2006.
- Stephen, A. Webb, *Professional Identity and Social Work'* 5th International Conference on Sociology and Social Work: New

Directions in Critical Sociology and Social Work: Identity, Narratives and Praxis, 2015.

- Tajfel, Henri(Ed.), *The Social Dimension, Vol-2,* Cambridge University Press, London, 1984.
- Tomo, Andrea, *Angry accountants: Making sense of Professional Identity Crisis on Online Communities*, Critical Perspectives on Accounting, 2022.
- Webb, Stephen. A (Ed.), *Professional Identity and Social Work* (1st ed.), Routledge, 2017.
- Turner, Rachel. S, *Neo-Liberal Ideology- History, Concepts and Policies,* Edinburgh University Press, 2008.
- Williams, Bernard, *Personal Identity and Individuation, Problems of the Self,* Cambridge University Press, Cambridge, 1973.
- আলম, ফজলুল, 'সংস্কৃতির যত শত্রু', অনন্যা, ঢাকা, ২০১৫.
- করিম, সরদার ফজলুল (অনুবাদ), এরিস্টটল-এর 'পলিটিকস', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৫.
- খান, মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ, 'সামাজিক পরিবর্তন', কবির পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৭.
- ঘোষ, কৃত্যপ্রিয়, 'রাষ্ট্রতত্ত্ব,' পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০০৬.
- ঘোষ, রামতনু (সম্পাদিত) 'বহুমাত্রিক বিশ্বায়ন', কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫.
- ঘোষ, হিমাংশু(ভাষান্তর), 'জর্জ এইচ স্যাবাইন- রাজনৈতিক তত্ত্বের ইতিহাস', ভ্রাতৃসংঘ, বাঁকুড়া, ১৯৮৮.
- ঘোষ, হিমাংশু (ভাষান্তর), 'হ্যারল্ড জে ল্যাস্কি- রাজনীতির ব্যাকরণ', সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৭.
- চক্রবর্তী, শুভাশিস, 'বাংলার তাঁত শিল্প নদীয়া জেলার একটি সমীক্ষা ১৯৪৭-২০১৪', সেতু, মে ২০১৪.

- চমস্কী, নোয়াম, ‘নতুন এই বিশ্বব্যবস্থা কোন দিকে চলছে দুনিয়া-২’, মনফকিরা, হাওড়া, ২০০৬.
- জন, রলস, (অনুবাদ শুভ্রা চক্রবর্তী) ‘ন্যায়বিচারের তত্ত্ব’, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১৫.
- জোয়ার্দ্দার, সিদ্ধার্থ শংকর, ‘দর্শন শিল্প ও সমাজ’, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২.
- দত্তগুপ্ত, শোভনলাল, ‘মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তা, পাশ্চাত্য রাষ্ট্রভাবনা’, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০১১.
- দত্তগুপ্ত, শোভনলাল (সম্পাদক), ‘পাশ্চাত্য রাষ্ট্রভাবনা’, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০১৩.
- দাশ, দীপক কুমার (সম্পাদিত) ‘রাজনীতির তত্ত্বকথা’, একুশে, ২০১৬.
- দাশগুপ্ত, সমীর, ‘বিশ্বায়ন ও তার পর’, আনন্দ দাশগুপ্ত, (সম্পাদনা), স্বাধীনতা স্বদেশ সমাজ সংস্কৃতি, গাঙচিল, বইমেলা ২০০৮.
- দাস, রমাপ্রসাদ, ‘হিউমের ইনক্যয়ারী- একটি উপস্থাপনা’, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০০৯.
- দেশাই, এ আর, ‘ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি’, কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৭৬.
- বাগচী, অমিয় কুমার (সম্পাদনা), 'বিশ্বায়ন ভাবনা- দুর্ভাবনা', (প্রথম খণ্ড), ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫.
- বার্কার, আর্নেষ্ট, ‘সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্বের নীতি’, (অনুবাদ ডঃ অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৮৪.
- ভট্টাচার্য, মোহিত, চক্রবর্তী, কাবেরী, ‘সামাজিক তত্ত্ব ও উন্নয়ন প্রশাসন’, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৬.
- মুখোপাধ্যায়, অমলকুমার, ‘পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তা পরিক্রমা’, শ্রীধর পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২১.

- লাহিড়ী, আশীষ, ‘বিজ্ঞানের দর্শন ও কার্ল পপার’, পাভলভ ইনস্টিটিউট, কলকাতা, ২০০৮.
- সরকার, প্রহ্লাদ কুমার (সম্পাদক), ‘তত্ত্ব ও প্রয়োগ- বিংশ শতাব্দীর উদারনীতিবাদঃ হায়েক, পপার ও রলস’, চতুর্থ খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর, ২০০১.
- সাহা, সনৎকুমার, ‘ভাবনা অর্থনীতির বিশ্বায়ন, উন্নয়ন ও অন্যান্য’, সাহিত্যিকা, ঢাকা, ২০০৩.
- সেন, অমর্ত্য, ‘জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি’, আনন্দ, কলকাতা, ১৪১৫.
- সেন, অমর্ত্য, ‘পরিচিতি ও হিংসা’,(অনুবাদ ভাস্বতী চক্রবর্তী), আনন্দ, কলকাতা, ২০১০.
- হোসেন, মাসুদুজ্জামান ফেরদৌস (সম্পাদনা), ‘বিশ্বায়নঃ সংকট ও সম্ভাবনা’, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৪.

Ripan Biswas
08/06/2023